শ্রীঅরবিন্দের গীতা

(শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ লিখিত Essays on the Gita পুস্তকের অনুবাদ)

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীঅনিলবরণ রায়

ডি, [illegible] লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আড়াই টাকা

প্রকাশক
শ্রীবিভূতিভূষণ রায়
গুইর, কৈয়র, পোঃ বর্দ্ধমান।

আনন্দময়ী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৫, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

"শ্রীঅরবিন্দের গীতা"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইল তাহার প্রধান কারণ ইতিমধ্যে আমাকে দেড় বৎসরকাল রাজবন্দীরূপে জেলে কাটাইয়া আসিতে হইয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। এই দুইখণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের গীতার প্রথম ভাগ (First series) শেষ হইল—দ্বিতীয় ভাগ (Second series) পরে প্রকাশিত হইবে। তবে শ্রীঅরবিন্দের গীতার প্রথম ভাগটি একটি খণ্ড গ্রন্থ নহে—ইহা একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ। ইহা হইতেই গীতাশিক্ষার মূলকথাগুলি জানিতে পারা যায় এবং সাধনার জন্য যথেষ্ট উদার ও সুদৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায়। এই ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়াই সাধক তাঁহার জীবনকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারেন যাহাতে গীতার অপর অংশের শিক্ষার কোন প্রয়োজনই হয় না অথবা তিনি নিজেই সে শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। অতএব, শ্রীঅরবিন্দের গীতার প্রথম ভাগটিকেই গীতা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের প্রথম অংশে এই কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩রা ফাল্গুন, ১৩৩৩
পণ্ডিচেরী।

অনুবাদক
শ্রীঅনিলবরণ রায়।

"সারথি"তে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের গীতা নিয়মিত পাঠ করিয়া
শ্রীঅরবিন্দ জানাইয়াছেন—"অনুবাদ খুবই ভাল
হইতেছে। সাধারণ পাঠকেরা
আপনার অনুবাদের সাহায্যে
সহজেই গীতা বুঝিতে
পারিবে।"

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

একাদশ অধ্যায়

কর্ম্ম ও যজ্ঞ

বুদ্ধিযোগ এবং বুদ্ধিযোগের পরিণাম ব্রাহ্মী স্থীতি—ইহা লইয়াই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগ লিখিত হইয়াছে! এইখানেই গীতার অনেক শিক্ষার বীজ নিহিত রহিয়াছে,—গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম, সমতা বাহ্যসন্ন্যাস পরিত্যাগ, ভগবানে ভক্তি এই সকল শিক্ষারই সূত্রপাত এখানে হইয়াছে, তবে তাহা খুব স্বল্প এবং বুঝা শক্ত। এখন পর্য্যন্ত যে শিক্ষার উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা এই—মানুষ যে সাধারণতঃ কামনা লইয়া কার্য্য করে তাহা হইতে বুদ্ধিকে ফিরাইতে হইবে, ইন্দ্রিয়সুখের সন্ধানে ফিরিয়া সাধারণতঃ মানুষের চিত্তমনের যে বেগ ও অজ্ঞতা হয় তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, লক্ষ বাসনার পশ্চাতে ধাবমান বুদ্ধি ও ইচ্ছাকে ফিরাইয়া ব্রাহ্মী স্থিতির নিষ্কাম ঐক্য, নিরুদ্বেগ, শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্জ্জুন এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেন এসব তাহার কাছে একেবারে নূতন

নহে; তৎকালে প্রচলিত শিক্ষার ইহাই সার মর্ম্ম;—সে শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানের পথ দেখাইয়া দেয়, পুরুষার্থ সাধনের উপায় স্বরূপ সংসার ও কর্ম্মত্যাগের পথ, সন্ন্যাসের পথ দেখাইয়া দেয়। ইন্দ্রিয়সুখ, কামনা, মানবীয় কর্ম্ম ছাড়িয়া বুদ্ধিকে ঈশ্বরমুখী করা, সেই এক নিষ্ক্রিয় পুরুষ, অচল অরূপ ব্রহ্মের অভিমুখ করা—ইহা যে জ্ঞানের সনাতন বীজ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখানে কর্ম্মের স্থান নাই, কারণ কর্ম্ম অজ্ঞানের; কর্ম্ম জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত; কামনা ইহার বীজ এবং বন্ধন ইহার ফল। ইহাই তৎকাল প্রচলিত দার্শনিক মত এবং কৃষ্ণ যখন বলিলেন যে বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, তখন তিনিও এই মত স্বীকার করিয়া লইলেন বলিয়াই মনে হয়। অথচ, তিনি বিশেষ করিয়া কর্ম্মকে যোগের অঙ্গ বলিতে লাগিলেন, অতএব, এই শিক্ষার একটা বিষম অসামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। শুধু তাহাই নহে; কারণ, কিছুকাল অতি সামান্য, নিতান্ত নির্দ্দোষ কর্ম্ম করা চলিতে পারে; কিন্তু এখানে অর্জ্জুনের সম্মুখে যে কর্ম্ম তাহা আত্মার নিষ্কম্প শান্তি ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী,—এ কর্ম্ম ভীষণ, এমন কি পৈশাচিক, ইহা নিষ্ঠুর রক্তপাতের যুদ্ধ, একটা বিরাট হত্যাকাণ্ড। 'অথচ আভ্যন্তরীন শান্তি, নিষ্কাম সমতা এবং ব্রাহ্মী স্থিতি সম্বন্ধে শিক্ষার দ্বারা এই ভীষণ কর্ম্মকে সমর্থন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই যে বিরোধ এখনও ইহার সামঞ্জস্য করা হয় নাই। অর্জ্জুনের অভিযোগ এই যে

তাহাকে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বিরোধপূর্ণ এবং গোলমেলে—মানুষ যাহার সাহায্যে সোজা নিশ্চিত শ্রেয়ের দিকে যাইতে পারে এ শিক্ষা সেরূপ নহে। এই আপত্তির উত্তরে, গীতা কর্ম্মের প্রকৃত নীতি স্পষ্ট ভাবে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভগবান প্রথমেই পরমার্থলাভের দুইটি উপায় প্রভেদ করিলেন,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্ত ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩।৩

এ সংসারে মুক্তিলাভ করিতে হইলে মানুষ জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ যে কোন একটি অবলম্বন করিতে পারে। সাধারণ ধারণা এই যে জ্ঞান মার্গের লোকেরা কর্ম্মকে মুক্তির পরিপন্থি মনে করিয়া পরিত্যাগ করে, কর্ম্মমার্গের লোকেরা কর্ম্মকে মুক্তির সহায় মনে করিয়া গ্রহণ করে। ভগবান এখন এই দুইয়ের মিশ্রণের বা সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিলেন না, কেবল এই দেখাইয়া আরম্ভ করিলেন যে, সাংখ্যদের যে ত্যাগ শারীরিক ত্যাগ, "সন্ন্যাস" তাহা একমাত্র পথও নহে, অন্যটি অপেক্ষা ভাল পথও নহে। অবশ্য আত্মাকে, পুরুষকে "নৈষ্কর্ম্য" বা শান্ত কর্ম্মশূন্যতার ভাব লাভ করিতে হইবে; কারণ প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, আত্মাকে এই কর্ম্মস্রোতের উপরে উঠিতে হইবে এবং স্বাধীনতা ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির ক্রিয়া পরম্পরা অবিচলিত ভাবে অবলোকন করিতে হইবে। আত্মার

নৈষ্কর্ম্ম্য বলিতে বস্তুতঃ ইহাই বুঝায়, প্রকৃতির ক্রিয়া পরম্পরার শেষ বুঝায় না। অতএব, কোনরূপ কর্ম্ম না করিলেই যে এই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করা যায় এরূপ ভাবা ভুল। শুধু কর্ম্মপরিত্যাগই যথেষ্ট নহে, এমন কি মুক্তিলাভের ইহা ঠিক পথও নহে।

ন কর্ম্মণামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ নিষ্ক্রিয় ভাব লাভ করেনা, কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধিলাভ হয়না।

কিন্তু ইহা মোক্ষলাভের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপায় নহে কি? কারণ, প্রকৃতির কর্ম্ম যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে আত্মা তাহাতে বদ্ধ না হইয়া কেমন করিয়া থাকিবে? আমি যুদ্ধ করিব অথচ আমার আত্মা "যুদ্ধ করিতেছি" বলিয়া ভাবিবে না, জয়াকাঙ্ক্ষা করিবে না, পরাজয়ে বিচলিত হইবে না ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহাই সাংখ্যদের শিক্ষা যে যে ব্যক্তি প্রকৃতির ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয় তাহার বুদ্ধি অহঙ্কার, অজ্ঞান ও কামনায় বদ্ধ হয় এবং সেজন্য কর্ম্মে আকৃষ্ট হয়,— কিন্তু যদি বুদ্ধি সরিয়া আইসে তাহা হইলে কামনা ও অজ্ঞানের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মও শেষ হইয়া যায়। অতএব, মুক্তিলাভ করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। অর্জ্জুন প্রকাশ না করিলেও তাঁহার মনে যে তৎকাল প্রচলিত এই যুক্তি উঠিয়াছিল তাহা তাঁহার পরের কথা হইতেই বুঝা যায়; ভগবান তৎক্ষণাৎ হইব

বুঝিয়াই উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন···এরূপ ত্যাগ অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে, এমন কি সম্ভবও নহে।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।৩।৫

--"কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণরাশি মনুষ্যগণকে অবশ করিয়া আপনা আপনি কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে।"

বিশ্ব জুড়িয়া চিরকাল বিশ্বশক্তির যে বিরাট ক্রিয়া চলিতেছে তাহার তীব্র অনুভূতিই গীতার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পরবর্ত্তীকালে তান্ত্রিক শাক্তগণ এই দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন—এমন কি তাহারা শক্তিকে পুরুষেরও উপরে স্থান দিয়াছিলেন। গীতাতে যদিও ইহা তেমন পরিস্ফুট হয় নাই, তথাপি গীতার ঈশ্বরবাদ ও ভক্তিতত্ত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহা প্রাচীন বেদান্তের কর্ম্মত্যাগের ঝোঁক বিশেষভাবে দমন করিয়াছে। প্রাকৃতিক জগতে দেহধারী মানব কর্ম্ম বন্ধ করিতে পারে না—এক মুহূর্ত্তের জন্য, এক সেকেণ্ডের জন্যও পারে না; তাহার এখানে বাঁচিয়া থাকাই একটা কর্ম্ম; সমগ্রবিশ্বজগৎতই ভগবানের একটি কর্ম্ম কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাও তাঁহারই লীলা।

আমাদের শারীরিক জীবন, ইহার পালন ও রক্ষা, ইহা একটি পথযাত্রার মত; "শরীরযাত্রা"—কর্ম্ম ভিন্ন ইহা সম্পন্ন করা যায় না। কিন্তু, যদিই কোন মানব শরীর পালন না

করিয়া থাকিতে পারে, যদি সর্ব্বদা গাছের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বা প্রস্তরের ন্যায় জড়বৎ বসিয়া থাকিতে পারে—"তিষ্ঠতি" তথাপি এরূপ নিশ্চল বা জড়ভাবে থাকিলেই সে প্রকৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না, প্রকৃতির ক্রিয়াপরম্পরা হইতে মুক্তি পাইবে না। কারণ, কর্ম্ম শব্দে শুধু আমাদের শারীরিক ক্রিয়া এবং চলাফেরাই বুঝায় না আমাদের মানসিক জীবনও একটা মস্ত বড় জটিল কর্ম্ম—বিশ্রামহীন শক্তির এইটাই বরং বৃহত্তর এবং অধিকতর প্রয়োজনীয় কর্ম্ম—এই মানসিক ক্রিয়াই শারীরিক ক্রিয়ার কারণ ও নির্দ্দেশক। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি আমাদের বন্ধনের উপলক্ষ্য মাত্র, তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে মনের ঝোঁকই প্রকৃত কার্য্যকরী কারণ। মানুষ তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে পারে এবং তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারে—কিন্তু, তাহার মন যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করিতে থাকে তাহা হইলে তাহার কোন লাভই হইল না। এরূপ ব্যক্তি আত্মসংযমের ভুল ধারণার বশে নিজেকেই প্রতারিত করে; সে ইহার উদ্দেশ্য বা প্রকৃত তথ্য বুঝে না—তাহার আন্তরিক জীবনের মূল তত্ত্বই বুঝে না; অতএব তাহার আত্মসংযমের সমগ্র প্রণালীই মিথ্যা এবং ব্যর্থ।*

* "মিথ্যাচার" শব্দের অর্থ কপটাচারী (hypocrite) বলিয়া আমার মনে হয় না। যে মনুষ্য এরূপ সম্পূর্ণ কঠোর ভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে সে কেমন করিয়া কপটাচারী হইতে পারে? সে ভ্রমে পতিত, "বিমূঢ়াত্মা" এবং

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৩।৬

শুধু শরীরের কর্ম্ম, এমন কি শুধু মনের কর্ম্মও কিছু নয়,—সে সব বন্ধনও নহে, বন্ধনের প্রথম কারণও নহে। প্রকৃতির মহাশক্তি মন, প্রাণ ও শরীররূপ তাহার বিরাট ক্ষেত্রে ক্রীড়া করিবেই; তাহার মধ্যে বিপদের জিনিষ হইতেছে তাহার তিন-গুণের মুগ্ধ করিবার শক্তি—এই তিনগুণ বুদ্ধিকে গুলাইয়া দিয়া আত্মাকে ঢাকিয়া ফেলে। আমরা পরে দেখিব যে ইহা লইয়াই গীতার কর্ম্ম ও মুক্তির সমস্ত কথা। গুণত্রয়ের মুগ্ধকরী ক্রিয়া হইতে মুক্ত হও—তাহার পর কর্ম্ম থাকিতে পারে, থাকিবেই, এমন কি বৃহত্তম বিষম উপদ্রবময় কর্ম্মও চলিতে পারে; তাহাতে কোন হানি হইবে না কারণ আত্মা নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিলে আর কিছুই পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

কিন্তু, উপস্থিত গীতা এই বড় কথাটা তুলিতেছে না। মনই যখন যান্ত্রিক কারণ, কর্ম্মহীনতা যখন অসম্ভব, তখন শরীর ও মনের ক্রিয়াকে সংযত ও নিয়মিত করাই কর্ত্তব্য ও যুক্তিযুক্ত। বুদ্ধির যন্ত্র স্বরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিবে এবং তাহাদের উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে—কিন্তু, যোগরূপেই এই কর্ম্ম করিতে হইবে।

তাহার "আচার"—তাহার অনুসৃত আত্মসংযমের প্রণালী মিথ্যা এবং ব্যর্থ—এই মাত্রই যে গীতার অর্থ তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতের্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে। ৩।৭

কিন্তু, এই আত্মসংযমের সার কথা কি, যোগরূপে কর্ম্ম করা বা কর্ম্মযোগের অর্থ কি? ইহা অনাসক্তি, ইন্দ্রিয়বিষয়ে এবং কর্ম্মের ফলে মনকে লাগিতে না দিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে। সম্পূর্ণ কর্ম্মশূন্যতা নহে—ইহা ভ্রম, মোহ, আত্মপ্রতারণা, ইহা অসম্ভব। সম্যক ভাবে স্বাধীনতার সহিত কর্ম্ম করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় ও রিপুর বশ্যতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, কামনা-শূন্য হইয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে—এই সবই সিদ্ধি-লাভের প্রথম গূঢ় রহস্য। কৃষ্ণ বলিলেন, এইরূপে আত্মসংযমের সহিত কর্ম্ম কর, নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্; আমি বলিয়াছি যে জ্ঞান, বুদ্ধি কর্ম্ম অপেক্ষা বড়, জ্যায়সি কর্ম্মণঃ বুদ্ধি, কিন্তু আমি এমন কথা বলি নাই যে কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মশূন্যতা বড়, বরং বিপরীতটাই সত্য, কর্ম্ম জ্যায়ঃহ্যকর্ম্মণঃ। কারণ, জ্ঞান বলিতে কর্ম্মত্যাগ বুঝায় না, সমতা এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ে ও কামনায় অনাসক্তিই বুঝায়। বুদ্ধি যখন প্রকৃতির নিম্ন ক্রিয়া ইন্দ্রিয়বশ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া উর্দ্ধে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মজ্ঞানের শক্তিতে এবং শুদ্ধ বিষয়শূন্য আত্মজ্ঞানের আনন্দে মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের ক্রিয়াকে নিয়মিত করে, (নিয়তম্ কর্ম্ম) * জ্ঞান

* নিয়তম্ কর্ম্ম সাধারণতঃ যেরূপ ব্যাখ্যা করা হয় আমি সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি নাই। সাধারণ টীকাকারেরা নিয়তং কর্ম্ম বলিতে সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম বুঝিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত

বলিতে বুদ্ধির সেই অবস্থাই বুঝায়। কর্ম্মযোগের দ্বারা ভক্তিযোগ সম্পূর্ণ হয়; আত্মমুক্তিদায়ক বুদ্ধিযোগ কামনাশূন্য কর্ম্মযোগের দ্বারা সার্থক হয়। এইরূপে গীতা নিষ্কাম কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছে এবং সাংখ্যদের কেবল বাহ্যিক, শারীরিক বিধি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীন জ্ঞানের প্রণালীর সহিত যোগ প্রণালীর মিলন করিয়াছে।

কিন্তু এখনও একটা মূল সমস্যার সমাধান হয় নাই। মানুষ সাধারণতঃ যে কর্ম্ম করে, শুধু কামনার বশেই তাহা করিয়া থাকে; অন্তঃকরণ যদি কামনা হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে ত কর্ম্মের কোন প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনীয়তাই থাকিবে না। শরীর রক্ষার জন্য কতকগুলি কর্ম্ম করিতে আমরা বাধ্য হইতে

শ্লোকের "নিযম্য" শব্দটাকে লইয়াই যে এই শ্লোকে "নিয়ত" কথা হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রথমে কৃষ্ণ একটা তথ্য বর্ণনা করিলেন—যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করে সেই শ্রেষ্ঠ—মনসা নিয়ম্য আরভতে কর্ম্মযোগম এবং ঠিক ইহার পরেই এই তথ্যবর্ণনা হইতে একটা উপদেশ বাহির করিলেন, ইহার সারটুকু লইয়া ইহাকে একটি বিধিতে পরিণত করিলেন—নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম —তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর। এখানে "নিয়তম্" শব্দে "নিয়ম্য"কে লওয়া হইয়াছে। বাহ্যবিধির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম নহে, মুক্ত বুদ্ধির দ্বারা নিয়ত কামনা-শূন্য কর্ম্মই গীতার শিক্ষা।

পারি বটে, কিন্তু ইহাও শরীরের কামনার পরাধীনতা এবং সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ইহা হইতেও আমাদের মুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে ইহা সম্ভব নহে, তাহা হইলে (আমাদের ভিতরের কিছুর দ্বারা পরিচালিত না হইয়া) কর্ম্মের কোন বাহ্যবিধি মানিয়া চলা ব্যতীত আর উপায় নাই; বেদের নিত্যকর্ম্ম, যজ্ঞানুষ্ঠান, নির্দ্দিষ্ট দৈনিক কার্য্য, সামাজিক কর্ত্তব্য এইরূপে বাহ্যবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; যাহারা মুক্তি চায় তাহাদিগকে এই সকল কর্ম্ম করিতে হইবে। এই সকল কর্ম্ম যে তাহাদের কামনানুযায়ী এবং মনোমত সেজন্য নহে, শাস্ত্রে মুক্তিকামীগণকে এই সকল কর্ম্ম করিবার বিধি বা আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই তাহাদিগকে এই সকল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু, কর্ম্মের নীতি এরূপ বাহ্য না হইয়া যদি আন্তরিক করিতে হয়, যদি মুক্ত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও কার্য্য তাঁহাদের স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (স্বভাব-নিয়তম্) করিতে হয়—তাহা হইলে কামনা ব্যতীত কর্ম্মের আর কোন আন্তরিক নীতিই নাই; এই কামনা উচ্চ বা নীচ হইতে পারে—শরীরের ভোগের কামমা হইতে পারে, হৃদয় মনের উচ্চ ভাবের কামনা হইতে পারে। কিন্তু এসবই প্রকৃতি গুণের অধীন। অতএব গীতার "নিয়ত কর্ম্ম" বলিতে বেদের "নিত্য-কর্ম্ম" "কর্ত্তব্য কর্ম্ম" (Work that has to be done) বুঝিতে হইবে এবং গীতার যজ্ঞার্থে কর্ম্ম বলিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা শূন্য হইয়া বেদোক্ত যজ্ঞাদির

অনুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু, আমার মনে হয় গীতার অর্থ এরূপ স্থূল ও সহজ নহে, এরূপ সঙ্কীর্ণ এবং দেশ কালে সীমা বদ্ধ নহে। গীতার শিক্ষা উদার, মুক্ত, সূক্ষ্ম এবং গভীর ; ইহা সকল যুগের সকল মনুষ্যেরই উপযোগী। কেবল কোন বিশেষ যুগ বা কোন বিশেষ দেশের নহে। বিশেষতঃ, ইহা সকল সময়েই বাহ্য বিধি নিষেধের, কৃত্রিম আইনকানুনের, খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানের বন্ধন ছাড়াইয়া মূল সত্যের দিকে গিয়াছে, আমাদের স্বভাবের, আমাদের জীবনের প্রধান কথাগুলিরই হিসাব লইয়াছে। উদার দার্শনিক সত্য এবং জীবনের প্রয়োজনোপযোগী আধ্যাত্মিকতা লইয়াই গীতার শিক্ষা—ইহাতে ধর্ম্মের গোঁড়ামি নাই, বাঁধা ধরা বিধি নিষেধ বা বিশেষ মতবাদে ইহা সীমাবদ্ধ নহে।

সমস্যা হইতেছে এই যে আমাদের স্বভাব যখন এইরূপ এবং কামনাই যখন কর্ম্মের সাধারণ নীতি তখন প্রকৃত ভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করা কিরূপে সম্ভব ? কারণ, সাধারণতঃ যে সকল কর্ম্মকে নিঃস্বার্থ কর্ম্ম বলা যায় সেগুলি প্রকৃত নিষ্কাম নহে ; ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্ত্তে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য—দেশের জন্য, মানব জাতির কল্যাণের জন্য সে সকল কর্ম্ম করা হয়। আবার, শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন যে, সকল কর্ম্মই আমাদের স্বভাবের দ্বারা, প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। আমরা যখন শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করি তখনও আমরা নিজেদের স্বভাবের বশেই

কর্ম্ম করি। সাধারণতঃ যে সকল কর্ম্মের বিধি শাস্ত্রে আছে সেগুলি পরোক্ষভাবে আমাদের স্বার্থেরই অনুকূল—আমাদের ব্যক্তিগত জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভাব, স্বার্থ বা অহঙ্কারের অনুকূল; কিন্তু যদিই অন্যরূপ ধরা যায়—যদি সেই সকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের কথা ধরা যায় যেগুলির সহিত আমাদের ছোট বড় কোনরূপ স্বার্থের সম্পর্ক নাই—সেগুলিও আমরা আমাদের স্বভাবের বশেই করিয়া থাকি, কারণ, আমাদের স্বভাব যদি ভিন্নরূপ হইত তাহা হইলে হয়ত আমরা ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে যাইতাম না—হয় আমরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের সুখের অনুসন্ধানেই কর্ম্ম করিতাম অথবা নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য বাছিয়া লইতাম—নতুবা, সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একক তপস্বী বা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতাম। অতএব, আমাদের বাহিরের কোন আইনকানুন মানিয়া আমরা কখনই আমিত্ব বা স্বার্থ শূন্য হইতে পারি না। কারণ আমরা কিছুতেই আমাদের বাহিরে যাইতে পারি না। শুধু, আমাদের ভিতরেই যে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বা রহিয়াছে তাহাতে উঠিতে পারিলে, সর্ব্বভূতের যে এক আত্মা আমাদের ভিতরেও রহিয়াছে সেই মুক্ত এবং "স্বার্থ" শূন্য আত্মার ভিতরে যাইতে পারিলে আমরা প্রকৃত ভাবে স্বার্থ ও আমিত্বের উপরে উঠিতে পারি। আমি যখন বুঝিব যে সংসারে যাহা কিছু আছে তাহার সত্ত্বার সহিত আমার সত্ত্বা এক তখনই আমাদের "স্বার্থ" "পরার্থের" দ্বন্দ্ব ঘুচিবে, তখনই আমরা প্রকৃতভাবে ব্যক্তিত্ব শূন্য,

ক্ষুদ্র নামরূপের বাহিরে যাইতে পারিব, আমিত্ব শূন্য হইতে পারিব। বিশ্বের অতীত যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন, যিনি তাঁহার বিশ্বকর্ম্ম বা ব্যক্তিগত কর্ম্ম কিছুর দ্বারাই বদ্ধ নহেন, সেইখানে আমাদিগকে উঠিতে হইবে। গীতা ইহাই শিক্ষা দিয়াছে—কামনাশূন্যতা ইহারই উপায় মাত্র, শুধু কামনাশূন্যতাই জীবনের লক্ষ্য নহে। বুঝিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে? ভগবান বলিলেন যজ্ঞকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া সকল কর্ম্ম করিয়া ইহা হইতে পারে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ম কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩।৯

—"যজ্ঞার্থে কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে লোক কর্ম্মে বদ্ধ অতএব হে কৌন্তেয়, আসক্তি শূন্য হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর।

শুধু যজ্ঞ এবং সামাজিক কর্ত্তব্য নহে, সকল কর্ম্মই যজ্ঞার্থে করা যাইতে পারে; প্রত্যেক কর্ম্মই হয় ছোট বা বড় স্বার্থের জন্য করা যাইতে পারে অথবা ঈশ্বরার্থে করা যাইতে পারে। প্রকৃতির সকল বস্তু এবং সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বর হইতেই ইহার উৎপত্তি, তাঁহার দ্বারাই ইহা চালিত হয়, এবং তাঁহার দিকে ইহার লক্ষ্য। কিন্তু, যতদিন আমরা অহং জ্ঞানের (ego sense) অধীন ততদিন আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি না, ততদিন আমরা অহংজ্ঞানের বশে স্বার্থের জন্য কর্ম্ম করি, যজ্ঞার্থে নহে। অহঙ্কারই সকল বন্ধনের গ্রন্থি। অহং

সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিলে আমরা এই গ্রন্থি শিথিল করিতে এবং শেষকালে মুক্তিলাভ করিতে পারিব।

যাহাই হউক, গীতা প্রথমে যজ্ঞের বেদোক্ত বর্ণনাই ধরিয়াছে এবং তৎকালীন প্রচলিত ভাষাতেই যজ্ঞের স্বরূপ ব্যক্ত করিরাছে। গীতা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই ইহা করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে সন্ন্যাস ও কর্ম্মের যে বিরোধ তাহা দুই প্রকারের—প্রথমতঃ, সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে বিরোধ, মূলনীতিতে এই বিরোধের সমাধান ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, বেদবাদ ও বেদান্তবাদের মধ্যে যে বিরোধ, তাহা সমাধান করিতে এখনও বাকী আছে। প্রথমটীতে এই বিরোধ সাধারণ ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং কর্ম্ম শব্দ সাধারণ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সাংখ্যের আরম্ভ অক্ষর এবং নিষ্ক্রিয় পুরুষের দিব্য ভাব লইয়া—প্রত্যেক আত্মাই প্রকৃতপক্ষে এইরূপ পুরুষ ; সাংখ্য পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার প্রভেদ করিয়াছে—অতএব কর্ম্মত্যাগই সাংখ্য মতে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। যোগের আরম্ভ ঈশ্বরবাদ লইয়া—ঈশ্বর প্রকৃতির কার্য্যাবলীর প্রভু অতএব তাহাদের উপরে ; সুতরাং কর্ম্মসন্ন্যাস যোগের পরিণতি নহে, কর্ম্মের উপর আত্মার প্রাধান্য লাভ এবং সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলেও বন্ধন হইতে মুক্ত থাকা ইহাই যোগের লক্ষ্য। বেদবাদ ও বেদান্তবাদের মধ্যে যে বিরোধ সেখানে কর্ম্ম বলিতে বৈদিক

কর্ম্ম, এমন কি কোথাও কোথাও বৈদিক যজ্ঞ ও আনুষ্ঠানিক কর্ম্মই বুঝায়—অন্য কর্ম্ম মুক্তির সহায় নহে বলিয়া পরিত্যাজ্য। মীমাংসকগণের যে বেদবাদ তদনুসারে এই সকল কর্ম্ম মুক্তির উপায় স্বরূপ সম্পাদন করিতেই হইবে; উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদান্তবাদ অনুসারে অজ্ঞান অবস্থায় প্রাথমিক প্রক্রিয়া ভাবেই কর্ম্মের উপযোগিতা, শেষে কর্ম্মকে অতিক্রম করিতে হইবে, পরিত্যাগ করিতে হইবে কারণ ইহা মুক্তির পরিপন্থী। বেদবাদ যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের পূজা করিত এবং বিশ্বাস করিত যে তাঁহারা আমাদের মোক্ষলাভে সাহায্য করেন। বেদান্তবাদের মতে দেবতা সকল মানসিক এবং জড় জগতের কর্ত্তা এবং আমাদের মুক্তির পরিপন্থী (উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে মানুষ দেবতাদের গোধন স্বরূপ —তাঁহারা চান না, যে আমরা জ্ঞান লাভ করি বা মুক্ত হই); এই মতে ভগবান অক্ষর ব্রহ্ম—তাঁহাকে যজ্ঞ ও পূজা আদি কর্ম্মের দ্বারা লাভ করা যায় না, জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। কর্ম্মের দ্বারা শুধু ঐহিক ফল এবং নিম্ন স্বর্গ লাভ করা যায়, অতএব, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

গীতা এই বিরোধের মীমাংসা করিয়াছে—গীতা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে যে দেবতারা সকল যজ্ঞ, পূজা, উপাসনার প্রভু সেই একদেবের, ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ মাত্র; এবং যদি ইহা সত্য হয় যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিলে ঐহিক সুখ এবং স্বর্গ লাভ করা যায় তাহা হইলে ইহাও সত্য যে ঈশ্বরের

উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিলে তাহাদের উপরে যাইয়া পরম মুক্তি লাভ করা যায়। কারণ ঈশ্বর এবং অক্ষর ব্রহ্ম বিভিন্ন নহেন, উভয়েই এক—উভয়ের মধ্যে যাহাকে হউক লক্ষ্য করিলেই দিব্য জীবনের অভিমুখী হওয়া যায়। সকল কর্ম্মেরই শেষ ও পূর্ণতা হইতেছে জ্ঞানে—সর্ব্বম্ কর্ম্মাখিলম্ পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। কর্ম্ম-সকল বাধা নহে, তাহারা চরম জ্ঞান লাভের পথ। এইরূপে যজ্ঞ শব্দের উদার ব্যাখ্যা করিয়া এই বিরোধেরও সামঞ্জস্য করা হইল। বাস্তবিক, এই বিরোধ সাংখ্য ও যোগের মধ্যে বৃহত্তর বিরোধেরই একটি বিশিষ্ট রূপ। বেদবাদ এক রকম সঙ্কীর্ণ বিশেষ রকমের যোগ; বৈদান্তিকদের মূল নীতি সাংখ্য-দের সহিত এক, কারণ উভয় মতানুসারেই বুদ্ধিকে প্রকৃতির বহুত্ব হইতে, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় হইতে ফিরাইয়া লইয়া সেই অভিন্ন, অক্ষরে লইয়া আসাই মুক্তি লাভের সাধনা। এইরূপ সামঞ্জস্য সাধনের উদ্দেশ্য মনে রাখিয়াই গীতার গুরু প্রথমে যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু, প্রথম হইতে বরাবরই তাঁহার লক্ষ্য বেদোক্ত যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহাদের উদার ব্যাপক অর্থের উপরই ছিল। এইরূপে সঙ্কীর্ণ আনুষ্ঠানিক ধারণাগুলিকে বিস্তৃত করিয়া তাহাদের মধ্যে বৃহৎ সাধারণ সত্যগুলিকে লওয়া সকল সময়েই গীতার বিশিষ্ট প্রণালী।

দ্বাদশ অধ্যায়

যজ্ঞের মর্ম্ম

গীতা যজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝে তাহা দুইটি বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত করা হইয়াছে। একটী ব্যাখ্যা তৃতীয় অধ্যায়ে, অপরটি চতুর্থ অধ্যায়ে, প্রথমটির ভাষা এরূপ যে শুধু তাহাই ধরিলে যজ্ঞ বলিতে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ (বৈদিক) বুঝায় বলিয়াই মনে হয়; দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যজ্ঞকে উদার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের রূপক বলিয়াই বুঝান হইয়াছে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ॥
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩। ১০-১৬ ॥

"সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ সহিত প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, 'এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর; এই যজ্ঞই তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর; সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন; এইরূপে পরস্পরের সম্বর্দ্ধন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। যজ্ঞের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন; এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না কবিয়া স্বয়ং ভোগ করে সে চোরই। যাহারা যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন; কিন্তু যাহারা কেবল আপনার জন্যই অন্নপাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে। অন্ন হইতে শরীর উৎপন্ন হয়; মেঘের বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, এবং যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে; কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুৎপন্ন; অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহলোকে এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র যে অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ, পাপময়জীবনপরায়ণ সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত

থাকে।" এই স্থানে যজ্ঞ বলিতে বেদানুমোদিত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝাইতেছে বলিয়া যে মনে হয় ইহার প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। শ্রীকৃষ্ণ এখানে যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া কর্ম্ম অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইলেন।

যস্তাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানব।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ ॥৩।১৭,১৮।

"কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত আত্মাতেই পরিতুষ্ট এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক। ইহলোকে তাঁহার কর্ম্ম করিয়া কোন লাভই নাই, কর্ম্ম না করিয়াও কোন লাভ নাই; কোন ইপ্সিত বস্তু লাভের জন্য তাঁহাকে কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না।" তাহা হইলে এখানে দুইটি বিভিন্ন বিরোধী আদর্শ দেখা যাইতেছে। একটি বৈদিক, অপরটি বৈদান্তিক। একদিকে কর্ম্মের আদর্শ। যজ্ঞের দ্বারা ইহকালে ভোগ সুখ ও পরকালে পরমার্থ লাভ এবং মনুষ্য ও দেবগণের পরস্পরের উপর নির্ভরতা; অন্যদিকে মুক্ত পুরুষের কঠোরতর জীবনের আদর্শ—তিনি আত্মসত্তায় স্বাধীন, কর্ম্ম বা ভোগের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই, নরলোক বা দেবলোক লইয়া তিনি ব্যস্ত নহেন—শুধু পরমাত্মার শান্তির মধ্যে তিনি বাস করেন, ব্রহ্মের শান্ত আনন্দে তিনি আনন্দ লাভ

করেন, পরের শ্লোকেই এই দুইটী বিরোধী আদর্শের সমন্বয়ের পথ করা হইয়াছে ; উচ্চতর সত্যের অভিমুখ হইলেই কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না—সেই সত্য লাভ করিবার পূর্ব্বে ও পরে নিস্কাম কর্ম্ম সাধনই গূঢ় রহস্য। মুক্ত পুরুষের কর্ম্মের দ্বারা লাভ করিবার কিছুই নাই, তবে কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়াও তাঁহার কোন লাভ নাই এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাহাকে কর্ম্ম করিতে বা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় না।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।৩।২০।

"অতএব যে কর্ম্ম করিতে হইবে (জগতের জন্য, "লোক সংগ্রহার্থে") সর্ব্বদা অনাসক্ত হইয়া তাহা কর ; কারণ, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মানুষ পরম গতি প্রাপ্ত হয়। জনক প্রভৃতি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।" ইহা সত্য যে কর্ম্ম এবং যজ্ঞ শ্রেয়োলাভের উপায়, শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ। কিন্তু, কর্ম্ম তিন প্রকার—(১) যজ্ঞ-শূন্য যে কর্ম্ম শুধু ব্যক্তিগত ভোগের জন্য করা যায়—ইহা সম্পূর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত, এবং জীবনের মূলনীতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য না থাকায় ইহা ব্যর্থ, মোঘং পার্থ স জীবতি। (২) সকাম হইয়াও যে কর্ম্ম যজ্ঞ সহিত করা যায়—এই কর্ম্মে যে ভোগ সুখ লাভ করা যায় তাহা যজ্ঞের ফলঃস্বরূপ, অতএব ততখানি শুদ্ধ ও পবিত্র। (৩) নিষ্কাম ভাবে বা কোন রূপ আসক্তি না

রাখিয়া যে কর্ম্ম করা যায়। শেষোক্ত প্রকারের কর্ম্মের দ্বারাই পরম গতি লাভ করা যায়, পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।

যজ্ঞ, কর্ম্ম, ব্রহ্ম—এই শব্দের আমরা যেরূপ অর্থ করিব তাহার উপরেই এই শিক্ষার সারমর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। যজ্ঞ বলিতে যদি আমরা বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝি, যে কর্ম্ম হইতে ইহার উদ্ভব তাহা যদি বেদোক্ত কর্ম্মবিধি হয় এবং যে ব্রহ্ম হইতে সকল কর্ম্মের উদ্ভব তাহা বলিতে যদি আমরা "শব্দ ব্রহ্ম" বা বেদ বুঝি—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এখানে গীতা বেদোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছে, ইহার অধিক আর কিছুই নাই। আনুষ্ঠনিক যজ্ঞই পুত্র, ধন, ভোগলাভের প্রকৃষ্ট উপায়; আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দ্বারাই বৃষ্টি হয় এবং তাহার দ্বারা প্রজার সম্পদ ও পালন হইয়া থাকে; সমস্ত জীবনই মানুষ এবং দেবগণের মধ্যে অনবরত আদান প্রদানের ব্যাপার—এখানে মানুষ দেবগণের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তুর দ্বারা দেবগণের সম্বর্দ্ধন করে এবং তাহার ফলে নিজেরা সম্পদ্‌শালী হয়, রক্ষিত হয়, সম্বর্দ্ধিত হয়। অতএব, সকল কর্ম্মকেই আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের সহিত করিতে হইবে; যে সকল কর্ম্ম এইরূপে দেবগণের উদ্দেশ্যে করা না হয় তাহা অভিশপ্ত, দেবগণকে উৎসর্গ না করিয়া যে ভোগ তাহা পাপ। এমন কি পরম শ্রেয়ঃ, মুক্তি পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। যজ্ঞ কখনও পরিত্যাগ করা চলিবে না। এমন কি মুক্তিকামী ব্যক্তিগণকেও অনাসক্ত ভাবে আনুষ্ঠানিক

যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে; এইরূপে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ ও নিত্তনৈমিত্তিক কর্ম্ম অনাসক্ত ভাবে সম্পাদন করিয়াই জনকাদি মহাত্মাগণ মুক্তি ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

গীতার অর্থ যে এরূপ নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়, কারণ এরূপ অর্থ গীতার বাকী সমস্ত অংশের বিপরীত। এমন কি গীতার এই স্থানেই যাহা বলা হইয়াছে, (অন্য স্থানের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা না ধরিলেও) তাহা হইতে যজ্ঞের উদার অর্থই বুঝা যায়। —কারণ, এখানে বলা হইয়াছে "কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উদ্ভূত হয়, কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উৎপন্ন, অতএব সর্ব্বগত (সর্ব্ব্যাপী) ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।" এখানে এই "অতএব" শব্দের ব্যবহার এবং "ব্রহ্ম" শব্দের পুনর্ব্যবহার প্রণিধান যোগ্য; কারণ, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং (ব্রহ্ম হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি) এই স্থলে ব্রহ্মের অর্থ বেদ নহে, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বকর্ম্মে বর্ত্তমান এক ব্রহ্ম। ভগবানের, অনন্তের জ্ঞানই বেদ—পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো"

"বেদ সকলে দ্বারা আমিই বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়।" কিন্তু, তিনি প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে, ত্রিগুণের ক্রিয়ার মধ্যে যেরূপ বেদে শুধু তাঁহাকে সেইরূপই জানা যায়। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ। প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যস্থিত যে ব্রহ্ম তাহা অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত—এই পুরুষ প্রকৃতির সমস্ত গুণ

ক্রিয়ার উপরে, নিস্ত্রৈগুণ্যঃ। ব্রহ্ম এক কিন্তু ইহার আত্মা প্রকাশের স্বরূপ দুই প্রকার—অক্ষর পুরুষ এবং ক্ষর জগতে সকল কর্ম্মের স্রষ্টা ও উদ্ভবকর্ত্তা, আত্মা, সর্ব্বভূতানি; ইহা ভূত সকলের অচল সর্ব্বব্যাপী আত্মা এবং ইহা ভূত সকলের সচল ক্রিয়ার আধ্যাত্মিক সত্ত্ব—আত্মসংস্থ পুরুষ এবং প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল পুরুষ, ইহা অক্ষর এবং ক্ষর। এই উভয় স্বরূপেই ভগবান, "পুরুষোত্তম," বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন; সর্ব্ব গুণের অতীত অক্ষরই তাঁহার শান্তি, আত্মস্থত্য সমতার অবস্থা, "সমম্ ব্রহ্ম"; তথা হইতেই প্রকৃতির গুণে এবং বিশ্বলীলার মধ্যে তাহার আত্ম প্রকাশ, এই প্রকৃতিস্থ পুরুষ হইতে, এই সগুণ ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্ম্মের * উৎপত্তি; এই কর্ম্ম

* এইরূপ ব্যাখ্যাই যে সমীচীন অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতেই তাহা বুঝা যায়, সেখানে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি বর্ণিত হইয়াছে অক্ষর (ব্রহ্ম), স্বভাব, কর্ম্ম, ক্ষর, ভাব, পুরুষ, অধিযজ্ঞ। যিনি অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম, আত্মা (spirit of self); স্বভাবই অধ্যাত্ম (স্ব-ব্রহ্ম, ভাব-উৎপত্তি, অংশক্রমে জীবরূপে উৎপন্ন ব্রহ্মই দেহাবলম্বনে সুখ দুঃখাদির ভোক্তা), ইহা অক্ষর আত্মা হইতে উৎপন্ন; প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধক বিসর্গই কর্ম্ম শব্দবাচ্য অতএব সংসারে এই যে অনিত্য বস্তু ও [illegible] সমূহ এ সকল কর্ম্মেরই ফল স্বভাব হইতেই ক্ষর ভাব উৎপন্ন; অন্ত [illegible] পুরুষ—এই দেহে তাহাই দেবাংশ অধিদৈবতম, তাঁহার অবস্থান [illegible] কর্ম্ম সকল অন্তরস্থ ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ স্বরূপ হইয়া থাকে; এই যে দেবতা যজ্ঞ গ্রহণ করেন, তিনিই অধিযজ্ঞ।

হইতেই যজ্ঞের তত্ত্ব উদ্ভূত। এমন কি দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে দ্রব্যাদির আদান প্রদান তাহাও এই তত্ত্বেরই অনুসরণে ঘটিয়া থাকে, যথা—যে বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় সেই বৃষ্টি এই কর্ম্মের উপর নির্ভর করে এবং অন্ন হইতে ভূত-গণের শরীরের উদ্ভব হয়। কারণ প্রকৃতির সকল ক্রিয়াই প্রকৃত পক্ষে যজ্ঞ এবং ভগবানই সকল কর্ম্ম ও যজ্ঞের ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের মহেশ্বর—ভোক্তারম যজ্ঞতপসাম্ সর্ব্বভূত মহেশ্বরম্। এই "সর্ব্বগতম্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" ভগবানকে জানাই প্রকৃত বৈদিক জ্ঞান।

কিন্তু দেবগণের ভিতর দিয়া তাঁহার যে নিম্নস্তরের ক্রিয়া সেই ক্রিয়াতে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। দেবগণ প্রকৃতিতে ভগবানেরই শক্তি। দেব ও মনুষ্য পরস্পরের প্রতি আদান প্রদানের দ্বারা যে সম্বর্দ্ধিত হইতেছে ইহার অনুসরণ করিয়া মনুষ্য ক্রমশঃ শ্রেয়োলাভের যোগ্য হইয়া উঠে। মানুষ বুঝিতে পারে যে জগতে ভগবানের যে লীলা চলিতেছে তাহার নিজের জীবন সেই লীলারই অংশ মাত্র—তাহা স্বতন্ত্র কিছু নহে; এবং এই লীলার জন্যই এই জীবন যাপন করিতে হইবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। সে সংসারে যে সকল ভোগ ও কাম্য লাভ তাহা তাহার নিজের চেষ্টায় লব্ধ বলিয়া ভাবে না। সেই যজ্ঞের ফল এবং দেবতাদের দান বলিয়াই গ্রহণ করে। ভাব তাহার ভিতরে যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই সে নিজের সকলকে দমন করে, যজ্ঞকেই জীবনের ও কর্ম্মের নীতি-

রূপে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, যজ্ঞের অবশেষ স্বরূপ যাহা থাকে তাহাতেই তৃপ্ত হয়, বাকি সমস্ত নিঃসঙ্কোচে তাহার জীবন এবং বিশ্বের জীবনের মধ্যে কল্যাণকর মহান্ আদান প্রদানে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করে। যাহারা কর্ম্মে এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে এবং স্বতন্ত্র স্বার্থের জন্যই ভোগ ও কর্ম্মের অনুসরণ করে তাহাদের জীবন বৃথা; তাহারা জীবনের এবং আত্মোন্নতির প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পায় না। যে পথে পরম শ্রেয়োলাভ করা যাইতে পারে তাহারা সে পথের পথিক নহে। *কিন্তু, পরম শ্রেয়ঃ তখনই লাভ করা যায় যখন আর শুধু দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ না করিয়া সেই সর্ব্বব্যাপী, যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে করা হয়। দেবগণ সেই পরমেশ্বরের নিম্নতর রূপ ও শক্তি মাত্র। পরম শ্রেয়োলাভ তখনই হয়, যখন মানুষ নিম্নপ্রকৃতির কামনা, বাসনা পরিত্যাগ করে, নিজে সমস্ত করিতেছে এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃতিকেই সকল কর্ম্মের প্রকৃত কর্ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিজেকে ভোক্তা বলিয়া মনে না করিয়া বিশ্বাত্মা পরমপুরুষকেই প্রকৃতির সকল কার্য্যের ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করে। নিজের ব্যক্তিগত ভোগে নহে, কিন্তু সেই পরমাত্মাতেই তখন সে পরম শান্তি, তৃপ্তি ও বিমল আনন্দ ভোগ করে; তখন কর্ম্ম বা কর্ম্মশূন্যতায় তাহার কোন লাভালাভ থাকে না, তখন কোন বস্তুর জন্য দেব বা মনুষ্য কাহারও সে মুখ চাহিয়া থাকেনা, কাহারও নিকট কোন লাভের প্রত্যাশা করে না কারণ আত্মানন্দেই তাহার সম্পূর্ণ

তৃপ্তি, কিন্তু সে শুধু ভগবানের জন্যই যজ্ঞরূপে আসক্তিও কামনা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করে। এইরূপে সে সমতা লাভ এবং প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্তি লাভ করে, নিস্ত্রৈগুণ্যঃ হয়; তাহার আত্মা প্রকৃতির অনিশ্চয়তার মধ্যে নহে, কিন্তু অক্ষর ব্রহ্মের শান্তিতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদিও সেই সময় প্রকৃতির লীলার মধ্যেই তাহার কর্ম্ম চলিতে থাকে। এইরূপে যজ্ঞই হয় তাহার পরম শ্রেয়ঃলাভের পথ।

গীতায় পরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিলাম তাহাই ঠিক। পরে বলা হইয়াছে, "লোক সংগ্রহই" কর্ম্মের উদ্দেশ্য; একমাত্র প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, দৈব পুরুষই সকল কার্য্যের ভর্ত্তা (upholder) এবং সকল কর্ম্ম কার্য্যকালেই তাহাকে অর্পণ করিতে হইবে, (এইরূপে ভিতরে কর্ম্মের অর্পণ ও বাহিরে কর্ম্মের সম্পাদন ইহাই যজ্ঞের পূর্ণতা) এইরূপে সমতার সহিত বাসনাশূন্য হইয়া যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ৪।২২-২৩

যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট, কার্য্যে সফলতা বা

বিফলতায় যাহার সমভাব তিনি কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হন না। যখন কোন আসক্তিহীন মুক্ত পুরুষ যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম করেন তখন তাঁহার সমুদায় কর্ম্ম লয়প্রাপ্ত হয়" অর্থাৎ তাঁহার মুক্ত, শুদ্ধ, সিদ্ধ এবং সমতাপ্রাপ্ত আত্মার উপর সে সকল কর্ম্মের পরিণাম স্বরূপ বন্ধন রহিয়া যায় না বা কোন দাগ পড়ে না। পরে আবার আমরা এই সকল শ্লোকের আলোচনা করিব। ইহাদের পরেই যজ্ঞের যে বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যে ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা হইতেই নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, যে এই সকল কথা রূপক ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গীতায় যে যজ্ঞের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাহ্যিক নহে, আন্তরিক। প্রাচীন বৈদিক প্রথায় সর্ব্বত্রই দুই প্রকার অর্থ ছিল—শারীরিক এবং মানসিক, বাহ্যিক এবং রূপক, যজ্ঞের বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং তাহার সকল বিধানের গূঢ় অর্থ। কিন্তু, প্রাচীন বৈদিক-দের সেই গূঢ় কবিত্বময় রূপকের মর্ম্ম লোকে বহুদিনই ভুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে গীতাতে বেদান্ত এবং যোগের শিক্ষা অনুসারে যজ্ঞের উদার দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি ভৌতিক (material) অগ্নি নহে, উহা ব্রহ্মাগ্নি; সংযমই অগ্নি অথবা শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ক্রিয়াই অগ্নি অথবা প্রাণায়ামের দ্বারা নিয়মিত প্রাণশক্তিই অগ্নি, অথবা আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অগ্নি। যজ্ঞের অবশিষ্ট যাহা ভক্ষণ করা হয় তাহাকে অমৃত বলা হইয়াছে—তাহা ভোজন করিলে অমরত্ব লাভ করা যায়, এখানে প্রাচীন বৈদিক রূপকের কিছু রহিয়াছে—

সোমরস অমৃতের রূপক, দেবতাগণকে যজ্ঞের দ্বারা তুষ্ট করিয়া মানুষ ইহা লাভ করে এবং ইহা পান করিয়া স্বর্গের চির আনন্দ ভোগ করে। মানুষ শরীর বা মনের দ্বারা যে কোন কর্ম্ম দেবতাদের বা ভগবানের উদ্দেশ্যে করে, অথবা নিজের ঊর্দ্ধতম আত্মা অথবা মানব জাতি ও সর্ব্বভূতের আত্মার উদ্দেশ্য করে তাহাই এই যজ্ঞার্পণ।

যজ্ঞের এই বিশদ ব্যাখ্যার আরম্ভ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে যজ্ঞের ক্রিয়া, যজ্ঞের সমগ্রী, যজ্ঞের কর্ত্তা, যজ্ঞের গৃহীতা, যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সবই সেই এক ব্রহ্ম।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা।৪।২৪

"অর্পণ ব্রহ্ম, উৎসর্গের খাদ্য ব্রহ্ম, ব্রহ্মের দ্বারাই ইহা ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত, ব্রহ্মকর্ম্মে সমাধির দ্বারা ব্রহ্মই লভ্য।" অতএব, এই জ্ঞানেই মুক্ত পুরুষকে যজ্ঞকর্ম্ম করিতে হইবে। "সোঽহম্" "সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম" এই সকল মহান বৈদিক বাক্যে এই জ্ঞানই সূচিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ণ একত্বের জ্ঞান; সেই "একই কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্ম এবং কর্ম্মের লক্ষ্যরূপে আবির্ভূত, জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত। যে বিশ্বশক্তিতে কর্ম্ম অর্পণ করা হয় তাহা ভগবান, অর্পণের ক্রিয়া ভগবান; যাহা অর্পণ করা হয় তাহা ভগবানেরই কোন বিশেষরূপ; যিনি অর্পণ করেন তিনিও মানুষের ভিতরে ভগবান ভিন্ন আর কেহ নহেন, ক্রিয়া, কর্ম্ম, যজ্ঞ সবই গতিরূপে, কর্ম্মরূপে ভগবান;

যজ্ঞের দ্বারা যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে হইবে তাহাও ভগবান। যে মনুষ্য এই জ্ঞানের অধিকারী এবং এই জ্ঞানানুসারে জীবন যাপন করে, কর্ম্ম করে—কর্ম্ম তাহার পক্ষে কোন বন্ধনই নহে, তাহার ব্যক্তিগত, অহংকৃত কোন কর্ম্ম থাকিতে পারে না, শুধু দৈব পুরুষ তাঁহার নিজেরই সত্তায় দৈবী প্রকৃতির দ্বারা কার্য্য করেন, তাঁহার আত্মজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বশক্তিরূপ অগ্নিতে সমস্ত অর্পণ করেন। ঈশ্বরমুখী এই সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইতেছে ভগবদ্‌জ্ঞান ও ভগবত জীবন লাভ। ইহা জানিলে এবং এই ঐক্য জ্ঞানে জীবন যাপন করিতে, কর্ম্ম করিতে পারিলে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু যোগিগণের মধ্যে ও সকলেই এই জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥৪।২৫

"অন্য যোগিগণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ; অপর যোগিরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞার্পণ করেন।" প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা ভগবানকে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন শক্তিতে কল্পনা করেন এবং বিভিন্ন উপায়, অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে চান ; শেষোক্ত ব্যক্তিরা জানেন যজ্ঞের সহজ সরল মর্ম্ম কি, তাঁহারা সকল কর্ম্মই ভগবানে অর্পণ করেন এবং তাঁহাদের কর্ম্ম ও শক্তি ভগবদ্‌জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করেন—ইহাই তাহাদের একমাত্র উপায়, একমাত্র ধর্ম্ম।

যজ্ঞের উপায় বিবিধ, অর্পণ নানা প্রকারের। আত্মসংযমরূপ যে মানসিক যজ্ঞ তাহার দ্বারা উচ্চ আত্মজয় এবং উচ্চ জ্ঞান লাভ করা যায়।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ৪।২৬।২৭

"কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন, অন্য কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকলকে নিক্ষেপ করেন। অপরে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদীপ্ত আত্মসংযম-যোগরূপে অগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং প্রাণকর্ম্ম হোম করেন।" অর্থাৎ, একরকমের সাধনা আছে, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ গ্রহণ করা হয় অথচ এই ইন্দ্রিয়ক্রিয়ায় মনকে বিচলিত হইতে দেওয়া হয় না, ইন্দ্রিয়গণই হোমের পবিত্র অগ্নিস্বরূপ হয়; আর এক রকম সাধনা আছে, যাহাতে ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত করা হয় অতএব মনের ক্রিয়ার অন্তরাল হইতে শান্ত, স্থির আত্মা তাহার পবিত্রতায় আবির্ভূত হয়; আর এক রকম সাধনা আছে—যখন আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, এই সাধনার দ্বারা আত্মাকে জানিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং সমস্ত প্রাণকর্ম্ম সেই এক, স্থির শান্ত আত্মাতে গৃহীত হয়। যাহারা সিদ্ধির জন্য যত্ন করিতেছেন, তাহাদের যজ্ঞ স্থূল দ্রব্য সম্পর্কে হইতে পারে, দ্রব্যযজ্ঞ—ভক্ত যখন নৈবিদ্যাদির

দ্বারা দেবতার পূজা করে তখন এইরূপ দ্রব্যযজ্ঞই করিয়া থাকে; অথবা আত্মসংযমের কঠোর সাধনা এবং কোন উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করাও একরকম যজ্ঞ হইতে পারে, তপোযজ্ঞ; অথবা রাজযোগী এবং হঠযোগীদের প্রাণায়াম বা অন্য কোনরূপ যোগযজ্ঞ হইতে পারে। এই সমস্তই আত্মশুদ্ধির সহায়ক; সকল যজ্ঞই শ্রেষ্ঠপদলাভের একটি পথ।

এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে একটি প্রধান জিনিষ যাহা মূল নীতিরূপে সকলগুলিরই ভিতরে রহিয়াছে তাহা এই—নিম্নস্তরের ক্রিয়াগুলিকে দমন করিতে হইবে, বাসনার আধিপত্য কমাইয়া উচ্চস্তরের শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ত্যাগের দ্বারা, আত্মোৎসর্গের দ্বারা, আত্মজয়ের দ্বারা,—নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চতর ও বৃহত্তর আদর্শ গ্রহণের দ্বারা যে স্বর্গীয় আনন্দ পাওয়া যায় তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥

যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন। যজ্ঞই সংসারের নীতি। ইহকালে প্রভুত্ব, পরকালে স্বর্গ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ কিছুই যজ্ঞ ব্যতীত পাওয়া যায় না।

নায়ং লোকঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে॥

কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥

৪।৩২।৩৫

যিনি যজ্ঞ করেন না, তাহার পক্ষে ইহলোকই নাই, পরলোক

ত দূরের কথা। অতএব, এই সমস্ত যজ্ঞ এবং অন্যান্য অনেক প্রকার যজ্ঞ "বিততা ব্রহ্মণো মুখে" ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত হয় (Extended in the mouth of the Brahman, the mouth of that Fire which receives all offerings). এই সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন; ঈশ্বরের যে এক বিরাট শক্তি বিশ্বব্যাপী কর্ম্মে আবির্ভূত—সকল যজ্ঞই তাহা হইতে উদ্ভূত—এইরূপে বিশ্বের সকল ক্রিয়াই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্বরূপ হয় এবং মানুষের পক্ষে ইহার শেষ অবস্থা হইতেছে আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান। "এইরূপে জানিয়া তুমি মুক্তিলাভ করিবে।"

কিন্তু, এই সকল বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বিভিন্ন স্তর আছে—দ্রব্যযজ্ঞ সর্ব্বনিম্ন স্তরের, জ্ঞানযজ্ঞ সর্ব্বোচ্চ স্তরের। জ্ঞানেই এই সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি—নিম্নস্তরের জ্ঞানে নহে, উচ্চতম জ্ঞানে, আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে। এই জ্ঞান আমরা তাঁহাদের নিকট হইতেই শিক্ষা করিতে পারি যাঁহারা সৃষ্টিরমূলতত্ত্বসমূহ অবগত আছেন, তত্ত্বদর্শিনঃ। এই জ্ঞান লাভ করিলে আর আমরা মোহে পতিত হইব না এবং শুধু ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ভোগের বন্ধন, বা নীচ বাসনা, কামনার বন্ধনে বদ্ধ হইব না। যে জ্ঞানে সমস্ত পরিসমাপ্ত সেই জ্ঞানের দ্বারা "তুমি সমস্ত ভূতকে আত্মার মধ্যে এবং পরে আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে।" কারণ আত্মা সেই এক, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বময়, সৎবস্তু—আমাদের মানসিক জীবনের পশ্চাতে লুক্কায়িত ব্রহ্ম—আমাদের জ্ঞান যখন অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়, তখন

বিস্তৃত হইয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়; আমরা সকলকেই সেই এক সত্ত্বার মধ্যেই বিভিন্ন ভূতরূপে দেখিতে পাই।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥
তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা নপুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথোময়ি॥ ৪।৩৪।৩৬

কিন্তু, এই যে আত্মা বা অক্ষর ব্রহ্ম, ইহাও আমাদের মানসিক চেতনার সম্মুখে এক শ্রেষ্ঠপুরুষেরই আত্ম-অভিব্যক্তি; তিনিই আমাদের অস্তিত্বের মূল এবং যাহা কিছু ক্ষর বা অক্ষর আছে সে সব তাঁহারই অভিব্যক্তি। তিনি ঈশ্বর, দেব, পুরুষোত্তম। তাঁহাকেই আমরা যজ্ঞরূপে সমস্ত অর্পণ করি; তাঁহার হস্তেই আমাদের কর্ম্ম সমর্পণ করি, তাঁহারই সত্ত্বায় আমরা জীবন ধারণ করি, চলা ফেরা করি। আমাদের প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এবং তাহাতে অবস্থিত সর্ব্বভূতের সহিত মিলিত হইয়া আমরা তাঁহার সহিত এবং সর্ব্বভূতের সহিত আমাদের আত্মসত্তায় ও শক্তিতে এক হই, যুক্ত হই। বাসনা বর্জ্জন করিয়া, যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়া, আমরা জ্ঞানলাভ করি এবং আত্মা নিজেকে ফিরিয়া পায়; আত্ম জ্ঞানের সহিত ঈশ্বর-জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করিয়া আমরা ঐশ্বরিক সত্ত্বায় একত্ব, শান্তি ও আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যজ্ঞের অধীশ্বর

আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে এতদূর পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার মূল তত্ত্বগুলি পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক। গীতার সমগ্র কর্ম্মবাদ যজ্ঞতত্ত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত; বাস্তবিক ঈশ্বর, জগৎ এবং কর্ম্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ গীতায় কর্ম্মবাদের মধ্যেই তাহা আছে। মানুষের মন সাধারণতঃ জগৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুমুখী সনাতন সত্যের আংশিক ভাব গ্রহণ করিয়া জীবন, ধর্ম্ম এবং নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করে—কখনও এক দিকে, কখনও আর এক দিকে বিশেষ ঝোঁক দেয়; কিন্তু, যখনই কোন জ্ঞানপ্রধান যুগে ঈশ্বর, জগৎ এবং আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানের সমন্বয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে তখনই সত্যের সমগ্র অখণ্ড স্বরূপের দিকে মানুষের ঝোঁক হয়! সংসারে যাহা কিছু আছে তাহাই সেই এক ব্রহ্ম, সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেরই চক্র—ঈশ্বর হইতে বাহির হইয়া ঈশ্বরেই ফিরিয়া যাওয়া রূপ ঐশ্বরিক লীলা—এই মূল বৈদান্তিক সত্যের উপরই গীতার শিক্ষার ভিত্তি। সমস্তই প্রকৃতির প্রকাশক লীলা এবং প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি—প্রকৃতি তাহার কর্ম্মের প্রভুর এবং তাহার দেহ সকলের অধিবাসী আত্মারই ইচ্ছা সম্পাদন করিতেছে। তাঁহারই তৃপ্তির নিমিত্ত প্রকৃতি বস্তুর বাহ্যলীলায় এবং প্রাণ ও মনের কর্ম্মে অবতীর্ণ হইতেছে,

আবার মন ও আত্মজ্ঞানের ভিতর দিয়া তাহার মধ্যে যে আত্মা বাস করিতেছে তাহাকে স্বজ্ঞানে লাভ করিতে ফিরিয়া যাইতেছে। প্রথমে আত্মা বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, প্রাকৃতিক লীলার বিকাশ হইতেছে, পরে আত্মা আবার স্বরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই যে প্রকৃতির চক্র—ইহা কখনও সম্ভব হইত না—যদি পুরুষ তাঁহার শাশ্বত তিনটি অবস্থায় একই সময়ে থাকিতে না পারিতেন। ক্ষর রূপে তাঁহাকে আবির্ভূত হইতেই হয়, এবং এইখানে আমরা তাঁহাকে সসীম, বহু, "সর্ব্বভূতানি" রূপে দেখিতে পাই। সংসারে যে অসংখ্য বৈচিত্র-বিশিষ্ট অসংখ্য জীব রহিয়াছে,তাহাদের বিভিন্ন আত্মারূপে এবং তাহাদের পশ্চাতে জাগতিক ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা যে সকল দেবতা রহিয়াছেন তাহাদেরও আত্মা ও শক্তিরূপে তিনি প্রকট হন। আবার সকল বস্তু ও রূপের অন্তরে ও পশ্চাতে গুপ্ত ভাবে রহিয়াছে এক অক্ষর, এক অসীম, এক অনন্ত, এক অরূপ, জগতের অপরিবর্ত্তনশীল অখণ্ড আত্মা—সেখানে সকল বহু নিজেদিগকে বস্তুতঃ এক বলিয়াই দেখিতে পায়। অতএব সেইখানে ফিরিয়া জীব বুঝিতে পারে যে সে নিজেকে এক বিশ্বব্যাপী শান্তির বিশালতার মধ্যে এবং অক্ষর, অনাসক্ত একত্বের মধ্যে আনিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু, শ্রেষ্ঠ রহস্য, উত্তমম্ রহস্যম্ হইতেছে পুরুষোত্তম। ইঁহাই শ্রেষ্ঠদেব, ঈশ্বর—তাঁহার ভিতর সান্ত ও অনন্ত দুইই রহিয়াছে, তাঁহাতে সরূপ এবং অরূপ, এক আত্মা এবং সর্ব্বভূত, জাগতিক ক্রিয়া এবং জগতের উর্দ্ধে শান্তি, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি মিলিয়াছে, একত্র

হইয়াছে, এক সঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে। ঈশ্বরের মধ্যেই সকল বস্তুর নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং তাঁহার মধ্যেই সকলের পূর্ণ সামঞ্জস্য হইয়াছে।

সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা বস্তুতঃ প্রকৃতির দ্বারা পুরুষের উদ্দেশ্যে কর্ম্মযজ্ঞ। প্রকৃতিতে আত্মা চৈতন্যের যে স্তরে উঠিয়াছে তদনুসারে ইহা দেবতার পূজা করিবে, তদনুযায়ী আনন্দের সন্ধান করিবে এবং তদনুরূপ ফল কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। এবং প্রকৃতিতে ক্ষর পুরুষের যে লীলা তাহা সমস্তই আদান প্রদান; কারণ, জগৎ এক এবং ইহার বিভিন্ন বিভাগগুলি পরস্পর পরস্পরের উপরই নির্ভর করিতেছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাহায্যে বাড়িয়া উঠিতেছে, বাঁচিয়া রহিয়াছে—এই আদান প্রদানের নীতির উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। যেখানে ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্যাগ নাই, প্রকৃতি সেখানে জোর করিয়া তাহা আদায় করে এবং এইরূপে জাগতিক নীতি পালন করে। পরস্পর দেওয়া এবং লওয়া ইহাই জীবনের নীতি, ইহা ভিন্ন জীবন এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারেনা; এই সত্যই জগতে ভগবৎ ইচ্ছার নিদর্শন—যজ্ঞকে চিরসাথী করিয়া ভগবান যে প্রজা সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহাই সে বিষয়ে প্রমাণ। বিশ্বব্যাপী এই যে যজ্ঞের নীতি-- ইহা হইতেই বুঝা যায় যে জগৎ ভগবানেরই এবং সংসার তাঁহারই পূজার মন্দির, স্বার্থসুখ এবং আত্মভোগের ক্ষেত্র নহে। জীবন যাত্রার উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি নহে, স্বার্থ লইয়াই আরম্ভ বটে; ক্রমশঃ স্বার্থকে বড় করিতে হইবে, যজ্ঞকে

ক্রমশঃ বড় করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ, সম্পূর্ণ আত্মদান করিতে হইবে—এইরূপে ভগবানের, অনন্তের পূজা করিতে হইবে, শেষে ভগবানকে পাইতে হইবে—ইহাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

কিন্তু, মানুষ অজ্ঞান লইয়াই আরম্ভ করে এবং বহুদিন অজ্ঞানেই থাকে। অহঙ্কারে একান্ত নিবিষ্ট মানুষ মনে করে যে সংসার তাহার নিজেরই জন্য, ভগবানের নহে। সে নিজেকেই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, সে বুঝে না যে সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার নিজেরও ভিতরের ও বাহিরের সকল কর্ম্মই এক বিশ্ব প্রকৃতির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে নিজেকে সকল কর্ম্মের ভোক্তা বলিয়া মনে করে এবং ভাবে যে তাহার জন্যই সব, প্রকৃতির কাজ তাহাকেই তৃপ্ত করা, তাহারই ব্যক্তিগত ইচ্ছা পালন করা। সে বুঝিতে পারে না যে প্রকৃতি তাহাকে তৃপ্ত করিতে, তাহার ইচ্ছা পালন করিতে মোটেই ব্যস্ত নহে, কিন্তু প্রকৃতি এক উচ্চতর বিশ্বগত ইচ্ছার অনুসরণ করে, যে ভগবান প্রকৃতির, প্রকৃতির কার্য্যের এবং সৃষ্টির অতীত সেই ভগবানকেই তৃপ্ত করিতে চায়; ব্যক্তির জীবন, তাহার ইচ্ছা এবং তাহার তৃপ্তি—এ সকল তাহার নিজের নহে, এ সকলই প্রকৃতির; প্রকৃতি এই সকলকে প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানের নিকট যজ্ঞরূপে অর্পণ করে এবং অলক্ষ্যে সকলকে এই ভগবদিচ্ছা পূরণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। জীব এই সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং অহঙ্কারই এই অজ্ঞানতার চিহ্ন; এই অজ্ঞানের

বশে জীব যজ্ঞের নীতি অগ্রাহ্য করে, যতটা পারে নিজেই গ্রহণ করে এবং শুধু ততটুকুই দেয় যতটুকু প্রকৃতি ভিতরে এবং বাহিরে জোর করিয়া আদায় করিয়া লয়। বাস্তবিক প্রকৃতি জীবের প্রাপ্য অংশ, দেবতাদত্ত-ভোগ বলিয়া জীবকে যতটুকু লইতে দেয় তাহার অধিক জীব কিছুই লইতে পারে না। এই যজ্ঞের জগতে যে স্বার্থপর ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ দেবশক্তি সমূহের শুধু দান গ্রহণ করে কিন্তু, প্রতিদানে কিছু ফিরাইয়া দিতে চাহে না সে চোর, ডাকাতেরই অনুরূপ। সে জীবনের প্রকৃত মর্ম্মের সন্ধান পায় নাই, কারণ সে যজ্ঞার্থে জীবনযাপন ও কর্ম্মের দ্বারা আত্মার প্রসার ও উন্নতি সাধন করে না, তাহার জীবন ব্যর্থ।

মানুষ যেমন নিজের শক্তির এবং নিজের অভাব অভিযোগের কদর করে তেমনই যখন অপরের সম্বন্ধেও করিতে আরম্ভ করে, মানুষ যখন তাহার স্বকর্ম্মের পশ্চাতে বিশ্বপ্রকৃতিকে উপলব্ধি করিতে এবং বিশ্বদেবসমূহের ভিতর দিয়া সেই এক এবং অনন্তের সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে—শুধু তখনই সে অহঙ্কারের বন্ধন অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ এবং আত্মার সন্ধান লাভের পথে পথিক হয়। সে তখন তাহার বাসনা ও কামনারও উপরে যে নীতি আছে, তাহার সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে এবং উপলব্ধি করে যে, তাহারা সমস্ত বাসনা ও কামনাকে ক্রমশঃ ঐ নীতির বশ ও অধীন করিতে হইবে। সে তখন নিজের ব্যক্তিগত দাবি অপেক্ষা অপরের দাবির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়; সে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার বিরোধ স্বীকার করে এবং তাহার

বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়া তাহার নিজের জ্ঞান ও জীবনের বিকাশের পথ পরিষ্কার করে। সে প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সকল দেবতা রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, বুঝিতে পারে যে ইহারা তাহার ভক্তি ও পূজার পাত্র—ইহাদিগকে মান্য করিতে হইবে, ইঁহাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে হইবে; তাঁহাদের দ্বারা এবং তাঁহাদের নিয়মের দ্বারা মানসিক জগৎ এবং জড়জগত উভয়ই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; সে আরও শিখে যে তাহার চিন্তায় এবং বুদ্ধিতে এবং জীবনে সেই শক্তি সমূহের আবির্ভাব যত অধিক হইবে কেবল ততখানিই শক্তি, জ্ঞান, ধর্ম্মকর্ম্ম বর্দ্ধিত হইবে, এবং সেই সঙ্গে তাহার সুখ ও তৃপ্তিও বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপে সে জীবনকে শুধু জড়বুদ্ধিতে না দেখিয়া ধর্ম্মভাবে, আধ্যাত্মিক ভাবে দেখে এবং এইরূপে সসীমের ভিতর দিয়া অসীমকে লাভ করিতে প্রস্তুত হয়।

কিন্তু, ইহা একটি দীর্ঘ মধ্যবর্ত্তী অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানেও বাসনাই তাহার কর্ম্মের নীতি, তাহার স্বার্থই কেন্দ্র এবং প্রকৃতিই তাহার জীবনও কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে; তবে এখানে বাসনা সংযত নিয়ন্ত্রিত, এখানে প্রকৃতি উচ্চ সত্ত্বভাবাপন্ন এই সমস্তই ক্ষর, সসীম, নামরূপের গণ্ডীর মধ্যে—তবে এই গণ্ডী খুব বিস্তৃত বটে। প্রকৃত আত্মজ্ঞান, অতএব কর্ম্মেরও প্রকৃত নীতি এই অবস্থারও অতীত, কারণ জ্ঞানের সহিত যে যজ্ঞ করা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং তাহাতেই কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। এই

অবস্থা কেবল তখনই আইসে যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে তাহার নিজের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহা একই, এই আত্মা, ব্যক্তিগত "আমি" অপেক্ষা বড় জিনিষ, ইহা এক অসীম, অরূপ বিশ্ববাপী সত্তা, ইহার ভিতরেই সর্ব্বভূত বিরাজ করিতেছে ; যে সকল দেবতাদের উদ্দেশ্যে সে যজ্ঞ করে সে সকল সেই এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ বলিয়া সে বুঝিতে পারে এবং সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার সমস্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা পরিত্যাগ করিয়া উপলব্ধি করে যে তিনিই শ্রেষ্ঠ অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বর—তিনিই এক সঙ্গে সসীম এবং অসীম, এক এবং বহু, প্রকৃতির অতীত হইয়াও প্রকৃতির মধ্যেই ব্যক্ত, গুণাতীত হইয়াও তিনি অনন্ত গুণের ভিতর দিয়া তাহার লীলার বিকাশ করেন। ইনিই পুরুষোত্তম, ইহাকেই সমস্ত যজ্ঞ অর্পণ করিতে হইবে—কোন অনিত্য ব্যক্তিগত কর্ম্ম ফলের জন্য নহে, ভগবানকে লাভ করিবার জন্য, তাঁহার সংসর্গে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বাস করিবার জন্য।

অন্য কথায় বলিতে গেলে ক্রমশঃ অহংভাব, সীমার ভাব, ছাড়াইয়া যাওয়াই মুক্তি ও সিদ্ধির পথ। ইহাই মানুষের চিরদিনের অভিজ্ঞতা যে শুদ্ধ, উচ্চ, এক সত্তা সর্ব্বভূতে সর্ব্ব অবস্থায় বিরাজিত তাহার দিকে মানুষ যতই যাইবে, নিজের অহঙ্কারের দ্বারা, সসীমের গণ্ডীর দ্বারা মানুষ যত কম বদ্ধ হইবে ততই সে এক বিশালতা, শান্তি ও পবিত্র সুখের ভাব উপলব্ধি করিবে। শুধু সসীমের মধ্যে, "অহং" এর মধ্যে যে সুখ, যে আনন্দ, যে তৃপ্তি তাহা ক্ষণিক, ক্ষুদ্র এবং অনিশ্চিত।

যাহারা সম্পূর্ণ ভাবে অহংকারের মধ্যে বাস করে এবং "অহং" এর সসীম ধ্যান ধারণা, শক্তি, তৃপ্তি লইয়াই থাকে তাহাদের পক্ষে এই জগৎ সর্ব্বদা অনিত্যম্ অসুখম্—অস্থায়ী এবং দুঃখময়। সসীম জীবনের চিরদুঃখ এই যে সকল সময়েই একটা নিরর্থকতার ভাব থাকিয়া যায় কারণ, সসীমই জীবনের সমগ্র বা শ্রেষ্ঠ সত্য নহে। এই জন্যই গীতা কর্ম্মবাদ ব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই ব্রহ্মজ্ঞানের উপর, অহংভাবশূন্য জীবনের উপর এত ঝোঁক দিয়াছে। কারণ সংসারের সমস্ত ঘটনা ও কর্ম্মের যেখানে স্থায়ী ভিত্তি সেই অনন্ত, অসীম, এক সত্তাই অচল, অক্ষর ব্রহ্ম। যদি আমরা ইহা বুঝি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে অহং ভাব ত্যাগ করিয়া আমাদের নিজ সত্তাকে নামরূপের অতীত অনন্ত ব্রহ্মের মধ্যে তুলিতে হইবে—ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। এই এক ব্রহ্মের মধ্যে সর্ব্বভূত দেখিতে হইবে—সেই জ্ঞানই মানুষকে অহং ভাবের অজ্ঞান হইতে এবং ইহার কর্ম্ম ও ফল হইতে মানুষের আত্মাকে তুলিয়া লয়; ইহাতে বাস করাই পরম শান্তি লাভ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

কিরূপে এই মহান্ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহার দুইটী পথ আছে, জ্ঞানের পথ এবং কর্ম্মের পথ; গীতা এই দুইয়ের দৃঢ় সমন্বয় করিয়াছে। মন এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধির (intelligent will) যে নীচের খেলা সে খেলা হইতে বুদ্ধিকে ফিরাইয়া ঊর্দ্ধমুখী করিতে হইবে—পুরুষের দিকে, ব্রহ্মের দিকে ফিরাইতে

হইবে; ইহাই জ্ঞানের পথ। মনের বহুমুখী গতি এবং বাসনার বহুমুখী চেষ্টা রুদ্ধ করিয়া বুদ্ধিকে এক ব্রহ্মের একভাবে বাস করাইতে হইবে—ইহাই জ্ঞান পথের লক্ষ্য। শুধু এইটুকু দেখিলে মনে হয় বুঝি সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ, অচল নিষ্ক্রিয়তা এবং আত্মাকে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করাই এই পথের লক্ষ্য। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে এরূপ সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা এবং বিচ্ছিন্নতা সম্ভব নহে। পুরুষ ও প্রকৃতি সৃষ্টির যুগল তত্ত্ব—তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যতদিন আমরা প্রকৃতির মধ্যে আছি, প্রকৃতির মধ্যে আমাদের কর্ম্ম চলিতেই থাকিবে—তবে অজ্ঞানীরা যে ভাবে কর্ম্ম করে, জ্ঞানীদের কর্ম্মের ভাব তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে। সন্ন্যাস করিতেই হইবে—তবে কর্ম্ম হইতে পলায়ন করা সন্ন্যাস নহে, অহঙ্কার ও বাসনাকে বধ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস। ইহা কি উপায়ে হইতে পারে? কর্ম্ম করিবার সময়েও কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রকৃতিকেই সর্ব্বকর্ম্মের প্রকৃত কর্ত্তা বলিয়াই জানিতে হইবে, এবং প্রকৃতিকেই তাহার কর্ম্ম করিতে ছাড়িয়া দিতে হইবে, দ্রষ্টা এবং ভর্ত্তারূপে আত্মাতে বাস করিয়া প্রকৃতির কার্য্য দেখিতে হইবে, কিন্তু প্রকৃতির কর্ম্মে বা কর্ম্মের ফলে আসক্ত হওয়া চলিবে না—ইহাই উপায়। তখন সসীম উদ্বেগময় অহঙ্কৃত জীবন শান্ত হয়, "অহং" একব্রহ্মের চৈতন্যে মগ্ন হয়—অন্যদিকে আমাদের সম্মুখে সর্ব্বভূতের ভিতর দিয়া প্রকৃতির কর্ম্ম চলিতে থাকে—তখন আমরা এই সকলকে দেখি যে ইহারা সম্পূর্ণ ভাবে

প্রকৃতি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সেই এক অনন্ত ব্রহ্মের ভিতরই বাস করিতেছে, চলা ফেরা করিতেছে; আমাদের সসীম জীবনকেও ইহাদের মধ্যে একটি বলিয়া বুঝিতে পারি এবং উপলব্ধি করি যে আমাদেরও সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতিরই—আমাদের প্রকৃত আত্মার নহে; এই প্রকৃত আত্মা সর্ব্ববিশ্বে এক, ইহা আমার ব্যক্তিগত অহং নহে। অহং এই সকল কর্ম্মকে নিজের বলিয়া দাবী করিত, আমরা তাই সেগুলিকে আমাদেরই মনে করিতাম; কিন্তু অহং যখন মরিল, তখন আর সেগুলি আমাদের নহে, প্রকৃতির। অহংকে বধ করিয়া আমরা আমাদের জ্ঞানে ব্যক্তিগত গণ্ডীর উপরে উঠিয়াছি এবং বাসনাকে ত্যাগ করিয়া আমাদের প্রকৃতির কর্ম্মেও আমরা ব্যক্তিগত গণ্ডী ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছি। এখন শুধু কর্ম্মশূন্যতার সময়ে নহে, কর্ম্মের মধ্যেও আমরা মুক্ত: শারীরিক ও মানসিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করার উপর আমাদের স্বাধীনতা নির্ভর করে না, কর্ম্ম করিলেই সেই স্বাধীনতা হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়া পড়ি না। এমন কি প্রাকৃতিক কর্ম্মের পূর্ণ স্রোতের মধ্যেও নামরূপের অতীত আত্মা আমাদের মধ্যে ধীর, স্থির, মুক্ত থাকে।

এইরূপে সম্পূর্ণভাবে নামরূপের উপরে উঠিলে যে মুক্তি ইহা প্রকৃত ও পূর্ণ—ইহা না হইলে চলে না, কিন্তু, ইহাই কি সব? আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমস্ত জীবন, সংসারে যাহা কিছু আছে তাহাই প্রকৃতি কর্ত্তৃক পুরুষের নিকট যজ্ঞরূপে অর্পিত;

কিন্তু, ইহার মর্ম্ম আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না—কারণ আমাদের অহঙ্কার, আমাদের বাসনা আমাদের সঙ্কীর্ণ কর্ম্মবহুল জীবন আমাদিগকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। আমরা অহঙ্কার ও বাসনার ভিতর হইতে উঠিয়াছি এবং সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বের গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া আমরা সেই নির্গুণ ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়াছি,—যে এক আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে সর্ব্বভূত রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের একত্ব আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। কর্ম্মের যজ্ঞ চলিতেছে কিন্তু আমরা চালাইতেছি না—আমাদের মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের ভিতর দিয়া প্রকৃতি এই ক্রিয়া চালাইতেছে, কিন্তু, এই সমস্ত চলিতেছে আমাদের অনন্ত সত্তারই মধ্যে। তবে কাহাকে কোন উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ অর্পন করা হইতেছে? সেই অরূপ ব্রহ্মের ত কোন ক্রিয়া নাই, কোন বাসনা নাই, লাভ করিবার কোন বস্তু নাই, কোন কিছুর জন্যই ইহা সংসারের কোন জীবেরই উপর নির্ভর করে না; নিজের জন্যই ইহা আছে নিজেরই আত্মানন্দে, নিজের অনন্ত সত্তার মধ্যে হইয়া বিরাজিত। এই অবস্থায় পৌঁছিবার উপায় স্বরূপ আমাদিগকে বাসনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইতে পারে কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন হইয়া যায়, যজ্ঞের আর প্রয়োজন থাকে না। তখনও কর্ম্ম চলিতে পারে কারণ প্রকৃতির ক্রিয়া চলিতে থাকে, কিন্তু, তখন এই সকল কর্ম্মের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তখন কর্ম্ম না করিলে নয়, কেবল সেই জন্যই কর্ম্ম

করিতে হয়; আমাদের সসীম শরীর ও মনকে বাধ্য করিয়া প্রকৃতি কর্ম্ম করায়। কিন্তু ইহাই যদি সব হয় তাহা হইলে কর্ম্মকে যতদূর সম্ভব কমাইলেই হইল, প্রকৃতি যতটুকু নিশ্চয়ই করাইয়া লইবে কেবল মাত্র ততটুকু কর্ম্ম হইলেই হইল; দ্বিতীয়তঃ, যদি কর্ম্মকে যতদূর সম্ভব কমান নাই হয়,—কারণ, কর্ম্ম করিলে কিছু আসিয়া যায় না, কর্ম্ম না করাও উদ্দেশ্য নহে—তাহা হইলেও কর্ম্ম কি প্রকারের হইবে তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। একবার জ্ঞান লাভ করিবার পর অর্জ্জুন তাহার পুরাতন ক্ষত্রিয় স্বভাবের অনুসরণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ করিতে পারে অথবা তাহার শান্তির দিকে ঝোঁকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোনটি সে করে তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না; বরং দ্বিতীয়টিই উত্তম, কারণ প্রকৃতির যে সকল প্রবৃত্তি এখনও তাহাকে ধরিয়া আছে সেগুলিকে দমন করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়; এইরূপে যখন তাঁহার শরীর পতন হইবে তখন সে নিশ্চিত সেই অনন্ত ব্রহ্মে প্রয়ান করিতে পারিবে অনিত্যম্ অসুখম্ ইমম্ লোকম্—এই অনিত্য দুঃখময় সংসারের দুঃখ ও উন্মত্ততার মধ্যে আর তাহাকে ফিরিতে হইবে না।

যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে গীতার সমস্ত শিক্ষাই অর্থশূন্য হয়; কারণ ইহার যাহা প্রথম এবং মূল উদ্দেশ্য তাহাই ব্যর্থ হয়। কিন্তু গীতা বিশেষ করিয়া বলিয়াছে যে কর্ম্ম কি প্রকারের

হইল তাহা দেখা আবশ্যক, এবং কর্ম্ম চালাইবারও স্পষ্ট নির্দ্দেশ গীতাতে আছে, শুধু প্রকৃতির লক্ষ্যহীন তাড়নাতেই যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা নহে। অহং জয় হইবার পরও যজ্ঞের একজন ভোক্তা ঈশ্বর থাকেন—ভোক্তারম্ যজ্ঞতপসাম্ এবং তখনও যজ্ঞের একটা উদ্দেশ্য থাকে, অনন্ত যজ্ঞের একটা উদ্দেশ্য থাকে। অরূপ ব্রহ্মই একেবারে শেষ কথা নহে, আমাদের জীবনের একবারে শ্রেষ্ঠ রহস্যও নহে; কারণ অরূপ ও স্বরূপ, সসীম ও অসীম একই ভগবানের দুইটি উল্টা দিক মাত্র —দুইটি একই সময়ে ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে এবং ভগবান এই সকল পার্থক্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি একই সময়ে সান্ত ও অনন্ত, সসীম ও অসীম। ভগবান চিরদিন অব্যক্ত অনন্ত—চিরদিন তিনি স্বতপ্রণোদিত হইয়া সান্তের ভিতর নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন; তিনি সেই বিরাট অরূপ পুরুষ—সকল ব্যক্তি সকলরূপ যাহার আংশিক প্রকাশ মাত্র; তিনিই সেই ভগবান যিনি মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিই মানুষের হৃদয়স্থিত ঈশ্বর। সেই এক অরূপ (impersonal) ব্রহ্মের মধ্যে সর্ব্বভূতকে দেখাই জ্ঞানের শিক্ষা, কারণ এই ভাবেই আমরা ভেদকারী অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং এইরূপে সে সকলকে ভগবানের মধ্যে দেখিতে পারি—আত্মনি অথো ময়ি।

ভগবান সকলের মধ্যে রহিয়াছেন এবং সকলেই ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের অহংভাবের জন্য আমরা

ভগবানকে চিনিতে পারি না; কারণ আমরা নামরূপের দাস বলিয়া, অহঙ্কারের বশ বলিয়া, বস্তুসমূহের সসীম দৃশ্যের ভিতর দিয়া যতটুকু সম্ভব কেবল ততটুকুই ভগবানের আংশিক ভাবের পরিচয় পাইয়া থাকি। ভগবানকে পাইতে হইলে আমাদের নিম্নতর নামরূপের ভিতর দিয়া তাহা সম্ভব নহে; আমাদের উচ্চ, অসীম, নামরূপের অতীত সত্ত্বার ভিতর দিয়াই তাহা সম্ভব এবং তাহার জন্য সকলের ভিতর এই যে এক আত্মা (যাহার মধ্যে বিশ্বসংসার রহিয়াছে) সে আত্মার সহিত এক হইতে হইবে। এই যে অসীম সত্ত্বা যাহার ভিতরেই সব সসীম দৃশ্যও রহিয়াছে, এই যে নামরূপের অতীত সত্ত্বা যাহার ভিতর সকল নামরূপও রহিয়াছে, এই যে অচল সত্ত্বা প্রকৃতির সকল সচল ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—এই নির্ম্মল দর্পণেই ভগবানের সত্ত্বা প্রতিভাত হইবে অতএব আমাদিগকে প্রথমে নামরূপের অতীত এই আত্মাকে পাইতে হইবে; কেবল বিশ্বদেবগণের ভিতর দিয়া, সসীমের দিক দিয়া ভগবানের পূর্ণজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে লাভ করা যায় না। কিন্তু আবার কেবল এক নামরূপের অতীত আত্মার শান্ত নীরবতা ও অচলতার মধ্যেও ভগবানকে সমগ্র ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সত্য দর্শন করিতে হইলে এই আত্মার নীরবতার ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমকে দেখিতে হইবে; ক্ষর এবং অক্ষর দুইই পুরুষোত্তমের; তিনি অক্ষরের অচলতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু, তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সকল গতি, সকল ক্রিয়ার মধ্যেই

নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন, মুক্তির পরেও তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রকৃতিতে কর্ম্মের যজ্ঞ চলিতে থাকে।

ভগবান পুরুষোত্তমের সহিত জীবনের মধ্যেই মিলন এবং তাহাতেই আত্মার পরিপূর্ণতা—ইহাই যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য, শুধু অরূপ ব্রহ্মে আত্মনির্ব্বাণ নহে। আমাদের সমস্ত জীবন ভাগবত সত্তার মধ্যে তুলিতে হইবে, তাঁহাতে বাস করিতে হইবে (ময্যেব নিবসিস্যসি), তাঁহার সহিত এক হইতে হইবে, তাঁহার চৈতন্যের সহিত আমাদের চৈতন্য মিলাইতে হইবে, আমাদের আংশিক প্রকৃতিকে তাঁহার পূর্ণ প্রকৃতির প্রতিবিম্ব স্বরূপ করিতে হইবে, প্রাণে মনে আমাদিগকে সম্পূর্ণ-ভাবে ভাগবত জ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, কর্ম্মে আমাদিগকে সম্পর্ণভাবে, নির্দ্দোষভাবে ভাগবত ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইতে হইবে, তাঁহার প্রেমানন্দে বাসনা কামনা ভুলিতে হইবে—ইহাই মানবের সিদ্ধিলাভ, গীতা ইহাকেই উত্তম রহস্য বলিয়াছে। ইহাই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং চরম সার্থকতা—ইহাই আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের সর্ব্বোচ্চ সোপান। কারণ শেষ পর্য্যন্ত তিনিই অধীশ্বর এবং যজ্ঞের প্রাণ স্বরূপ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ভাগবত কর্ম্মের নীতি

অতএব গীতাবর্ণিত যজ্ঞের ইহাই প্রকৃত অর্থ। ইহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে হইলে পুরুষোত্তম তত্ত্ব বুঝা দরকার। গীতায় এ পর্য্যন্ত এ তত্ত্ব বুঝান হয় নাই—গীতার বাকী অধ্যায় সকলের শেষের দিকেই এই তত্ত্ব পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে, এবং সেইজন্যই গীতার ক্রমশঃ প্রকাশমান শিক্ষানীতির বিরুদ্ধাচার করিয়াও আমাদিগকে এখনই সেই প্রধান শিক্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে। উপস্থিত গীতার গুরু কেবল পুরুষোত্তম সম্বন্ধে সঙ্কেত মাত্র করিয়াছেন এবং অচল ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ মাত্র করিয়াছেন। আমাদের প্রথম কাজ এই ব্রহ্মে সম্পূর্ণ শান্তি ও সমতার অবস্থা লাভ করা, ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া। এখন পর্য্যন্ত তিনি স্পষ্ট ভাষায় পুরুষোত্তমের উল্লেখ করেন নাই—"আমি", কৃষ্ণ, নারায়ণ, অবতার—এই ভাবেই নিজের পরিচয় দিয়াছেন। গীতায় বুঝান হইয়াছে, অসীম, অরূপ ব্রহ্মের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হইয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিয়া ব্যষ্টি গত ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিতে হইবে এবং এই উপায়ে সেই নামরূপের অতীত মহা-

পুরুষকে লাভ করিতে হইবে—যিনি অরূপ, শান্ত, নীরব ব্রহ্মরূপে প্রকৃতির অতীত, আবার লক্ষ লক্ষ ভূতরূপে প্রকৃতির মধ্যেই বর্ত্তমান এবং কর্ম্মশীল। গীতার গুরু ইহা বুঝাইবার জন্য "আত্মন্যথো ময়ি" এই ভাষায় প্রয়োগ করিয়াছেন।

"যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি"

—যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অশেষ ভূতগণকে আত্মাতে এবং তাহার পর আমাতে দর্শন করিতে পারিবে।

আমাদের নিম্নতন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে সেই অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে লয় করিতে হইবে এবং শেষকালে আমরা সেই উত্তম পুরুষের সহিত যুক্ত হইব যিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন, অথচ সকল ব্যক্তির রূপ ধারণ করিয়াছেন।

ত্রিগুণের অধীন অপরা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া এবং ত্রিগুণের অতীত নিষ্ক্রিয় পুরুষে আত্মাকে নিবিষ্ট করিয়া আমরা অবশেষে অনন্ত ভগবানের পরা প্রকৃতিতে উঠিতে পারি; তখন প্রকৃতির ভিতর দিয়া কার্য্য করিলেও গুণত্রয়ের দ্বারা বদ্ধ হইতে হয় না। অক্ষর পুরুষের ভিতরের নৈষ্কর্ম্ম্য (inner actionlessness) প্রাপ্ত হওয়া এবং প্রকৃতিকে তাহারই কর্ম্ম করিতে ছাড়িয়া দিয়া আমরা সেই পরম উচ্চ ঐশ্বরিক প্রভুত্ব লাভ করিতে পারি যখন সকল কর্ম্ম করিয়াও কোন কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হইতে হয় না। অতএব, এখানে নারায়ণরূপে, কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ পুরুষোত্তমের ধারণাই মূল কথা। এই ধারণা ব্যতীত অপরা প্রকৃতি হইতে সরিয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ

করিলে যে মুক্তি তাহাতে কর্ম্মত্যাগ এবং সংসারের প্রতি উদাসীনতা অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু পুরুষোত্তমকে ধরিতে পারিলে ঐরূপ অপরা প্রকৃতি হইতে সরিয়া আসার ফলে দিব্যজীবনের স্বাধীনতার মধ্যে সংসারের সমস্ত কর্ম্ম করা যায়। নীরব, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকেই যদি আদর্শ দেখ, তাহা হইলে সংসার এবং সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে ; ভগবানকে, ঈশ্বরকে, পুরুষোত্তমকে যদি তোমার আদর্শ দেখ, যদি তাঁহাকে কর্ম্মের উপরে অথচ ইহার আভ্যন্তরীন, আধ্যাত্মিক কারণ এবং উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝ, তাহা হইলে সংসার এবং সংসারের সকল কর্ম্ম জয় হইবে এবং তাহা উচ্চ ভাগবত ভাবে ভরিয়া উঠিবে। সংসার কারাগার না হইয়া, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য, রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ হইতে পারে ; দুর্দ্দান্ত "আমি"র বন্ধনকে ধ্বংস করিয়া, আমাদের বন্ধনের কারণ কামনা সকলকে জয় করিয়া, আমাদের ব্যক্তিগত ভোগ ঐশ্বর্য্যের কারাগার ভগ্ন করিয়া আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এই রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ জয় করিব। মুক্ত বিশ্বগত আত্মা তখন স্বরাট, সম্রাট হইবে।

এইরূপে মুক্তি এবং সংসিদ্ধি লাভের উপায় স্বরূপ যজ্ঞার্থে কর্ম্মের সার্থকতা বুঝা গেল। এইরূপে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থ এবং আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কামনাশূন্য হইয়া, জয় পরাজয় লাভালাভকে সমান জ্ঞান করিয়া যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিয়া জনক প্রভৃতি মহৎ কর্ম্মযোগিগণ পুরাকালে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

এইরূপেই এবং এইরূপ কামনাশূন্য ভাবেই, মুক্তি এবং সিদ্ধি লাভের পরও কর্ম্ম করা যায় এবং করিতে হইবে—তখন উদার ভাগবতভাবে, অধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের শান্ত উচ্চ প্রকৃতির সহিত কর্ম্ম করিতে হইবে।

লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন কর্ত্তুমর্হসি।
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত্বদেবেতরো জনঃ॥
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে।
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন॥
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ৩।২০-২।২২

"লোকসংগ্রহার্থেও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও তাহাই করিয়া থাকে ; শ্রেষ্ঠগণ কর্ম্মের যে আদর্শ সৃষ্টি করেন, সাধারণে তাহার অনুসরণ করে। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কর্ত্তব্য নাই, এমন কোন পদার্থ নাই যাহা আমি পাই নাই এবং যাহা আমাকে অতঃপর লাভ করিতে হইবে ; কিন্তু তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়াই থাকি।" বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি—এখানে "এব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে ভগবান কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং সন্ন্যাসীরা যে মনে করেন তাহাদিগকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, তিনি সেরূপ করেন না। কারণ,

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্‌বিদ্বাংস্তথাশক্তশ্চিকীর্ষু র্লোকসংগ্রহম্॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ৩।২৩

"যদি আমি আলস্যপরিশূন্য হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকি, মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পন্থা অনুসরণ করিবে, আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই সকল লোক বিনষ্ট হইবে এবং আমি উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিব, এইরূপে আমি প্রজাগণকে নষ্ট করিব। অজ্ঞ ব্যক্তিরা আসক্তির সহিত যেমন কর্ম্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের লোকসংগ্রহার্থে, অনাসক্ত হইয়া সেইরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। যে অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্ম্মে আসক্ত, জ্ঞানী তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। তিনি জ্ঞানের সহিত এবং যোগস্থ হইয়া স্বয়ং সকল কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞদিগকে কর্ম্ম করাইবেন।" এই সাতটি শ্লোকের ন্যায় মূল্যবান শ্লোক গীতাতে আর খুব কমই আছে।

কিন্তু আমাদের স্পষ্ট বুঝা দরকার যে এই শ্লোকগুলিকে আধুনিক কর্ম্মপ্রবণ নীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করা চলিবে না; এই নীতি কোন উচ্চ দূর আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা অপেক্ষা বর্ত্তমান

জাগতিক কার্য্যাবলী লইয়াই অত্যধিক ব্যস্ত। সমাজ সেবা, দেশ সেবা, মানবজাতির কল্যাণ সাধন প্রভৃতি যে শত শত আদর্শ ও স্বপ্ন আধুনিক মনকে আকৃষ্ট করিতেছে এই শ্লোক, গুলিকে কেবল মাত্র সেই সকল আদর্শের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি বলিয়া বুঝিলে চলিবে না। এখানে পরোপকারের কোন যুক্তিযুক্ত নৈতিক নিয়ম কথিত হয় নাই; ভগবানের সহিত এবং যে জাগতিক জীব সমূহ ভগবানের মধ্যে বাস করিতেছে এবং ভগবান যাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন তাহাদের সহিত আধ্যাত্মিক একত্বের কথাই এখানে কথিত হইয়াছে। ব্যক্তিকে সমাজের এবং মানবজাতির অধীন করিবার, সমষ্টিগত মানবের বেদিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিবার উপদেশ এখানে দেওয়া নাই; ভগবানের মধ্যে ব্যক্তিত্বকে সার্থক করিয়া তুলিবার সর্ব্বগত, ভগবানের সত্য বেদীতে "আমি" কে বলি দিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে সকল ভাব ও অভিজ্ঞতা লইয়া আধুনিক মানব ব্যস্ত গীতার শিক্ষা তাহা অপেক্ষা উচ্চস্তরের; মানুষ এখন স্বার্থের শৃঙ্খল অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে, তথাপি তাহার দৃষ্টি যতটা সাংসারিক বুদ্ধি এবং নীতির দিকে, ততটা আধ্যাত্মিকতার দিকে নহে। দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সমাজসেবা, সমষ্টির সাধনা, মানবজাতির সেবারূপ ধর্ম্ম—এই সকল আদর্শ যে আমাদের ব্যক্তিগত, সংসারগত, সমাজগত, জাতিগত আদিম স্বার্থপরতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অপরের জীবনের সহিত

নিজের জীবনের একত্ব উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই একত্ব উপলব্ধি সাধারণ বুদ্ধি ও চিন্তাবেগের স্তরে, নৈতিক স্তরে—এখানে এই উপলব্ধি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আদিম স্বার্থপরতার পর ইহা দ্বিতীয় অবস্থা। কিন্তু গীতা আরও এক উচ্চ তৃতীয় অবস্থার কথা বলিয়াছে—দ্বিতীয় অবস্থাটি কেবল সেই উচ্চ অবস্থায় উঠিবার আংশিক উপায় মাত্র।

ভারতবর্ষে সমাজনীতি ব্যক্তিকে সমাজের অধীন করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সকল সময়েই ভারতের ধর্ম্মচিন্তার উচ্চ আদর্শ ছিল ব্যক্তিকে বড় করা। ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক অর্থে দ্রষ্টা এবং রাজা করিয়া মানবজাতিকে উন্নত করা প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল। ব্যক্তিকে তাহার নিজের উপরে লইয়া যাওয়া তাঁহাদের আদর্শ ছিল, তবে সঙ্ঘবদ্ধ মানব-সমাজের মধ্যে ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া নহে, নিজেকে বড় করিয়া, উচ্চ করিয়া, বিস্তৃত করিয়া ভাগবত চৈতন্যলাভই তাঁহাদের আদর্শ ছিল। গীতা এখানে যে অতিমানব, শ্রেষ্ঠমানব, দিব্য-ভাবাপন্ন মানবের কথা বলিয়াছে তাহা হইতে নীট্‌শে কথিত অতিমানবের ধারণা বিভিন্ন। কোন এক বিশেষগুণের, বিশেষ শক্তির আত্যন্তিক বিকাশ, মানুষের আংশিক ভাবের অতিশয্য লাভই নীট্‌শের অতিমানবত্ব। গীতার অতিমানব অসুর বা দানব নহে। সেই এক সর্ব্বাতীত সার্ব্বজনীন ভাগবত সত্তা ও চৈতন্যের মধ্যে মানবের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া

ক্ষুদ্র আমিকে হারাইয়া বৃহত্তর আমিকে পাইয়া যে ভাগবত অবস্থা লাভ করা যায় গীতায় তাহারই নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রৈগুণ্যময়ী অপরা প্রকৃতি হইতে নিজেকে তুলিয়া ভগবানের সাযুজ্য, সালোক্য এবং সাদৃশ্য (বা সাধর্ম্ম্য) * লাভ করা, মদ্ভাবনাগতাঃ, ইহাই যোগের উদ্দেশ্য। কিন্তু, যখন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, যখন মানব ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া জগতকে আর মিথ্যা অহঙ্কারের চক্ষুতে দেখে না পরন্তু, সর্ব্বভূতকে আত্মার মধ্যে, ভগবানের মধ্যে দেখে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মাকে, ভগবানকে দেখে, তখনও যে কর্ম্ম হয়, সে কর্ম্মের স্বরূপ কি এবং সে কর্ম্ম কি উদ্দেশ্য লইয়া করা হয়? অর্জ্জুন এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন—

কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্। স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তি কিরূপ কহেন? কিরূপ থাকেন? কিরূপে চলেন?

ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু, অর্জ্জুন যে ভাব লইয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন উত্তরটা ঠিক সেই ভাবে হইল না। মানসিক বুদ্ধি, আবেগ ও নীতির স্তরে যে ব্যক্তিগত কামনা বা বাসনা তাহা কখনও এরূপ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না; কারণ সে বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছে —এমন কি পরোপকার প্রভৃতি নৈতিক কামনা বা বাসনা পরিত্যক্ত হইবে কারণ যিনি মুক্ত ব্যক্তি তিনি পাপপুণ্যের ভেদ অতিক্রম করেন এবং পাপপুণ্যের উপরে দিব্য পবিত্রতার

* জীবনের ও কর্ম্মের নীতিতে ভগবানের সহিত এক হওয়াই সাধর্ম্ম্য।

মধ্যে বাস করেন। পূর্ণ আত্মবিকাশের জন্যনিস্বার্থভাবে কর্ম্ম করিবার যে আধ্যাত্মিক ডাক তাহার বশেও এ অবস্থায় কর্ম্ম হইবে না কারণ এ অবস্থায় আত্মবিকাশ সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ হইয়াই গিয়াছে। শুধু লোকসংগ্রহের জন্য এঅবস্থায় কর্ম্ম হইতে পারে, চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম। মানব মণ্ডলী দূর ভাগবত আদর্শের দিকে যে যাত্রা করিয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, বুদ্ধির সংশয় ও গোলমাল হইতে সকলকে রক্ষা করিতে হবে। অজ্ঞান আঁধারের ভিতর দিয়া মানুষকে চলিতে হইতেছে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণের আদর্শ তাহাদের সম্মুখে না থাকিলে সহজেই তাহারা ধ্বংসমুখে পতিত হইতে পারে। যাহারা শ্রেষ্ঠ, যে সকল ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা অগ্রগামী এবং সাধারণের স্তরের উপরে তাঁহারা স্বভাবতঃই মানুষের নেতা কারণ তাহারাই মানুষকে দেখাইতে পারেন যে কোন আদর্শ মানবজাতিকে অনুসরণ করিতে হইবে, কোন পথে তাহাদিগকে চলিতে হইবে। কিন্তু, ভাগবত-ভাবাপন্ন ব্যক্তি সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ নহেন, তাঁহার প্রভাবের তাঁহার দৃষ্টান্তের এমন শক্তি থাকিবেই যাহা সাধারণ শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের থাকিতে পারে না। তাহা হইলে তিনি কি দৃষ্টান্ত দেখাইবেন? তিনি কোন নীতি বা আদর্শ সকলের সম্মুখে ধরিবেন?

তাঁহার বক্তব্য আরও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত, নিজের আদর্শ অর্জ্জুনের সম্মুখে

ধরিলেন। তিনি যেন বলিলেন—"আমি কর্ম্মপথে রহিয়াছি; এই পথ সকল মনুষ্যই অনুসরণ করে; তোমাকেও কর্ম্ম করিতেই হইবে। আমি যেরূপে কর্ম্ম করি, তোমাকেও সেইরূপে কর্ম্ম করিতেই হইবে। আমি কর্ম্মের আবশ্যকতার উপরে, কারণ কর্ম্মের দ্বারা আমার লাভ করিবার কিছুই নাই; আমি ভগবান, সংসারের সকল বস্তু, সকল জীবই আমার, আমি নিজে সংসারের অতীতও বটি, সংসারের মধ্যেও বটি, কোন কিছুর জন্য ত্রিভুবনে আমি কাহারও নিকট কোন ভরসা করি না; তথাপি আমি কর্ম্ম করি। এই ভাবেই, এই আদর্শেই তোমাকেও কর্ম্ম করিতে হইবে। আমি ভগবান, আমিই বিধি, আমিই আদর্শ; মানুষ যে পথে চলে তাহা আমিই প্রস্তুত করি; আমিই পথ এবং লক্ষ্যস্থল। কিন্তু, আমি এই সকল বিশাল ভাবে, উদার ভাবে করি—আংশিক ভাবে দৃশ্যতঃ করি, কিন্তু বেশীর ভাগ অদৃশ্য ভাবেই করি; এবং মানুষ আমার কর্ম্মপরম্পরা বাস্তবিকই বুঝে না। তুমি যখন সব জানিবে, বুঝিবে, তুমি যখন দিব্যমানব হইবে—তখন তুমি ব্যক্তিগত ভাবে ভাগবতশক্তি হইবে, মানুষ হইয়াও ভগবানের দৃষ্টান্ত হইবে, যেমন অবতার রূপে আমি। বেশীর ভাগ লোকই অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে, ভগবতদ্রষ্টা জ্ঞানের মধ্যে বাস করে; কিন্তু তিনি যেন বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকের মধ্যে সংশয় আনয়ন না করেন, উপরে উঠিয়াছেন বলিয়া সংসারের কর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন; ক্রমোন্নতির আমি যে

সকল স্তর ও ধাপ নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তিনি যেন তাহা গোলমাল করিয়া না দেন। মানুষ কেমন করিয়া অপরা প্রকৃতি হইতে পরা প্রকৃতিতে উঠিতে পারিবে, ভাগবত লাভ করিতে হইবে, তাহার হিসাব করিয়াই আমি সমস্ত মানবীয় কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছি। ভগবত-জ্ঞানীকে সমস্ত মানবীয় কর্ম্মের মধ্যেই থাকিতে হইবে। সমস্ত ব্যক্তিগত কার্য্য, সামাজিক কার্য্য, চিত্ত, মন, দেহের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার থাকিবে—তবে, তাহা আর স্বতন্ত্র ভাবে তাঁহার নিজের জন্য নহে, ভগবানের জন্য, —তিনি যেমন নিজের মধ্যে ভগবানকে পাইয়াছেন, সেইমত সকলেই যাহাতে পায় সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে। বাহ্যতঃ তাঁহার কার্য্যের সহিত অপরের কার্য্যের হয়ত বিশেষ কোন তফাৎই থাকিবে না; যেমন শিক্ষাদান এবং জ্ঞানচর্চ্চা তেমনই যুদ্ধ ও রাজশাসন, মানুষের সহিত মানুষ যত রকম কার্য্য করে তাঁহাকে সবই করিতে হইতে পারে; কিন্তু যে মনোভাবের সহিত তিনি এই সকল কর্ম্ম করিবেন তাহা হইবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই মনোভাবেই এমন শক্তি যে সকল মনুষ্য তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।"

ভগবান এখানে যে নিজের দৃষ্টান্ত দিলেন ইহার অর্থ অতি গভীর, কারণ, ইহার দ্বারা গীতার দিব্য কর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি নিজেকে উন্নত করিয়া দিব্য প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন তিনিই মুক্ত; এতাদৃশ মানবের কর্ম্ম

দিব্য প্রকৃতি অনুসারেই হইবে। কিন্তু, দিব্য প্রকৃতি কি? ইহা কেবল অক্ষর, অচল, নিষ্ক্রিয় অরূপ আত্মার প্রকৃতি নহে; কারণ তাহা হইলে মুক্ত মানবকে অচল নিষ্ক্রিয় হইতে হইত। অন্যদিকে আবার ক্ষর, বহু, নামরূপের অধীন প্রকৃতির অধীন পুরুষের প্রকৃতিও দিব্য প্রকৃতির স্বরূপ নহে কারণ শুধু এইরূপ প্রকৃতি মানুষকে নাম রূপের অধীনে, অপরা প্রকৃতি এবং তাহার গুণত্রয়ের অধীনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। পুরুষোত্তমের প্রকৃতিতে এই দুইই আছে এবং তাহাই দিব্য প্রকৃতি; সেই শ্রেষ্ঠ ভাগবত সত্তায় উল্লিখিত দুই বিভিন্ন প্রকৃতিরই সমন্বয় হইয়াছে এবং তাহাই রহস্যম্ হ্যেতদ্ উত্তমম্। প্রকৃতিতে বদ্ধ আমরা যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে কর্ম্ম করি তিনি সেরূপভাবে কর্ম্ম করেন না; কারণ ভগবান তাঁহার শক্তি, মায়া, প্রকৃতির ভিতর দিয়া কার্য্য করেন, কিন্তু তথাপি তিনি ইহার উপরেই থাকেন, ইহার দ্বারা বদ্ধ নহেন, ইহার অধীন নহেন; এই প্রকৃতি কর্ম্মের যে নিয়ম এবং সংস্কারের সৃষ্টি করে তিনি নিজেকে তাহাদের উপরে তুলিতে অক্ষম নহেন, তাহাদের দ্বারা বিচলিত বা বদ্ধ নহেন, আমরা যেরূপ প্রাণ, মন, দেহের কর্ম্ম হইতে নিজেদিগকে পৃথক করিতে অক্ষম, তিনি সেরূপ অক্ষম নহেন। তিনি কর্ত্তা হইয়াও কর্ম্ম করেন না, কর্ত্তারম্ অকর্ত্তারম্।

তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম। ৪।১৩

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা। ৪।১৪

"আমি ইহার (চাতুর্ব্বর্ণের) কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্ত্তা বলিয়াই জানিও। কর্ম্ম সকল আমাকে আসক্ত করে না। কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই।" কিন্তু আবার তিনি নিষ্ক্রিয় সাক্ষী মাত্রও নহেন; কারণ, তিনি তাঁহার শক্তির মধ্যে কর্ম্ম করেন; ইহার প্রত্যেক গতি, এই শক্তি কর্ত্তৃক সৃষ্ট জীব জগতের প্রত্যেক অনুপরমাণু তাহারই সত্ত্বায় পূর্ণ, তাঁহারই চৈতন্যে পূর্ণ, তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত, তাঁহারই জ্ঞানে নির্ম্মিত।

তা ছাড়া তিনি সেই শ্রেষ্ঠ সত্ত্বা যিনি গুণশূন্যহইয়াও সকল গুণের অধিকারী, নির্গুণো গুণী। প্রকৃতির কোন গুণ বা কর্ম্মের দ্বারা তিনি বদ্ধ নহেন, আমাদের ব্যক্তিত্বের মত তিনি গুণসমূহের সমষ্টি মাত্র নহেন, দেহ, প্রাণ, মন, চিত্তের স্বরূপানুযায়ী ক্রিয়ায় নিবদ্ধ নহেন, কিন্তু তিনিই সকল গুণ কর্ম্মের মূল, যেটিকে যেমন ভাবে হউক তাঁহার ইচ্ছামত বিকাশ করিতে তিনি সক্ষম; তিনি অনন্ত সত্ত্বা, এই বিভিন্ন ভূত সকল তাহা হইতে উৎপন্ন, তিনি অপরিমিত, অনন্ত, অনির্ব্বচনীয় বস্তু—এই সকলের দ্বারা বিশ্বের সীমা ও শৃঙ্খলার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। তথাপি তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, একমাত্র আদি চৈতন্যময় সৎ, তিনি পূর্ণ ব্যক্তি—সকল সম্বন্ধ, মনুষ্যোচিত নিবিড় ব্যক্তিগত সম্বন্ধও তাঁহাতে সম্ভব; তিনি বন্ধু, সখা, প্রণয়ী, খেলার সাথী, পথদর্শক গুরু, প্রভু জ্ঞানদাতা, আনন্দদাতা, অথচ সকল সম্বন্ধের মধ্যেও মুক্ত,

স্বাধীন। মানুষ ভাগবত প্রকৃতি লাভে যতখানি সক্ষম হয়, ততখানি সেও এইরূপ হয়—ব্যক্তি হইয়াও ব্যক্তিত্বের উপর উঠিতে পারে, মানুষের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ রাখিয়াও গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, এ ধর্ম্ম বা ও ধর্ম্ম অনুসরণ করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক কোন ধর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ থাকে না। কর্ম্মপ্রবণ মনুষ্যের কর্ম্মচাঞ্চল্য অথবা শান্ত সাধুর কর্ম্মহীনতা, কর্ম্মীর প্রবল ব্যক্তিত্ব অথবা দার্শনিক পণ্ডিতের উদাসীন ব্যক্তিত্বহীন সত্তা— কোনটাই সম্পূর্ণ ভাগবত আদর্শ নহে। সংসারী মানবের এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর এই দুইটি বিরোধী আদর্শ—একজন ক্ষরের কর্ম্মে মগ্ন, আর একজন অক্ষরের শান্তির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বাস করিবার জন্য যত্নবান; কিন্তু পুরুষোত্তমের প্রকৃতি এই বিরোধের উপরে সমস্ত ভাগবত সম্ভাবনার সমন্বয় করিয়াছে এবং তাহা হইতেই পূর্ণভাগবত আদর্শ।

সাংসারিক প্রকৃতির পরিণতি, সেই প্রকৃতির তিনগুণের খেলা এবং মন, চিত্ত দেহের মানবীয় ক্রীড়া, সেই সকলের উপর যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত নহে সাধারণ কর্ম্মশীল মানব সেরূপ আদর্শে তৃপ্তি পায় না। সে বলে যে ঐ প্রকৃতির চরম পরিণতিতেই আমার মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ; মানুষ শুধু সেই আদর্শেই সন্তুষ্ট যে আদর্শ আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের চিত্তকে, আমাদের নৈতিকবোধকে তৃপ্ত করিতে পারে, আমাদের মানবীয় প্রকৃতিকে কর্ম্মে ব্রতী করিতে পারে; দেহ, মন, প্রাণের

কর্ম্মের মধ্যে যাহা সে খুঁজিয়া পায় মানুষ তাহাই চায়। কারণ, তাহাই তাহার প্রকৃতি, তাহার ধর্ম্ম,—তাহার প্রকৃতির বাহিরের কিছুতে কেমন করিয়া সে সার্থকতা লাভ করিবে? কারণ প্রত্যেক মনুষ্য তাহার প্রকৃতির সহিত বদ্ধ এবং তাহারই মধ্যে তাহাকে পূর্ণতা খুঁজিতে হইবে। যেমন আমাদের মানবীয় প্রকৃতি, আমাদের মানবীয় পূর্ণতাও তদনুরূপই হইবে; প্রত্যেক মনুষ্য নিজের ব্যক্তিত্ব অনুসারে, স্বধর্ম্মানুসারেই ইহার জন্য চেষ্টা করিবে—কিন্তু জীবন এবং কর্ম্মের বাহিরে নহে। গীতা বলে হাঁ; ইহাতে কিছু সত্য আছে বটে; মানুষের মধ্যে ভগবানের স্ফুরণ, জীবনের মধ্যে ভাগবতলীলা, ইহা আদর্শ পূর্ণতারই অংশ। কিন্তু, যদি তুমি শুধুই বাহিরে জীবনের মধ্যে, কর্ম্মের নীতির মধ্যে সন্ধান কর তাহা হইলে ইহাকে কথনই পাইবে না; কারণ, তখন তুমি যে নিজের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করিবে (এটা পূর্ণতারই নীতি) শুধু তাহাই নহে, কিন্তু তুমি চিরকাল প্রকৃতির গুণের অধীন, রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বের অধীন, সুখ দুঃখের অধীন বিশেষতঃ কামনাময় ক্রোধ শোকসঙ্কুল রজোগুণের অধীন হইবে (ইহা অপূর্ণতার নীতি)—সর্ব্বগ্রাসী কাম তোমার সাংসারিক কর্ম্মকে ঘিরিয়া ধরিবে—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণো সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্,
ধূমেনা ব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥

আবৃতম্ জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩।৩৭-৩৯

এই দুষ্পূরনীয় অত্যুগ্র কাম রজোগুণজাত, ক্রোধ ইহারই পরিণতি। জ্ঞানের চিরশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নিতে জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। ধূম যেমন অগ্নিকে এবং মল যেমন দর্পণকে আচ্ছাদিত করে, আর জরায়ু যেমন গর্ভকে আবৃত করিয়া রাখে, তেমনি কাম জ্ঞানকে, বিবেককে আচ্ছন্ন করে। যদি তুমি আত্মার শান্ত, নির্ম্মল, উজ্জ্বল সত্যের মধ্যে বাস করিতে চাও তাহা হইলে এই কামকে বধ করিতেই হইবে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সিদ্ধির এই চির শত্রু কামের অধিষ্ঠান ভূমি, আশ্রয়, অথচ শুধু এই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মধ্যে, অপরা প্রকৃতির খেলার মধ্যেই সিদ্ধির সন্ধান করিবে? এ চেষ্টা বৃথা। তোমার কর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতিকে প্রথমে শান্তির সন্ধান করিতে হইবে; এই নীচের প্রকৃতি হইতে উঠিয়া ত্রিগুণের উপরে যে পরা প্রকৃতি, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। যখন তুমি আত্মার শান্তি লাভ করিবে কেবল তখনই স্বাধীন ভাগবত কর্ম্মের অধিকারী হইবে।

অন্যদিকে শান্তিকামী সন্ন্যাসীগণ সিদ্ধাবস্থায় সংসার ও কর্ম্মের কোন স্থান দেখিতে পাননা। এইগুলিই কি বন্ধন এবং অসিদ্ধির মূল নহে? ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই কি দোষযুক্ত নহে? কর্ম্মের নীতিই কি রাজসিক নহে? এই রজোগুণ হইতেই কামের উদ্ভব, কাম জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া

রাখে, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্বে মানুষকে অস্থির করিয়া তুলে। সংসারের মধ্যে ভগবান থাকিতে পারেন, কিন্তু, তিনি সংসারের নহেন, তিনি ত্যাগের ভগবান, আমাদের কর্ম্মের প্রভু বা কারণ নহেন; বাসনা বা কামই আমাদের কর্ম্মের প্রভু এবং অজ্ঞানই আমাদের কর্ম্মের কারণ। ক্ষরকে, জগতকে যদিও একভাবে ভগবানের প্রকাশ বা লীলা বলা যায়, ইহা প্রকৃতির অজ্ঞানের সহিত অসম্পূর্ণ লীলা, ইহা ভগবানকে প্রকাশ করা অপেক্ষা তাঁহাকে ঢাকিয়াই রাখে। জগতের রূপের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় এবং জগতের সহিত সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হইলেও আমরা কি এই শিক্ষাই পাই না? যতদিন কামনা ও কর্ম্মের প্রবৃত্তি ভোগের দ্বারা ক্ষীণ ও পরিত্যক্ত না হয় ততদিন এই অজ্ঞানচক্র সংসার কি আত্মাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করায় না? শুধু কাম নহে, কর্ম্ম পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতেই হইবে; তখন জীব নীরব আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গতিহীন, কর্ম্মহীন, অচল, সম্বন্ধহীন ব্রহ্মের মধ্যে চলিয়া যাইবে। শান্তিকামী সন্ন্যাসীর এই আপত্তির উত্তর গীতা যেরূপ যত্নের সহিত দিয়াছে, সংসারী কর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তির আপত্তির উত্তর দিতে গীতা তত যত্ন করে নাই। কারণ সন্ন্যাসীর যে আপত্তি তাহাতে আরও উচ্চ এবং শক্তিশালী সত্য নিহিত রহিয়াছে অথচ ইহা সম্পূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ সত্য নহে—ইহার প্রচারে মানব জাতির ক্রমবিকাশের যে গোলমাল এবং অনিষ্ট হইতে পারে

একজন ভ্রান্ত সংসারীর আদর্শ প্রচারে তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কোন তীব্র আংশিক সত্যকে যখন সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচার করা যায়—তখন যেমন তীব্র আলোকের সৃষ্টি হয় তেমনি গভীর অন্ধকারেরও সৃষ্টি হয়; কারণ ইহার ভিতর যে সত্যটুকু রহিয়াছে—তাহার শক্তি ইহার মিথ্যা বা ভুলের অংশটুকু খুব তীব্র করিয়া তুলে। সাংসারিক কর্ম্মপ্রবণ মনুষ্যের আদর্শে যে ভুল তাহাতে শুধু অজ্ঞান বাড়িতে পারে, এবং যেখানে সিদ্ধি পাওয়া যায় না সেখানে সিদ্ধির সন্ধান করায় মানবের উন্নতিতে বাধা পড়িতে পারে; কিন্তু সন্ন্যাসীর নিষ্কর্ম্মতার আদর্শের যে ভুল তাহাতে সংসার-ধ্বংশের বীজ নিহিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি যদি এই আদর্শ অনুসারে কর্ম্ম ত্যাগ করি তাহা হইলে আমি লোক সকলকে নষ্ট করিব এবং বিষম বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিব; এবং যদি কোন বিশেষ মানব (যদিও তিনি প্রায় ভাগবত জীবন লাভ করিয়া থাকেন) তাহার ভুলের দ্বারা সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করিতে না পারেন তথাপি তাঁহার ভুলের ফলে বিস্তৃত ভাবে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহা মানবজীবনের মূলনীতির সংহারক হইতে পারে এবং ইহার ক্রমবিকাশের নির্দ্দিষ্ট পন্থাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে।

অতএব, মানুষের মধ্যে কর্ম্মশূন্য শান্তির দিকে যে ঝোঁক রহিয়াছে তাহার অসম্পূর্ণতা বুঝিতে হইবে এবং ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য রহিয়াছে অন্যদিকে কর্ম্মপ্রবণতার মধ্যেও যে

তেমনই সমান সত্য রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে,—স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের মধ্যেই ভগবান সার্থক হইয়া উঠেন, এবং মানবজাতির সকল কর্ম্মের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন। ভগবান শুধু নীরবতার মধ্যেই নাই, তিনি কর্ম্মের মধ্যেও রহিয়াছেন; প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত নিষ্ক্রিয় জীবের যে শান্তিপ্রবণতা এবং প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত জীবের যে কর্ম্মপ্রবণতায় জগৎ যজ্ঞ, পুরুষ-যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে এই দুইটী পরস্পরের বিরোধী সত্য নহে, একটি সত্য অপরটি মিথ্যা এরূপ ভাবেও তাহাদের মধ্যে চিরবিরোধ নাই, একটি উচ্চ, অপরটি নীচ, তাহাও নহে, একটির দ্বারা অপরটির নাশ হইতে পারে সেরূপ সম্ভাবনাও নাই। এই দুইটি ভাগবত লীলার দুইটি দিক (double term)। শুধু অক্ষরই তাহাদের পরিণতি আনিয়া দেয় না, অক্ষরই একেবারে শ্রেষ্ঠ রহস্য নহে। এখানে কৃষ্ণরূপে উপস্থিত পুরুষোত্তমের মধ্যে দুয়েরই বিকাশ হইয়াছে, দুইটির পরস্পরের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। ক্ষ একই সময়ে শ্রেষ্ঠ, জগৎ সমূহের অধীশ্বর এবং অবতার। .ব ভাগবত-ভাবাপন্ন মানব তাঁহার ভাগবত প্রকৃতিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মতই তিনিও কর্ম্ম করিবেন; তিনি নিজেকে নৈষ্কর্ম্মের মধ্যে ছাড়িয়া দিবেন না। মানুষের অজ্ঞানের মধ্যে ভগবান কার্য্য করিতেছেন জ্ঞানের মধ্যেও কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাকে জানাই আমাদের আত্মার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ এবং সিদ্ধিলাভের উপায়, কিন্তু তাঁহাকে শুধু প্রকৃতির

অতীত নীরব ও শান্তিময় বলিয়া জানিলে ও বুঝিলে কিছুই হইবে না। অনন্ত অজ ভগবানের রহস্য যেমন বুঝিতে হইবে, তেমনই তাঁহার দিব্য জন্ম ও কর্ম্মের রহস্যও বুঝিতে হইবে, জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্। এই জ্ঞান হইতে যে কর্ম্মের উৎপত্তি তাহা সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। ভগবান বলিয়াছেন "এইরূপে যে আমাকে জানে সে কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না।" যদি কর্ম্মের বন্ধন, বাসনা ও জন্মচক্রান্তর হইতে মুক্তিলাভ আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হয় তাহা হইলে এই জ্ঞানকেই মুক্তির প্রকৃত প্রশস্ত উপায় বলিয়া ধরিতে হইবে, কারণ, গীতায় বলা হইয়াছে—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৪।৯

"হে অর্জ্জুন, যিনি আমার এইরূপ জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহ ত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন।" অজ, অব্যয় ভগবান সর্ব্বভূতের আত্মা, দিব্য জন্মের জ্ঞানের ভিতর দিয়া তাঁহাকে লাভ করা যায়; দিব্য কর্ম্মের জ্ঞান ও সাধনের ভিতর দিয়া সর্ব্বভূতের অধীশ্বরকে লাভ করা যায়। তিনি সেই অজ ভগবানের মধ্যে বাস করেন; সর্ব্বেশ্বরের কর্ম্ম তাঁহার কর্ম্ম হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অবতারের সম্ভাবনা ও প্রয়োজন

যে যোগে কর্ম্ম এবং জ্ঞান এক হয়, জ্ঞানের সহিত কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে অর্পণ করা হয়, যে যোগে সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় জ্ঞানে, জ্ঞান কর্ম্মকে সমর্থন করে, পরিবর্ত্তিত করে, আলোকিত করে এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সেই সর্ব্বভূতের হৃদিস্থিত, মানবরূপে অবতীর্ণ সর্ব্বজীব, সর্ব্বকর্ম্মের অধীশ্বর পুরুষোত্তমের উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়—সেই যোগের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কথাচ্ছলে বলিলেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ৪।১

আমি সূর্য্যকে এই আদি প্রাচীন যোগ বলিয়াছিলাম, সূর্য্য মানবপিতা মনুকে এবং মনু সূর্য্যবংশের আদিরাজ ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ কহিয়াছিলেন।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম॥ ৪।২-৩

"রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জানিয়াছিলেন। হে পরন্তপ, ইহলোকে তাহা কালবশে নষ্ট হইয়াছে। তুমি ভক্ত ও সখা, এজন্য আমি সেই পুরাতন জ্ঞানযোগ অদ্য তোমাকে কহিলাম; কারণ ইহাই উত্তম রহস্য।"

ইহাকে উত্তমরহস্য বলা হইল, অতএব বলা হইল যে ইহা অন্যান্য প্রকারের যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ অন্যান্য প্রকারের যোগ নিরাকার ব্রহ্মে বা কোন সাকার দেবতার নিকট লইয়া যায়, হয় কর্ম্মশূন্য জ্ঞানে যে মুক্তি নতুবা ভক্তিতে মগ্ন থাকায় যে মুক্তি তাহা লাভ হয়। কিন্তু, এখানে যে যোগের কথা বলা হইল তাহাতে শ্রেষ্ঠ রহস্য, এবং সমগ্র রহস্য লাভ হয়। ইহার দ্বারা আমরা ভাগবত শান্তি এবং ভাগবত কর্ম্মলাভ করি, পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে ভাগবত জ্ঞান, ভাগবত কর্ম্ম, ভাগবত আনন্দের অধিকারী হই; যেমন ভগবানের শ্রেষ্ঠ সত্তার মধ্যে তাঁহার বিভিন্ন বিরোধী প্রকাশের সমন্বয় হইয়াছে, তেমনি ইহার মধ্যে অন্যান্য সমস্ত যোগের পথই সম্মিলিত হইয়াছে। অতএব, গীতার এই যোগ কেবল কর্ম্মযোগ,—তিনটি পথের একটি পথ এবং নিকৃষ্ট পথ একথা কেহ কেহ বলিলেও বাস্তবিক পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ যোগ, ইহা সমগ্র ও পূর্ণ; ইহাতে সকল পন্থার সমন্বয় হইয়াছে, ইহার দ্বারা আমাদের সমস্ত শক্তিকে ভগবদ্‌মুখী করা যায়।

ভগবান যে পরের পর যোগ শিক্ষা দানের কথা বলিলেন

অর্জ্জুন ইহার সাধারণ বাহ্যিক অর্থই ধরিলেন (ইহার অন্তরঙ্গ অর্থও করা যাইতে পারে) এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪।৪

"তোমার জন্ম পরবর্ত্তী এবং সূর্য্যের জন্ম পররর্ত্তী, অতএব তুমি যে প্রথমে সূর্য্যকে এই যোগ বলিয়াছ, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব।"

শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া জবাব দিতে পারিতেন যে তিনি ভগবান, সমস্ত জ্ঞানের তিনিই উৎস,—ভগবানই তাঁহার জ্ঞানের মূর্ত্তি সূর্য্যদেবকে তাঁহার বাক্য দিয়াছেন—ভর্গ সবিতার দেবস্য যো নঃ ধীয়ঃ প্রচোদয়াৎ। কিন্তু তাহা না করিয়া এই সুযোগে অর্জ্জুনকে তাঁহার গুপ্ত ঈশ্বরত্বের কথা বলিলেন; ইহার জন্য তিনি ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনকে তখন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন যখন তিনি নিজকে সকল বন্ধন-মুক্ত কর্ম্মীর ভাগবত আদর্শ বলিয়া উল্লেখ করেন— কিন্তু তখন কথাটা বেশ পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। এখন তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবান, অবতার।

গীতার গুরুর কথা বলিবার সময় আমরা সংক্ষেপে অবতার-বাদের কথা বলিয়াছি; বেদান্তশিক্ষার আলোকে অবতারবাদ যেরূপ বুঝা যায় গীতা সেইভাবে উহা আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহাই বলিয়াছি। এখন এই অবতার-বাদ আমাদিগকে আর একটু গভীর ভাবে দেখিতে হইবে এবং

যে দিব্য জন্মের ইহা বাহ্যিক নিদর্শন তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে; কারণ, গীতার মূল শিক্ষার সহিত ইহা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। প্রথমে, গীতার গুরু নিজে যে ভাষায় অবতারের স্বরূপ ও প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন আমরা তাহার উল্লেখ করিব এবং এই বিষয়ে অন্যান্যস্থানেও যাহা বলা হইয়াছে বা সঙ্কেত করা হইয়াছে তাহাও স্মরণ করিব। ভগবান বলিলেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ৪।৫।১১

"হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সে সমুদায় জানি কিন্তু, তুমি তাহা জান না।

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর স্বভাব এবং প্রাণিগণের ঈশ্বর তাহা হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়াবশতঃ আবির্ভূত হইয়া থাকি। হে ভারত, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। হে অর্জ্জুন যিনি আমার এইরূপ জন্ম এবং কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ শূন্য, মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া, আত্মজ্ঞানে পবিত্র অনেক মহাত্মাই আমার ভাব, পুরুষোত্তমের ভাব পাইয়াছেন। যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি আমার প্রেমে সেই ভাবেই গ্রহণ করি; হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পথের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।”

কিন্তু, বেশীর ভাগ লোকই কর্ম্মের সিদ্ধি প্রার্থনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভজনা করে, কারণ কর্ম্মজ সিদ্ধি জ্ঞানবিরহিত কর্ম্মের ফল খুব শীঘ্রই মনুষ্যলোকে ফলিয়া থাকে; বাস্তবিক ইহা শুধু এই জগতেরই। কিন্তু, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে জ্ঞানের সহিত যজ্ঞ করিয়া মানুষের মধ্যে যে ভাগবত জীবনের স্ফূর্ত্তি তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক কঠিন; ইহার ফল উচ্চস্তরের এবং তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অতএব, মনুষ্যকে গুণ কর্ম্মের বিভাগ অনুযায়ী চাতুর্ব্বর্ণ্য নীতির অনুসরণ করিতে হয় এবং এই

সাংসারিক কর্ম্মের স্তরেই তাহার বিভিন্ন গুণের ভিতর দিয়া ভগবানের সন্ধান করিতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, যদিও আমি চাতুর্ব্বর্ণ্য নীতি অনুসারে কর্ম্ম করি এবং আমি এই নীতির সৃষ্টিকর্ত্তা তথাপি আমাকে অব্যয়, অক্ষর, অকর্ত্তা বলিয়া জানিও, কর্ম্ম সকল আমাকে আসক্ত করে না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

কারণ, ভগবান অক্ষররূপে এই অহঙ্কার ও প্রকৃতিজাত গুণের এই দ্বন্দ্বের অতীত এবং পুরুষোত্তমরূপে তিনি কর্ম্মের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। অতএব, ভাগবত কর্ম্মের কর্ম্মিগণকে চাতুর্ব্বর্ণ্য নীতি অনুসারে কর্ম্ম করিবার সময়েও—উপরে যাহা রহিয়াছে তাহা জানিতে হইবে এবং অহঙ্কারের গণ্ডীর উপরে পরমেশ্বরের সত্তায় বাস করিতে হইবে।

ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ৪।১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।

কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ৪।১৫

"এইরূপে যিনি আমাকে জানেন, তিনি তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বতন (জনকাদি) মুমুক্ষুরাও কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও পূর্ব্বতন সাধুগণের কৃত পুরাকাল প্রবৃত্ত কর্ম্মই কর।"

গীতার এই যে কথাগুলি এখানে উত্থিত হইল এগুলি দিব্য-কর্ম্ম, ভাগবত কর্ম্মের স্বরূপের পরিচায়ক—পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহার

নীতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই কথাগুলির পূর্ব্বেই গীতা হইতে যে শ্লোকগুলি তুলিয়া আমরা অনুবাদ করিয়াছি—তাহাতে দিব্য জন্মের, অবতারের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভাল করিয়া বলিয়া দিতে চাই যে শুধু জগতে ধর্ম্ম রক্ষা, ধর্ম্ম সংস্থাপনই অবতারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; কারণ শুধু ধর্ম্ম সংস্থাপন যথেষ্ট উদ্দেশ্য নহে, একজন খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ বা বুদ্ধের অবতারের উচ্চতম সম্ভব লক্ষ্য নহে, কিন্তু উচ্চতর প্রয়োজন ও লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য সাধারণ প্রয়োজনীয় অবস্থা মাত্র। কারণ ভগবানের জন্মের দুইটি দিক আছে, একটি হইতেছে, অবতরণ, মানবরূপে ভগবানের জন্ম, মানব শরীর ও স্বভাবের মধ্যে ভাগবতের প্রকাশ, চিরন্তন অবতার; অপরটি হইতেছে আরোহণ, ভাগবত ভাবে মানবের জন্ম, ভাগবত প্রকৃতি ও চৈতন্যে মানবের উত্থান, মদ্ভাবমাগতা; ইহা আত্মার নূতন জন্মে পুনর্জন্ম লাভ। এই নবজন্ম সাধনের জন্যই অবতার এবং ধর্ম্মসংস্থাপন। গীতার অবতারবাদের এই যে দুইটি দিক রহিয়াছে তাহা অসতর্ক পাঠকের চক্ষুতে পড়ে না, কারণ সাধারণ পাঠকেরা গীতার অর্থ তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করে না, দেখিবামাত্র সহজে যে অর্থ মনে আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়; গীতার গোঁড়া টীকাকারেরাও ইহা ধরিতে পারে না, কারণ কোন বিশেষ মতবাদের সঙ্কীর্ণতাতে তাহারা প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করিয়া দেখে। অথচ, অবতারবাদের সম্যক সার্থকতার জন্য এই দুইটি দিকই প্রয়োজন। নতুবা, এই অবতারবাদ শুধু

একটা গোঁড়া মত, একটা সাধারণ কুসংস্কার বা কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক মহাপুরুষকে কল্পনার বলে ভগবান বলিয়া বর্ণনা করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না; কিন্তু, গীতার শিক্ষা এইরূপ নহে, গীতার সমস্ত শিক্ষার ন্যায় এই অবতারবাদও গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উত্তমম্ রহস্যম্, শ্রেষ্ঠ রহস্যেরই অন্তর্গত।

এইরূপে মানুষকে তুলিয়া ভাগবত জীবনের মধ্যে লইয়া যাইতে সাহায্য করিবার জন্যই মানবশরীরে ভগবানের অবতরণ। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে শুধু ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবানের অবতারের কোন প্রয়োজন নাই; কারণ ধর্ম্ম, ন্যায়, পাপপুণ্যের বিধান—এসকলের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর সকল সময়েই সাধারণ উপায়ের দ্বারা সংসাধন করিতে পারেন—মহাপুরুষ বা মহৎ আন্দোলনের ভিতর দিয়া, সাধু, রাজা এবং ধর্ম্মোপদেষ্টাদের জীবন ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া, এই সকল সংসাধিত হইতে পারে, বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয় না।

মানবীয় প্রকৃতির মধ্যে ভাগবত প্রকৃতির প্রকাশই অবতার, এইরূপেই খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধের অবতার—ইহার উদ্দেশ্য এই যে খ্রীষ্টত্ব, কৃষ্ণত্ব, বুদ্ধত্বের অনুসরণ করিয়া মানবের নীতি, চিন্তা, ভাব, কর্ম্মের অনুশীলন হইবে এবং এইরূপে মানব প্রকৃতি ভাগবত প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে। অবতার যে নীতি, যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন ইহাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য; খ্রীষ্ট, বা কৃষ্ণ বা বুদ্ধ কেন্দ্রস্থানে দ্বারের মত দাঁড়াইয়া থাকেন—তাঁহার নিজের

ভিতর দিয়াই মানুষের অগ্রসর হইবার পথ করিয়া দেন। এইজন্যই প্রত্যেক অবতার মনুষ্যের সম্মুখে নিজের জীবনের আদর্শই ধরিয়া থাকেন এবং প্রচার করেন যে তিনিই পথ, তিনিই প্রবেশের দ্বার; তিনি আরও প্রচার করেন যে মানবরূপে তিনি ও ভগবান একই—যীশু বলিয়াছেন, মানবপুত্র তিনি এবং যে স্বর্গীয় পিতা হইতে তিনি অবতীর্ণ উভয়েই এক; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন মানবশরীরে তিনি, মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্ এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদ, মহেশ্বর উভয়েই এক ভগবান পুরুষোত্তমেরই প্রকাশ, সেখানে নিজ স্বরূপে প্রকাশ, এখানে মানবমূর্ত্তিতে প্রকাশ।

অবতারের এই দ্বিতীয় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যই যে গীতাশিক্ষার সার তাহা গীতার কেবল এই অংশের যথার্থ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়; কিন্তু, শুধু এই অংশটি না ধরিয়া অন্যান্য অংশও যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে ইহা আরও স্পষ্ট হয়। বাস্তবিক গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে—কোন বিশেষ শ্লোক বা অংশকে স্বতন্ত্র ভাবে ধরা ঠিক নহে—অন্যান্য শ্লোক বা অংশের সহিত মিলাইয়া, এবং সমগ্র শিক্ষার সহিত মিলাইয়া তাহার অর্থ করা সমীচীন। গীতা যে বলিয়াছে একই আত্মা সর্ব্বভূতে বিরাজমান, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত—আমাদিগকে গীতার সেই শিক্ষা এখানে স্মরণ করিতে হইবে; ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টির পরস্পরের সম্বন্ধের কথা মনে করিতে হইবে, বিভূতির কথা গীতায় যেরূপ জোরের সহিত বলা হইয়াছে তাহাও মনে করিতে হইবে। গীতার গুরু যে ভাষায় নিজের নিঃস্বার্থ কর্ম্মের

দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে—এই বর্ণনা মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ এবং জগতের ঈশ্বর উভয়ের পক্ষেই সমানভাবে খাটে ; নবম অধ্যায়ের নিম্ন শ্লোকটীর মত শ্লোকগুলির মর্ম্মও গ্রহণ করিতে হইবে :—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১

"ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে কারণ তাহারা সর্ব্বভূতের মহান ঈশ্বররূপ আমার পরম তত্ত্ব জানে না।" অবতারের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে এই সকল তথ্যের আলোকে আমাদিগকে গীতার নিম্নলিখিত ঘোষণাটী বুঝিতে হইবে,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥
বীতরাগভয় ক্রোধামন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ৪।১০।১১

"হে অর্জ্জুন যিনি আমার এইরূপ জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহ ত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য মদেক চিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞান তপস্যার দ্বারা পবিত্র অনেক মহাত্মাই আমার ভাব পাইয়াছেন।"

এইরূপ আলোচনা করিলে আমরা ভগবানের জন্মের প্রকৃত স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব ; বুঝিব যে এই অবতার বা দিব্য জন্ম একটা বিচ্ছিন্ন অলৌকিক ঘটনা নহে—জগৎ-

বিকাশরূপ সমগ্র ব্যাপারের মধ্যে ইহারও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে; নতুবা আমরা ইহার দিব্য রহস্য বুঝিতে পারিব না, হয়ত আমরা একেবারেই এই অবতার তত্ত্বকে উড়াইয়া দিব অথবা, অন্ধভাবে কিছু না বুঝিয়াই ইহাকে মানিয়া লইব এবং বর্ত্তমান যুগে মানুষ গভীর চিন্তা না করিয়া মোটামুটি অবতার তত্ত্বকে বুঝিতে যাইয়া যে সব ভুল করে আমরাও সেই ভুলে পতিত হইব।

প্রাচ্য হইতে যে সকল ভাব পাশ্চাত্য দেশে যাইতেছে তাহাদের মধ্যে এই অবতারতত্ত্ব পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে বুঝা বড়ই কঠিন। বৈজ্ঞানিকগণ হয় অবতারবাদকে অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেয় নতুবা ইহাকে রূপক মাত্র বলিয়া গ্রহণ করে—তাহাদের মতে যে সকল মনুষ্য বিশেষ শক্তি, প্রতিভা বা কর্ম্ম দেখায় তেমন লোককেই সাধারণে অবতার বলিয়া থাকে। জড়বাদিগণ অবতার তত্ত্বকে আমলই দিতে পারে না; কারণ, তাহারা ভগবানের অস্তিত্বই স্বীকার করে না; যাহারা ঈশ্বরকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে দেখেন (Deists Dualists) তাঁহারা ভগবান যে মানুষ হন একথা [illegible] উড়াইয়া দেন। তাঁহাদের মতে ভগবান যদি থাকেন তাহা হইলে তিনি বিশ্বের উপরে অথবা বাহিরে আছেন এবং তিনি সংসারের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না, বাঁধা নিয়ম কানুনের বশে জগতের কার্য্যাবলী পরিচালিত হয়,—বস্তুত তিনি একজন দূরবর্ত্তী রাজার মত, বড় জোর তিনি প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার পশ্চাতে উদাসীন,

নিষ্ক্রিয়, আত্মা মাত্র, সাংখ্যের সাক্ষীর মত; তিনি পবিত্র আত্মা, তাঁহার পক্ষে শরীর ধারণ সম্ভব নহে, তিনি অনন্ত, মানুষ যেমন সান্ত, তিনি তেমন সান্ত হইতে পারেন না, তিনি চির অজ, সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনি কখনও সৃষ্টজীবরূপে জগতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না ;—তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইলেও—এ সকল তাঁহার পক্ষেও সম্ভব নহে। দ্বৈতবাদীরা আরও আপত্তি তুলেন যে ভগবানের স্বরূপ ও ব্যবহার মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ; যিনি পূর্ণ, মনুষ্যের অপূর্ণতা তাহাতে সম্ভব নহে ; অজ পুরুষ ঈশ্বর কখনও মানুষের আকারে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন না, যিনি সমগ্র জগতের নিয়ামক তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন মানবীয় কর্ম্মের মধ্যে বদ্ধ হইতে পারেন না, ধ্বংসশীল মানবশরীরের মধ্যে বদ্ধ হইতে পারেন না। এই সকল আপত্তি শুনিবামাত্রই খুব বড় বলিয়া মনে হয়। গীতার গুরুর মনেও যে এই আপত্তিগুলি উঠিয়াছিল তাঁহার নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯।১১

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম ॥ ৪।১৩

"আমি জন্ম রহিত, অবিনশ্বর এবং প্রাণিগণের ঈশ্বর ; তাহা

হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়া বশতঃ আবির্ভূত হইয়া থাকি।”

“মূঢ়গণ সর্ব্বভূতের মহান্ ঈশ্বররূপ আমার পরম তত্ত্ব না জানায় মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে।”

“আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগে, চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি; আমাকে তাহার কর্ত্তা বলিয়া জানিও, অব্যয় অকর্ত্তা বলিয়াও জানিও”—ভাগবত চৈতন্যের কর্ম্মের মধ্যে তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা এবং সংসারের সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, আবার ভাগবত চৈতন্যের নীরবতার মধ্যে তিনি তাঁহার প্রকৃতির কর্ম্মের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা—কারণ তিনি সকল সময়ে নীরবতা ও কর্ম্ম উভয়েরই উপরে, তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। গীতা এই সমস্ত আপত্তিরই খণ্ডন করিতে এবং এই সকল বিরোধের মীমাংসা করিতে পারিয়াছে, কারণ গীতা জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বেদান্তের মত গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

কারণ, বেদান্তের মতে এই সকল আপত্তি ও বিরোধের কোন ভিত্তি নাই। বেদান্তের মতের জন্য অবতারবাদ অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে বটে তথাপি ইহা বেদান্তের সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মতবাদের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া পড়ে। কারণ এই মতানুসারে সমস্তই ভগবান, আত্মা স্বয়ম্ভূ, ব্রহ্ম, একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই, থাকিতে পারে না, প্রকৃতি ভাগবত চৈতন্যেরই শক্তি এবং ইহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; সকল জীবই ভগবানের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন

আত্মমূর্ত্তি ও শারীরিক মূর্ত্তি—ভাগবত চৈতন্যের শক্তি হইতেই উৎপন্ন অথবা তাহার মধ্যে অবস্থিত। অনন্তের পক্ষে সান্তভাব গ্রহণ করা অসম্ভব ত নহেই, সমস্ত বিশ্বই ইহা ভিন্ন আর কিছু নহে; আমরা যে ভাবেই দেখি না কেন, যে জগতে আমরা বাস করি তাহার কোথাও ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আত্মার পক্ষে আকার গ্রহণ করা, অথবা দেহ ও মনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অসম্ভব ত নহেই, পরন্তু এইরূপ সম্বন্ধের দ্বারাই জগৎ টিকিয়া আছে। এই জগৎ শুধু চৈতন্যহীন অন্ধ নিয়মের খেলা নহে, জগতের বাহিরে কোন চৈতন্য বা আত্মা শুধু উদাসীন সাক্ষীভাবে বসিয়া নাই, সমগ্র জগৎ এবং জগতের প্রতি অণু পরমাণু ভাগবত শক্তির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং সেই শক্তি জগতের প্রত্যেক গতি ও ক্রিয়া পরিচালন করে, জগতের প্রত্যেক শরীরের মধ্যে বাস করে, প্রত্যেক শরীর ও মনকে অধিকার করে; সকলেই ভগবানের মধ্যে আছে, সকলেই তাঁরই মধ্যে চলাফেরা করে, তাঁহারই মধ্যে জীবন যাপন করে: তিনি সকলের মধ্যে আছেন, সকলের ভিতর দিয়া কর্ম্ম করেন এবং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন; প্রত্যেক জীবই ছদ্মবেশী নারায়ণ।

অজ ভগবানের পক্ষে জন্মগ্রহণ অসম্ভব হওয়া দূরের কথা, সমস্ত জীব ব্যক্তিগত ভাবেই অজ আত্মা, সকলেই আদিঅন্তহীন সনাতন, তাঁহাদের গূঢ় সত্তায় সকলেই সেই এক আত্মা যাঁহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু বাহিক আকার পরিগ্রহ এবং পরিবর্ত্তনের লক্ষণ মাত্র। যিনি পূর্ণ (Perfect) তিনি কেমন করিয়া

অপূর্ণতা (imperfection) পরিগ্রহ করিতে পারেন ইহাই বিশ্বপ্রপঞ্চের পরম রহস্যময় ব্যাপার; কিন্তু, যে মন ও শরীর পরিগৃহীত হয় তাহার আকার ও কর্ম্মেই অপূর্ণতা দোষ বিরাজমান—যিনি এইসব পরিগ্রহ করেন তাঁহাতে কোন অপূর্ণতা নাই, যেমন সূর্য্য যে আলো দেয় তাহাতে কোন দোষ নাই, যাহার যেমন চক্ষু সে তেমনই আলো দেখিয়া থাকে, বিভিন্ন ব্যক্তির চক্ষুতে অপূর্ণতা বা দোষ থাকে। ভগবান কোনও দূর স্বর্গ হইতে যে এই বিশ্ব জগৎ পরিচালন করেন তাহাও নহে, সর্ব্বত্র নিবিড় ভাবে বিরাজিত থাকিয়াই জগৎ পরিচালন করেন; শক্তির যে সব সসীম ক্রিয়া সে সবই এক অনন্ত শক্তিরই ক্রিয়া, সে সব কোন সীমাবদ্ধ, স্বতন্ত্র শক্তির ক্রিয়া নহে, সবই সেই এক অনন্ত শক্তি হইতে উদ্ভূত; ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রত্যেক সসীম ক্রিয়াতেই অনন্ত সর্ব্ব-ইচ্ছা এবং সর্ব্ব-জ্ঞানের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান কোন দূরদেশে জগতের বাহিরে থাকিয়া জগৎ পরিচালন করেন না; তিনি সকলের অতীত বলিয়াই সকলকেই পরিচালনা করেন, কিন্তু, আবার তিনি সকল ক্রিয়ার মধ্যেই পরমাত্মারূপে আছেন বলিয়াও সকলকে পরিচালনা করেন। অতএব, আমাদের বুদ্ধি অবতারের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি তুলিয়া থাকে সে সকল ভিত্তিহীন। কারণ আমাদের বুদ্ধি যে, (অনন্ত ও সান্তের, পূর্ণ ও অপূর্ণের) মিথ্যা বিভাগ করিয়া থাকে তাহা জগতের প্রতি ঘটনার, প্রতি সত্যের বিরোধী।

কিন্তু, সম্ভাবনার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই প্রশ্ন উঠে যে বাস্তবিকই কি এইরূপ ঘটিয়া থাকে? বাস্তবিকই কি ভাগবত চৈতন্য আবরণের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া সাক্ষাৎভাবে বাহ্যজগতে, মানসিক ও জড় জগতে, সসীমের মধ্যে, অসম্পূর্ণের মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকে? প্রকৃত পক্ষে সসীম আর কিছুই নহে, নিজের বিভিন্ন চৈতন্যের সম্মুখে অনন্তের আত্মপ্রকাশই সসীম; কার্য্যতঃ সসীম যে ভাবেই প্রতীয়মান হউক বস্তুতঃ প্রত্যেক সসীমই নিজ সত্তায় অসীম অনন্ত। মানুষকে আমরা ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে মানুষ একেবারে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নহে, কিন্তু, বিশেষ শরীর ও মনের ভিতর মানব-জাতিরই প্রকাশ; তেমনই মানব জাতিও কোন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি নহে, ইহা বিশ্বসত্তার, বিশ্বেশ্বরেরই মানবজাতিরূপে আত্মপ্রকাশ। সেখানে এই বিশ্বসত্তা নিজেকেই বিকাশ করে এবং তাহাই আত্মা (Spirit)।

কারণ আত্মা, (spirit) বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই,—নিজের অস্তিত্বের জন্য আত্মা (spirit) আর কাহারও উপর নির্ভর করে না, ইহার সত্তায় অনন্ত চৈতন্য শক্তি রহিয়াছে এবং ইহা নিজের আনন্দেই ভরপুর; হয় ইহা এরূপ নতুবা ইহা কিছুই নয়, অন্ততঃ মানুষ ও জগতের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। চেতনসত্তার শক্তি পুঞ্জিভূত হইয়াই শরীর, জড় উৎপন্ন হইয়াছে—চৈতন্য যে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ভাবে কার্য্য করিবে তাহার

জন্তুই শরীর; জড়ও প্রকৃত পক্ষে কোথাও চেতনাহীন নহে, কারণ, বর্ত্তমান বিজ্ঞানই স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে প্রত্যেক অণুতে (atom), প্রত্যেক কোষে (cell) একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা বুদ্ধি ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু সেই শক্তি, অন্তর্নিহিত আত্মার, ভাগবতেরই ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধি; কোষে ও অণুতে যে চেতনা শক্তি, ইচ্ছাশক্তি, তাহা তাহার নিজস্ব, স্বতন্ত্র শক্তি নহে। এই যে বিশ্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তি, বোধশক্তি সর্ব্বত্র নিহিত রহিয়াছে ইহা বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন-ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং অন্ততঃ পৃথিবীতে ইহা মানুষের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ করিয়াছে—মানুষের ভিতরে যে বিকাশ তাঁহাই পূর্ণ ভাগবতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাযুজ্য লাভ করিয়াছে এবং প্রথমে মানুষই অস্পষ্টভাবে নিজের ভাগবত সত্তা উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু এখানেও বাধা আছে, এখানেও বিকাশের সেই অসম্পূর্ণতা আছে যাহার জন্য নিম্ন স্তরের আধারে ভগবানের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি হয় না। কারণ, প্রত্যেক সসীম সত্তাতেই তাহার বাহিরের কর্ম্মে যেমন অসম্পূর্ণ আছে তেমনই তাহার বাহিরের চৈতন্যেও অসম্পূর্ণতা আছে এবং ইহা হইতেই জীবের স্বরূপ নিরূপিত হয় ও এইরূপেই জীবের সহিত জীবের বিভিন্নতা হয়। সত্য বটে যে ভাগবত শক্তি পশ্চাৎ হইতে কর্ম্ম করে এবং এই বাহ্যিক অসম্পূর্ণ চেতনা ও ইচ্ছার ভিতর দিয়া ইহার বিশেষ বিকাশ সম্পন্ন করে কিন্তু ইহা নিজে গুহায়াম্ (বেদ)

গুহার ভিতর লুক্কায়িত ; অথবা গীতায় যেমন বলা হইয়াছে—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

"ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় মায়া প্রভাবে সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় পরিভ্রমণ করাইতেছেন।" ভগবান এই যে জীবের হৃদয়ে গুপ্ত থাকিয়া অলক্ষ্যে তাহার প্রাকৃত চৈতন্যের ভিতর দিয়া কর্ম্ম করেন অথচ এই অহঙ্কারাচ্ছন্ন প্রাকৃত চৈতন্য কিছু বুঝিতে পারে না—জীবের সহিত ভগবানের সর্ব্বত্রই এইরূপ ব্যবহার। তবে কেন আমরা ধরিতে যাইব যে কোন বিশেষ আধারে তিনি অন্তরাল হইতে সম্মুখে আসেন, বাহ্য চৈতন্যের মধ্যে আসন এবং তখন আরও সাক্ষাৎভাবে ও সজ্ঞানে ভাগবত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়? ভগবান ও মানুষের মধ্যে যে অন্তরাল (veil) রহিয়াছে এবং সীমাবদ্ধ অসম্পূর্ণ মানুষ যাহা নিজে সরাইতে পারে না, তাহা উত্তোলন করাই যে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

গীতা বলে, জীব সাধারণতঃ যে অসম্পূর্ণ ভাবে কর্ম্ম করে, তাহার কারণ জীব প্রকৃতির প্রক্রিয়ার বশ এবং মায়া তাহার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। প্রকৃতি ও মায়া, ভাগবত চৈতন্যের একই কার্য্যকরী শক্তির দুইটি ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। মূলতঃ মায়া ভ্রম (illusion) নহে (ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতির অজ্ঞান হইতেই মায়ার ভ্রম উৎপন্ন), ভাগবত চৈতন্য

বিভিন্নভাবে নিজেকে নিজের সম্মুখে ধরিতেছে, আত্মপ্রকাশ করিতেছে—ইহাই মায়া ; এই সকল বিভিন্ন আত্মপ্রকাশকে স্বভাব ও স্বধর্ম্মমত কার্য্যে পরিণত করা যাহার কাজ, ভাগবত চৈতন্যের সেই কার্য্যকরী শক্তিই প্রকৃতি।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৯।৮

"আমি আমার নিজের প্রকৃতির উপর চাপিয়া প্রকৃতি-পরবশ এই সকল ভূতগণকে বারংবার সৃষ্টি করি।" মানব-শরীরে অবস্থিত ভগবানকে যাহারা জানে না তাহাদের এই অজ্ঞানের কারণ এই যে তাহারা প্রকৃতির এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বশ এবং তাহারা আসুরিক স্বভাবের মধ্যে বাস করে ; এই আসুরিক স্বভাব বাসনা ও অহঙ্কারের দ্বারা তাহাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, মোহিনীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ। কারণ, হৃদিস্থিত পুরুষোত্তমকে সকলেই সহজে দেখিতে পায় না : তিনি নিজেকে গভীর অন্ধকার মেঘের অন্তরালে অথবা উজ্জ্বল আলোক মেঘের অন্তরালে লুকাইয়া রাখেন, যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখেন। * গীতায় বলা হইয়াছে—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ৭।১৩

* নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া :
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪
ন মাং দুস্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ৭।১৫

"এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব সকলে মোহিত হওয়ায়, জগতীস্থ জনগণ আমাকে জানিতে পারে না। কারণ, এই ত্রিগুণময়ী আমার মায়া বড়ই দুস্তরা; যাঁহারা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করেন। পাপ-পরায়ণ বিবেক শূন্য নরাধমগণ আমার ভজন করে না; তাহাদের জ্ঞান মায়া কর্তৃক অপহৃত হয়।" অর্থাৎ ভাগবতের জ্ঞান সকলের মধ্যেই ওতঃপ্রোত ভাবে রহিয়াছে, কারণ, সকলের মধ্যেই ভগবান বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি সেখানে মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্বারা, মায়ার ক্রিয়ার দ্বারা এই মূল আত্মজ্ঞান অপহৃত হয়, অহঙ্কারের ভ্রমে পরিণত হয়। তথাপি মানুষ প্রকৃতির ক্রিয়া হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুপ্ত প্রভুর দিকে ফিরিলে ভগবানকে জানিতে পারে।

এখানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গীতা সাধারণ জীবের জন্ম যে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে তাহারই বিশেষ প্রয়োজনীয় স্বল্প একটু পরিবর্ত্তন করিয়া ভগবানের অবতারের কথাও বর্ণনা করিয়াছে। ভগবান কেমন করিয়া সাধারণ জীবের জন্ম দেন সে সম্বন্ধে পরে বলা হইবে—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূত গ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৯।৮

এখানে বলা হইতেছে—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

"স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি।" আত্মানম্ সৃজামি, (I loose forth myself) আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যবহৃত "অবষ্টভ্য" কথার দ্বারা এই বোঝায় যে উপর হইতে নীচের দিকে এমন সজোরে চাপ দেওয়া যাহাতে অধিকৃত বস্তুটি তাহার সমস্ত গতি ক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে নির্জ্জিত, নিপীড়িত, সীমাবদ্ধ হয়, সম্পূর্ণভাবে উপরের বস্তুর বশ হইয়া পড়ে, অবশম্ বশাৎ; প্রকৃতি এই প্রক্রিয়ায় কলের (mechanism) মত কাজ করে এবং জীব সকলের নিজেদের কোন প্রভুত্ব থাকে না, এই কলের বলে অবশ হইয়া কার্য্য করে। অন্যদিকে, "অধিষ্ঠায় শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহার অর্থ প্রকৃতিতে বাস করা কিন্তু, প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া সজ্ঞানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে প্রকৃতির কার্য্য পরিচালনা করা— ইহাতে পুরুষ অজ্ঞানের বশে অবশ ভাবে প্রকৃতি কর্ত্তৃক চালিত হয় না, বরং প্রকৃতিই পুরুষের জ্ঞান ও ইচ্ছায় পূর্ণ হয়। অতএব, সাধারণ জন্মে যাহা সৃষ্ট হয় তাহা ভূতগ্রামম্, ভূত সকল; দিব্যজন্মে যাহা আবির্ভূত হয় তাহা, আত্মানম্।

কারণ, বেদান্ত আত্মা ও ভূতানি এই দুয়ের যে প্রভেদ করিয়াছে পাশ্চাত্য দর্শনও সেই প্রভেদ করিয়াছে Being এবং তাহার becomings। উভয় ক্ষেত্রে মায়াই জন্মের বা আত্ম-প্রকাশের উপায় (means), কিন্তু, দিব্য জন্মে ইহা হইতেছে আত্মমায়য়া, স্বীয় মায়ার দ্বারা, অজ্ঞানের যে নীচ মায়া তাহার দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে, ইহা হইতেছে স্বয়ম্ভু ভগবানের সজ্ঞানে জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ, এই মায়ার ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে তাঁহার বিদিত। গীতা অন্যত্র ইহাকেই যোগ-মায়া বলিয়াছে। সাধারণ জন্মে ভগবান এই যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে নিম্ন চৈতন্য (Lower consciousness) হইতে লুকাইয়া রাখেন এবং এইরূপে ইহা আমাদের পক্ষে অজ্ঞানের যন্ত্রস্বরূপ হয়, অবিদ্যামায়া; কিন্তু, এই একই যোগমায়া আবার আমাদিগকে আত্মজ্ঞান লাভ করায়; আমরা ভগবতজ্ঞানে ফিরিয়া আসি, ইহা জ্ঞানের যন্ত্রস্বরূপ হয়, বিদ্যা-মায়া; দিব্য জন্মে ইহা এইরূপেই কার্য্য করে—সাধারণতঃ যে সব কার্য্য অজ্ঞানের বশে করা হয় ইহা সেই সকল কার্য্যকে জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত ও পরিচালিত করে।

গীতার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে দিব্য জন্ম হইতেছে ভগবানের সজ্ঞানে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করা এবং মূলতঃ সাধারণ জন্মের বিপরীত, (যদিও একই উপায়ের দ্বারা দুইটিই সংঘটিত হইয়া থাকে,) কারণ ইহা অজ্ঞানের মধ্যে জন্মগ্রহণ নহে, পরন্তু জ্ঞানেরই জন্মগ্রহণ, ইহা শারীরিক ব্যাপার নহে পরন্তু আত্মার

জন্ম। এইরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মা ভূতরূপে নিজের পরিণতি সজ্ঞানে নিয়মিত করিয়া, অজ্ঞানমেঘে আত্মজ্ঞান না হারাইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এখানে আত্মা প্রকৃতির অধীশ্বর রূপেই শরীরে জন্মগ্রহণ করেন, প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া তাহার ভিতর স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছার দ্বারা কর্ম্ম করেন, প্রকৃতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে, বদ্ধ হইয়া ঘূর্ণীয়মান হন না; কারণ এখানে তিনি জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করেন, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় অজ্ঞানের বশে কর্ম্ম করেন না। সকলের মধ্যে যে আত্মা গুপ্তভাবে রহিয়াছে এবং গোপন স্থান হইতে সমস্ত পরিচালনা করিতেছে, দিব্যজন্মে তাহা সম্মুখে আসিয়া মানবমূর্ত্তিকে ভগবদ্ভাবেই অধিকার করে; সাধারণ জন্মে ইহা অন্তরালের ভিতরে ঈশ্বররূপে থাকে এবং সেখানে অন্তরালের বাহিরে যে চৈতন্য তাহা প্রকৃতি কর্ত্তৃক অধিকৃত, আত্মজ্ঞানহীন, কর্ম্মে বদ্ধ জীব। অতএব, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মানবত্বের ভিতর ভাগবতভাবের সাক্ষাৎ প্রকাশই অবতার *; মানবত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, বিভূতি অর্জ্জুনকে গুরু এই ভাগবত অবস্থায় উঠিবার কথাই বলিয়াছেন; তাঁহার সাধারণ মানবোচিত ক্ষুদ্রত্ব ও অজ্ঞান অতিক্রম করিতে না পারিলে এ অবস্থায় উঠা সম্ভব নহে। আমাদিগকে নীচে হইতে যাহার বিকাশ করিতে হইবে উপর

---

* অবতার শব্দের অর্থ নামিয়া আসা, যে রেখা ভাগবতকে মানবী" স্তর হইতে পৃথক করিতেছে সেই রেখার নীচে নামিয়া আসাই অবতার।

হইতে তাহার প্রকাশই, অবতার; মানবের যে দিব্য জন্মে আমাদের মত নরজগতের জীবগণকে উঠিতে হইবে, তাহাতে ভগবানের অবতরণই, অবতার; সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবত্বের ভিতর প্রকটিত এই মনোহর দিব্য আদর্শ ভগবান মানুষের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

ষোড়শ অধ্যায়

অবতরণের প্রণালী

মানুষের জন্ম গূঢ় রহস্যময়। আমরা দেখিলাম গীতার মতে ভগবানের মানবরূপে অবতরণ এই রহস্যেরই আর একটা দিক,—অবতারে ভগবান মানবরূপ গ্রহণ করেন, মনুষ্যজন্মও মূলতঃ ভগবানের মানবরূপ গ্রহণ ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রত্যেক মানবেরই সনাতন, সর্ব্বগত আত্মা ভগবান, এমন কি মানুষের ব্যষ্টিগত আত্মা, জীবাত্মাও ভগবানের অংশ, মমৈবাংশ,—অবশ্য এই অংশ ভগবানের খণ্ড বা ভগ্নাংশ নহে, কারণ ভগবানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভগ্ন বা বিভক্ত করা যায় না, ইহা সেই এক পূর্ণ চৈতন্যের আংশিক চৈতন্য, সেই এক শক্তির আংশিক শক্তি, এক বিরাট আনন্দের বিশ্বলীলায় আংশিক আনন্দ, অতএব বিশ্বলীলার জন্য সেই অনন্ত অসীম সত্তার সীমার ভিতর, গণ্ডীর ভিতর আত্মপ্রকাশই জীবাত্মা। এই অসীমতার চিহ্ন হইতেছে অজ্ঞান, অবিদ্যা, এই অজ্ঞানের বশে মানুষ ভুলিয়া যায় যে সে ভগবান হইতেই আসিয়াছে, এমন কি তাহার হৃদয়ের মধ্যে গুপ্তভাবে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাহারই

মানবচৈতন্যের মন্দিরে আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছেন তাহাও সে ভুলিয়া যায়।

মানুষ অজ্ঞান কারণ যে প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারা ভগবানের অনন্ত সত্ত্বা হইতে সে বহির্গত হইয়াছে, সেই মায়ার ছাপ তাহার অন্তরাত্মার দৃষ্টিতে, তাহার ইন্দ্রিয় সকলের উপরে রহিয়াছে: মায়া তাহাকে ভাগবত সত্ত্বার মূল্যবান ধাতু হইতে মুদ্রার ন্যায় খোদিত করিয়াছে, কিন্তু বাহ্যগুণের খাদের দ্বারা তাহার উপরে এক কঠিন আবরণ লাগাইয়া দিয়াছে, নিজের ছাপ মারিয়া দিয়াছে, পাশবিক মনুষ্যত্বের চিহ্ন বসাইয়া দিয়াছে; যদিও সেখানে ভগবানের চিহ্ন গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তথাপি তাহা প্রথমে বুঝা যায় না—অনেক কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়, আমাদের নিজেদের জীবনের গূঢ় রহস্যে দীক্ষালাভ না করিলে উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অবতারে ভগবান যেখানে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে প্রকৃত ধাতু আবরণের ভিতর দিয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। সেখানে প্রকৃতির ছাপ নামমাত্র, সেখানে জ্ঞান অন্তরস্থিত ভগবানের, সেখানে শক্তি অন্তরস্থিত ভগবানের এবং তাহা মানবীয় প্রকৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া বাহির হয়। সেখানে ভগবানের চিহ্ন (শারীরিক, বাহ্যিক চিহ্ন নহে, আধ্যাত্মিক চিহ্ন) খুবই স্পষ্ট—যে দেখিতে চায় বা দেখিতে পারে সেই দেখিতে পায়। আসুরিক প্রকৃতির লোকেরা এই সকল ব্যাপারে সর্ব্বদা অন্ধ, তাহারা শরীরকে দেখে, আত্মাকে দেখেনা, বাহিরের সত্তাকে দেখে, ভিতরের

সত্তাকে দেখে না, তাহারা শুধু মুখোসটিকে দেখে, ভিতরের পুরুষ-টিকে দেখে না। সাধারণ মনুষ্যজন্মে ভগবানের প্রকৃতি-ভাবটাই প্রবল, অবতারের মনুষ্যজন্মে ভাগবতভাবই প্রবল। একটিতে ভগবানের অংশকে মানবীয় প্রকৃতি অধিকার করে, বশীভূত করে (অবশ্য ভগবান এইরূপ করিতে দেন বলিয়াই করে); অপরটিতে ভগবানই নিজের অংশকে অধিকার করেন, বশে রাখেন, ভাগবতভাবে পরিচালিত করেন। গীতার মতে সাধারণ মানুষ ক্রমোন্নতির ফলে, উর্দ্ধে উঠিয়া যে ভাগবতভাব লাভ করে তাহা অবতার নহে, ভগবান যখন মানবীয়তার মধ্যে নামিয়া আসেন, মানবীয় আকার গ্রহণ করেন, তাহাই অবতার। তবে, মানুষের এই ক্রমোন্নতিকে, উর্দ্ধগতিকে সাহায্য করিবার নিমিত্তই ভগবান অবতাররূপে নামিয়া আসেন; এইটি গীতা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে। মানুষের মধ্যে ভাগবত সত্তার প্রকাশ সম্ভব ইহা দেখাইবার জন্যই অবতার, যেন মানুষ দেখিতে পায় যে মানুষে এই ভাগবত সত্তা কিরূপ এবং তাহা দেখিয়া ঐ সত্তা নিজেদের জীবনে লাভ করিবার ভরসা করিতে পারে। অবতারের আরও উদ্দেশ্য হইতেছে, ভগবানের এইরূপ আবির্ভাবের প্রভাব পৃথিবীতে রাখিয়া যাওয়া এবং পার্থিব প্রকৃতিকে উর্দ্ধের দিকে তুলিতে সাহায্য করা। দেবপ্রকৃতি মানব কিরূপ তাহার একটা আধ্যাত্মিক ছাঁচ দেখান অবতারের উদ্দেশ্য, যেন দিব্যজীবনকামী মানব সেই ছাঁচে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে। অবতারের উদ্দেশ্য

একটি ধর্ম্ম দেওয়া শুধু কোন এক মতবাদ নহে, কিন্তু অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন যাপনের প্রণালী দেওয়া, এমন এক ধর্ম্ম দেওয়া যাহার দ্বারা মানুষ দেবত্বলাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আবার মানুষের এই উর্দ্ধগতি, এই দেবজন্ম লাভ একটা বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টিগত ব্যাপার নহে, কিন্তু জগতে ভগবানের অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় ইহা সমষ্টিগত ব্যাপার, সমগ্র মানব জাতির উন্নতি ও কল্যাণ ইহার লক্ষ্য, অতএব দেখা যাইতেছে যে অবতারের আরও উদ্দেশ্য মানবজাতির অগ্রগমনে সাহায্য করা, জাতির সকল মহাসন্ধিক্ষণে মানবকে সাহায্য করা, যখন মানবজাতিকে নীচের দিকে টানিবার শক্তিগুলি খুব প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাদের ধ্বংস সাধন করা, মানুষের প্রকৃতিতে ভগবানের দিকে উঠিবার যে ধর্ম্ম রহিয়াছে তাহা রক্ষা করা বা পুনপ্রতিষ্ঠিত করা, দেশ কাল অনুসারে যতদূর সম্ভব জগতে স্বর্গরাজ্য (The Kingdom of God) স্থাপনের পথ পরিষ্কার করা, যাঁহারা আলোক ও সিদ্ধি চান (সাধুনাম্) তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করা, যাঁহারা অন্ধকারও পাপের রাজ্যকেই অটুট রাখিতে যুদ্ধ করিতেছে তাহাদিগকে পরাজিত করা। এই অবতারের আগমনের এই সকল উদ্দেশ্য লোকবিদিত। অবতারের কার্য্য দেখিয়াই সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিয়া থাকে এবং পূজা করিয়া থাকে। কেবল যাঁহারা আধ্যাত্মিক প্রকৃতিসম্পন্ন তাঁহারাই দেখিতে পান যে এই বাহ্যিক অবতার, এই মানবরূপ, ভিতরের

অনন্ত ভগবানের চিহ্ন মাত্র—সেই অনন্ত ভগবান তাঁহাদেরই ন্যায় মানব মন ও দেহের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন, যেন তাঁহারা সেই ভগবানের সহিত ঐক্যলাভ করিতে পারেন এবং ভাগবত-ভাবের দ্বারা অধিকৃত হইতে পারেন। বাহ্য মানবরূপে খ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের আবির্ভাব এবং আমাদের নিজের মধ্যে ভগবানের চিরন্তন অবতারের আবির্ভাব মূলে একই গূঢ় সত্য। পৃথিবীতে বাহ্য মানবজীবনে যাহা সংঘটিত হইয়াছে সকল মনুষ্যের ভিতরের জীবনে তাহা পুনরায় সংঘটিত হইতে পারে।

অবতারের উদ্দেশ্য ইহাই, কিন্তু অবতরণের প্রণালী কি? কেবল সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অবতার সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র ধারণা করা হয়, প্রথমে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই মতানুসারে, কোন মনুষ্যে দেবোচিত চরিত্র, বুদ্ধি ও শক্তির অসাধারণ প্রকাশ হইলে তাহাকেই অবতার বলা হয়। এইরূপ ধারণায় কতকটা সত্য আছে। যিনি অবতার তিনি বিভূতিও বটেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরতম ভাগবত সত্তায় মানবরূপী ভগবান, আবার তাঁহার বাহ্য মানবীয় সত্তায় তিনি সেই যুগের নেতা, বৃষ্ণিবংশের মহাপুরুষ। ইহা প্রকৃতির দিক হইতে, কিন্তু আত্মার দিক হইতে নহে। ভগবান তাঁহার প্রকৃতির অনন্ত গুণের (qualities) ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন, এবং এই সকল গুণের শক্তি ও কার্য্য দেখিয়া ভগবানের প্রকাশের তারতম্য বুঝা যায়। অতএব বিভূতি বলিতে যখন কোন ব্যক্তি না বুঝাইয়া, শুধু শক্তি বুঝায়—তখন

উহা তাহার কোন গুণের প্রকাশ, উহা জ্ঞান, তেজ, প্রেম, বল ইত্যাদি যে কোন রূপে ভগবানের বহিঃপ্রকাশ ; বিভূতি বলিতে যখন কোন ব্যক্তি বুঝায়, তখন যে প্রাণমনোময় আধারের ভিতর দিয়া ভগবানের শক্তি প্রকাশিত হয় এবং মহৎ কার্য্য সম্পাদন করে তাহাকেই বিভূতি বলা হয়।

ভিতরে এইরূপ অসাধারণ ভাগবত শক্তি এবং বাহিরে তাহার মহান্ কার্য্য—ইহাই বিভূতির চিহ্ন। ভাগবত কার্য্য সম্পাদনে মানবজাতির যিনি নেতা তিনিই মানব-বিভূতি, পাশ্চাত্য পণ্ডিত কার্লা'ইলের মতে তিনি বীর (hero), তিনি মানবরূপে ভগবানের একটা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ১০।৩৭

"আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় (অর্জ্জুন), আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং ঋষি-কবি-গণের মধ্যে উশনা কবি"—প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম, প্রত্যেক দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রত্যেকশ্রেণীর বিশিষ্ট গুণ ও কর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এইরূপে শক্তির উৎকর্ষ সাধন ভাগবত প্রকাশের পথে একান্ত প্রয়োজনীয়। যে কোন মহাপুরুষ শক্তিবলে সাধারণ মানবের উপরে উঠেন, তিনি তাহার দ্বারাই মানব-সাধারণকে উন্নত করেন ; আমাদের ভিতরে যে ভাগবতের সম্ভাবনা রহিয়াছে, আমাদের যে ভাগবতভাব লাভের আশা

রহিয়াছে সে বিষয়ে তিনি জীবন্ত দৃষ্টান্ত, তিনি ভাগবত জ্যোতিরই একটা কিরণ, ভাগবত শক্তিরই একটী কণা।

এইজন্যই মহৎ ও বীর পুরুষগণকে দেবতা বলিয়া ভাবিবার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক মানুষের মধ্যে আছে; ভারতবাসীর মনে এরূপ ধারণা সংস্কারগত ও স্বাভাবিক; তাহারা সকল মহৎ সাধু, গুরু ও ধর্ম্ম প্রচারককে সহজেই ভগবানের অংশ অবতার বলিয়া মনে করে; দক্ষিণ দেশীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের কোন কোন সাধু মহাপুরুষ বিষ্ণুর বিশেষ বিশেষ অস্ত্রশস্ত্রের অবতার,—ইহার গভীর মর্ম্মার্থ রহিয়াছে, কারণ সকল মহাপুরুষই মানবজাতিকে ভগবানের দিকে লইয়া যাইবার জীবন্ত যন্ত্র ও শক্তি। যে সকল আধ্যাত্মিক মতানুসারে ভাগবত সত্তা ও প্রকৃতি এবং মানবীয় সত্তা ও প্রকৃতি এই দুইএর মধ্যে কোন অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই,সেই সকল মতে উল্লিখিত ভাব স্বাভাবিক। ইহা মানবীয়তার মধ্যে ভাগবতের উপলব্ধি। তথাপি কিন্তু বিভূতি ও অবতার এক নহে; নতুবা অর্জ্জুন, ব্যাস, উশনা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মত অবতার হইতেন, কেবল হয়ত তাহাদের অবতারের ক্ষমতাই কিছু কম হইত। কেবল. ভাগবত গুণ বা শক্তি থাকিলেই হয় না; ভগবান স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া মানবীয় প্রকৃতিকে পরিচালনা করিতেছেন ভিতরে এই জ্ঞান থাকা চাই। স্বভাবের বশে সর্ব্বভূতেই গুণ সকলের শক্তির

উৎকর্ষ সাধন, গুণের বিকাশ ও উৎকর্ষ হইতেছে, "ভূতগ্রামে"রই অংশ সাধারণ মানবজীবনেও এই উৰ্দ্ধমুখী শক্তিবিকাশ দেখা যায়। কিন্তু অবতারে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব হয়, উপর হইতে দিব্য জন্ম হয়, সনাতন সর্ব্বগত ভগবান কোন বিশেষ মানবীয় রূপের মধ্যে নামিয়া আসেন, আত্মানম্ সৃজামি, এবং তখন কেবল যবনিকার অন্তরালেই যে ভগবান বলিয়া জ্ঞান থাকে তাহা নহে, বহিঃ প্রকৃতিও সেই জ্ঞানে পূর্ণ থাকে।

অবতার সম্বন্ধে মাঝামাঝি একটা মতবাদ আছে, ইহা সাধারণ বুদ্ধির কিছু উপরে একটা আধ্যাত্মিক মত; এই মতানুসারে কোন মানবীয় আত্মা নিজের মধ্যে ভগবানকে অবতীর্ণ করান এবং হয় ভাগবত চৈতন্য কর্তৃক অধিকৃত হ'ন অথবা ভাগবত চৈতন্যের সুযোগ্য আধার বা প্রতিচ্ছায়া হন। কতকগুলি আধ্যাত্মিক অনুভূতিলব্ধ সত্যের উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত।

মানব চৈতন্য বিকশিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে যখন ভাগবত চৈতন্যে পরিণত হয়, তখনই হয় মানুষে দিব্য জন্ম, ইহাই মানুষের উৰ্দ্ধগতি—ইহার চরমাবস্থায় ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে স্বতন্ত্র "আমিত্বে"র লয় হয়। আত্মা নিজের ব্যক্তিত্বকে এক অনন্ত বিশ্বব্যাপী সত্তায় ডুবাইয়া দেয়, অথবা আরও উপরে উঠিয়া এক প্রপঞ্চাতীত সত্তার উচ্চতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে; পরমাত্মার সহিত, ব্রহ্মের সহিত, ভগবানের সহিত আত্মা এক হয়, অথবা যেমন কেহ কেহ আরও চূড়ান্ত করিয়া

বলেন যে আত্মা ব্রহ্মই হইয়া যায়, ভগবান হইয়া যায়। গীতা বলিয়াছে বটে যে, আত্মা ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্মভূতঃ, এবং এইরূপে পরমেশ্বরের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বাস করে। কিন্তু গীতা কোথাও বলে নাই যে, আত্মা ভগবান বা পুরুষোত্তম হয়, যদিও গীতা বলিয়াছে যে, জীব স্বয়ং নিত্যই ঈশ্বর, ভগবানের অংশ, মমৈবাংশ। কারণ, এই শ্রেষ্ঠ মিলন, এই পরম পরিণতি উর্দ্ধগতিরই অঙ্গ ভিন্ন কিছুই নহে ; সত্য বটে যে প্রত্যেক জীব দিব্য জন্মলাভ করিতে পারে কিন্তু ইহা ভগবানের অবতরণ নহে, অবতার নহে—ইহা বড় জোর বৌদ্ধমতানুযায়ী বুদ্ধত্ব লাভ, আত্মার বর্ত্তমান জাগতিক ব্যক্তিত্ব হইতে উঠিয়া, এক অনন্ত পরাচৈতন্যে জাগ্রত হওয়া। ইহাতে অবতারের ন্যায় আভ্যন্তরীন জ্ঞান এবং অবতারোচিত বাহ্য কর্ম্ম যে থাকিবেই এমন কোন কথা নাই।

তবে এইরূপে ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ারূপে ভগবানও আমাদের সত্তার মানবীয় অংশে প্রবিষ্ট বা আবির্ভূত হইতে পারেন, নিজেকে মানুষের প্রকৃতি, কর্ম্ম, মন, এমন কি দেহের মধ্যেও ঢালিয়া দিতে পারেন ; এবং ইহাকে অন্ততঃ আংশিক অবতার বেশই বলা যাইতে পারে। গীতা বলিয়াছে যে, ঈশ্বর হৃদ্দেশে * বাস করেন, কিন্তু তথায় তিনি থাকেন যবনিকার অন্তরালে, যোগমায়াসমাবৃত।

* এই হৃদ্দেশ বলিতে অবশ্য সূক্ষ্মদেহের হৃদয়ই বুঝায়, তাহা সমস্ত চিত্তাবেগ অনুভূতি ও মানসিক চৈতন্যের গ্রন্থিস্থান (nodus), সেইখানে জীবপুরুষও অবস্থিত।

কিন্তু ইহার উপরে আরও এক স্থান আছে,তাহা আমাদের মধ্যেই অবস্থিত কিন্তু তাহা আমাদের সাধারণ চেতনার অতীত—প্রাচীনেরা ইহাকে স্বর্গ বলিতেন, সেখানে ঈশ্বর ও জীব উভয়ে মূলতঃ একই সত্তারূপে প্রকাশিত, কোথাও কোথাও রূপকচ্ছলে তাহাদিগকে পিতা ও পুত্র বলা হইয়াছে—ঈশ্বর পিতা এবং তাহা হইতে দিব্য মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ভগবানের উচ্চ ভাগবত প্রকৃতি (The Virgin Mother), পরা প্রকৃতি, পরা মায়া হইতে নীচের বা মানবীয় প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই খৃষ্টান অবতারবাদের ভিতরের তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়; খৃষ্টানদের ত্রিসত্তাবাদে (Trinity) পিতা এই আভ্যন্তরীন স্বর্গবাসী; পুত্র অথবা পরা প্রকৃতি গীতার মতানুযায়ী জীব হইয়া ভূতলে দিব্য মানবরূপে অবতীর্ণ; The Holy spirit হইতেছে শুদ্ধ আত্মা, ব্রহ্ম চৈতন্য—এই আত্মা বা চৈতন্যের দ্বারা পিতা ও পুত্র, ঈশ্বর ও জীব এক হন; এবং এই চৈতন্যের ভিতর দিয়া উভয়ের মধ্যে যোগ হয়; কারণ আমরা শুনি যে স্বর্গদূত যীশুর মধ্যে নামিয়া আসিলেন এবং এইরূপই অবতরণের ফলে যীশুর শিষ্যগণের মধ্যেও ঊর্দ্ধের চৈতন্যের ক্ষমতা সকল নামিয়া আসিল।

কিন্তু আরও ঊর্দ্ধে পুরুষোত্তমের যে দিব্য চৈতন্য তাহাও মানবের মধ্যে নামিয়া আসিতে পারে এবং জীব তাহাতে লয় হইতে পারে। চৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে, মাঝে মাঝে চৈতন্যের এইরূপ রূপান্তর হইত। তাঁহার সাধারণ

জীবনে তিনি ঈশ্বরের কেবলমাত্র প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মান্য করিতে দিতেন না; কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার দিব্য ভাবান্তর হইত, তিনি স্বয়ং ভগবান হইতেন এবং ভগবানের মত কথা কহিতেন, কর্ম্ম করিতেন, তখন তাঁহার মধ্যে ভাগবত জ্যোতি, ভাগবত প্রেম, ভাগবত শক্তি উছলিয়া পড়িত। এইরূপ অবস্থা যদি কাহারও সাধারণ অবস্থা হয়, মানবীয় আধারটি যদি কেবল সর্ব্বদা ভগবানের আবির্ভাব ও চৈতন্যের আধার মাত্র হয়, তাহা হইলে এই মাঝামাঝি মতানুসারে এই অবস্থাকেই অবতার বলা যাইতে পারে। এরূপ অবতার সম্ভব বলিয়া সহজেই মানুষের ধারণা হইতে পারে, কারণ মানুষ যদি তাহার প্রকৃতিকে এমনভাবে উন্নত করিতে পারে যে, ভগবানের সত্তার সহিত নিজের সত্তা এক বলিয়া অনুভূত হয়, নিজেকে ভগবানের চৈতন্য, জ্যোতি, শক্তি, প্রেমের আধার বলিয়া অনুভব হয়, নিজের ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বকে ভগবানের ইচ্ছা ও সত্তার মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে পারে (এরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্ভব বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে)—তাহা হইলে ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সেই ভাগবত ইচ্ছা, সত্ত্বা, শক্তি, প্রেম, জ্যোতি, চৈতন্য যে মানব জীবের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে অধিকার করিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব কিছুই নহে। এবং ইহা শুধু মানুষের দিব্য জন্মে ও দিব্য প্রকৃতিতে উঠা হইবে না, ইহা মানুষের মধ্যে দিব্য পুরুষের নামিয়া আসা হইবে, অবতার হইবে।

যাহা হউক কিন্তু গীতা আরও অনেক দূর গিয়াছে! গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন; শ্রীকৃষ্ণ নিজের বহু অতীত জন্মের কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, ভগবানকে শুধু ধারণ করিবার উপযুক্ত আধারসম্পন্ন মানবের জন্মের কথাই তিনি বলেন নাই, কিন্তু, ভগবানেরই বহু জন্মের কথা বলিয়াছেন। কারণ তিনি এখানে ঠিক সৃষ্টিকর্ত্তার ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছেন, পরে যখন জগৎসৃষ্টির কথা বলিবেন তখন তিনি এই ভাষারই প্রয়োগ করিবেন।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬

"আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বরস্বভাব এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও, স্বীয় প্রকৃতির কার্য্য অধ্যক্ষরূপে পরিচালনা করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা আমি নিজেকে সৃষ্টি করি।" এখানে ঈশ্বরও মানবজীবের কোন কথা নাই, স্বর্গীয় পিতা ও তাঁহার পুত্রের, দিব্য মানবের কোন কথা নাই, কিন্তু কেবল ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রকৃতির কথা আছে। ভগবান তাহার প্রকৃতির দ্বারা মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন, মানব দেহ মন ধারণ করিয়া নামিয়া আইসেন, এবং এই দেহ মনের মধ্যে ভাগবত চৈতন্য ও ভাগবত শক্তি লইয়া আইসেন, তবে তিনি মানবরূপ, মানবদেহ প্রাণ মনের ভিতর দিয়াই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন; তিনি অন্তরাত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই দেহমনের

সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করেন। অবশ্য সকল সময়ই তিনি উপর হইতে পরিচালনা করিয়া থাকেন, এইরূপে উপর হইতে সমগ্র প্রকৃতিকে এবং তাহার মধ্যে মানুষকেও পরিচালনা করিয়া থাকেন ; ভিতর হইতেও তিনি সর্ব্বদা গুপ্ত থাকিয়া সমগ্র প্রকৃতিকে ও মানুষকে পরিচালনা করিয়া থাকেন ; এখানে (অর্থাৎ, অবতারে) প্রভেদ হইতেছে এই যে তিনি গুপ্ত নহেন, প্রকাশ, প্রকৃতি এখানে সচেতন যে তাহার প্রভু স্বয়ং উপস্থিত এবং এখানে ভগবান স্বর্গ হইতে তাঁহার গোপন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন না কিন্তু সাক্ষাৎ ও প্রকাশ, ভাবে তাঁহার ইচ্ছার দ্বারা প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন। এবং এখানে মধ্যস্থরূপে একজন মানুষ থাকিবার কোন স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না ; কারণ এখানে জীবের প্রকৃতি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া নহে পরন্তু নিজের প্রকৃতিকে, স্বাম্ প্রকৃতিম্, অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বভূতেশ পরমেশ্বর মানব জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মানুষের সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে এরূপ মতে বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ; এবং ইহার কারণও অতি স্পষ্ট, কারণ অবতারের মানবীয়তা, অবতার যে মানুষ তাহা খুব স্পষ্ট ভাবেই লোকের চক্ষুতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অবতার সকল সময়েই ভাগবতভাব ও মানুষভাব, এই দুইভাব সমন্বিত ; ভগবান যখন মানবরূপে অবতীর্ণ হয়েন তখন তিনি মানবীয় প্রকৃতির সমস্ত বাহ্যিক অপূর্ণতা এবং অক্ষমতাও গ্রহণ করেন

এবং ইহাদিগকেই ভাগবত চৈতন্য এবং ভাগবত শক্তির উপলক্ষ্য, যন্ত্র, সহায় করিয়া তোলেন, দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের আধার করিয়া তোলেন। কিন্তু, এইরূপ হওয়াই অবশ্যম্ভাবী, নতুবা অবতারের আগমনের যে উদ্দেশ্য তাহা সম্পন্ন হয় না; কারণ ঐ উদ্দেশ্য ঠিক ইহাই দেখান যে মানবজন্ম ইহার সকল অপূর্ণতা সত্ত্বেও দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের সহায় ও যন্ত্র হইতে পারে, মানব চতন্য ভাগবত চৈতন্যের প্রকাশের মূলতঃ বিরোধী নহে, মানব চৈতন্যকে ভাগবত চৈতন্য প্রকাশের আধার করা যাইতে পারে। মানব চৈতন্যের ছাঁচের রূপান্তর সাধন করিয়া এবং ইহার জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে ভাগবত চৈতন্যের সদৃশ করিয়া তোলা যাইতে পারে; কেমন করিয়া ইহা সম্পাদন করা যইতে পারে তাহাও দেখান অবতারের উদ্দেশ্য। অবতার যদি কেবল অসাধারণ ভাবেই কার্য্য করেন, তাহা হইলে অবতারের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। কেবল অসাধারণ বা অপ্রাকৃত অবতার একটা অর্থহীন কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার। একেবারেই যে কোনরূপ অসাধারণ ক্রিয়া থাকিতে পাইবে না, এমন কোন কথা নাই (যীশু খ্রীষ্টের রোগ আরোগ্য করিবার এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া শুনা যায়), কারণ এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা মানুষেরই পক্ষে অসম্ভব কিছুই নহে, ইহা অবতারের মূল ব্যাপার নহে; আবার, অবতারের জীবন কেবল অসাধারণ শক্তির প্রদর্শন হইলেও চলিবে না। অবতার একজন আশ্চর্য্য-

কর্ম্মা বাজীকরের মত আসেন না, তিনি আসেন মানবজাতির দিব্য নেতা স্বরূপ, তিনি আসেন দিব্যমানবের আদর্শ স্বরূপ। এমন কি তাহাকে মানবোচিত দুঃখ এবং শারীরিক যন্ত্রণাও গ্রহণ করিতে হইবে এবং দেখাইতে হইবে, প্রথমতঃ, কেমন এই দুঃখ যন্ত্রণাকে মুক্তির সহায় করা যাইতে পারে (যীশু খ্রীষ্ট এইরূপ করিয়াছিলেন) দ্বিতীয়তঃ দেখাইতে হইবে যে কেমন করিয়া ভাগবতসত্তা মানবীয় প্রকৃতিতে এই দুঃখ যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াও মানবীয় প্রকৃতিতেই তাহা জয় করিতে পারে, বুদ্ধ এইরূপ করিয়াছিলেন। যে সকল তার্কিক খ্রীষ্টকে বলিয়াছিল—"যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহা হইলে ক্রশ হইতে নামিয়া আইস," অথবা, যাহারা বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া দেখাইয়া দেন যে অবতারেরা কখনও ভগবান হইতে পারে না কারণ তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং সে মরণ আবার রোগের দ্বারা হইয়াছে, যেমন কুকুর বিড়াল মরে—তাহারা অবতারের মূল উদ্দেশ্য কিছুই বুঝে নাই। দিব্য আনন্দের অবতার হইবার পূর্ব্বে, দুঃখও যন্ত্রণারও অবতার হইতেই হইবে। মানুষের অপূর্ণতা গ্রহণ করিয়াই দেখাইতে হইবে যে কেমন করিয়া তাহা অতিক্রম করা যায়; এবং এই অতিক্রম কতখানি হইবে এবং কি উপায়ে হইবে, কেবল আন্তরিক হইবে, না, বাহ্যিকও হইবে তাহা মানব-জাতির ক্রমোন্নতির অবস্থার উপরে নির্ভর করে; ইহা কোনও অমানুবিক অদ্ভুত ঘটনার দ্বারা সম্পাদন করা চলিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে ভগবান কিরূপে মানব দেহ ও মন গ্রহণ করেন? এই প্রশ্নটিই বাস্তবিক কঠিন, মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ইহার কোন কিনারা করিতে পারে না। কারণ, এই দেহ ও মন সহসা পূর্ণ ভাবে সৃষ্ট হয় নাই, এগুলি কোন প্রকার শারীরিক, মানসিক বা উভয়বিধ বিবর্ত্তনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এটা সত্য যে অবতারের আবির্ভাব মূলতঃ একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার—গীতার ভাষা হইতেই বুঝা যায় যে ইহা আত্মার জন্ম, আত্মানম্ সৃজামি; তথাপি ইহার সঙ্গে এখানে শারীরিক জন্মও রহিয়াছে। তাহা হইলে অবতারের এই মানবীয় দেহ ও মন কেমন করিয়া সৃষ্ট হয়? যদি আমরা ধরিয়া লই যে অচেতন প্রকৃতি এবং তাহাতে অনুস্যূত প্রাণশক্তির দ্বারা বংশানুক্রম বিবর্ত্তনের ফলেই শরীর সৃষ্ট হয়, জীবাত্মা ইহাতে কিছু করে না, তাহা হইলে ব্যাপারটা খুব সহজ হইয়া পড়ে। ভগবানের অবতারের যোগ্য শারীরিক ও মানসিক দেহ কোন উচ্চ বা পবিত্র বংশে উদ্ভূত হয়; অবতরণকালে ভগবান সেই দেহ অধিকার করেন। কিন্তু, গীতা যেখানে অবতারের কথা বলিয়াছে (চতুর্থ অধ্যায়, ৫-৮ শ্লোক) সেখানে অকুণ্ঠিত ভাবে অবতারের ও জন্মান্তরের কথা বলিয়াছে (৪।৫)। সাধারণ জন্মান্তরবাদ অনুসারে আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ কালে তাহার অতীত আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিবর্ত্তনের দ্বারা নিজেই নিজের শরীর ও মন ঠিক করিয়া লয়, একরকম প্রস্তুত করিয়াই লয়। আত্মাই

নিজের দেহ তৈয়ারী করিয়া লয়; আত্মার সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া তাহার দেহ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয় না। তাহা হইলে কি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে এক অনন্ত অবতার নিজেই ক্রম বিবর্ত্তনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ নিজের উপযুক্ত মানসিক ও শারীরিক দেহের বিকাশ করিয়া লয়েন, এই দেহ কোন যুগে কিরূপ হইবে তাহা সেই যুগের মানব-জাতির প্রয়োজন ও ক্রমোন্নতির অবস্থা অনুসারে নির্ণয় করেন এবং এইরূপেই কি তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন? এইরূপ কোন এক ভাবেই কেহ কেহ বিষ্ণুর দশাবতারের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—প্রথমে নানা পশু মূর্ত্তি, তাহার পর নরসিংহ মূর্ত্তি, তাহার পর বামন মূর্ত্তি, তাহার পর দুর্দ্ধর্ব আসুরিক মানব পরশুরাম, তাহার পর দেব প্রকৃতি মানব মহত্তর রাম, তাহার পর জ্ঞানসম্পন্ন আধ্যাত্মিক মানব বুদ্ধ, কাল হিসাবে বুদ্ধের পূর্ব্বে কিন্তু স্থান হিসাবে সর্ব্বোচ্চ হইতেছেন পূর্ণ দেবভাবাপন্ন মানব শ্রীকৃষ্ণ। কল্কি শ্রীকৃষ্ণের পরে হইলেও, তিনি শুধু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আরব্ধ কর্ম্মই সম্পন্ন করেন,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারেরা যে মহৎ কর্ম্মের সম্ভাবনা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন, কল্কি তাহাই কার্য্যতঃ সম্পন্ন করেন। বর্ত্তমান যুগের যেরূপ মনোভাব তাহাতে এই সকল বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন, কিন্তু গীতার ভাষা এইরূপই বুঝায় বলিয়া মনে হয়। তবে, গীতা যখন স্পষ্টভাবে এই সমস্যার সমাধান করে নাই, তখন আমরা আমাদের মনের মত যেমন হয় সমাধান করিতে

পারি; যথা, আমরা বলিতে পারি যে জীবই (জীবাত্মাই) শরীর প্রস্তুত করে কিন্তু জন্ম হইতেই ভগবান ঐ শরীর গ্রহণ করেন, অথবা গীতায় যে চারি মনুর (চত্বারঃ মনবঃ) কথা বলা হইয়াছে (ইহারা প্রত্যেক মানব মন ও শরীরের আধ্যাত্মিক পিতা) তাহাদের এক জনই অবতারের যোগ্য শরীর প্রস্তুত করিয়া দেন। কিন্তু এ সকল অধ্যাত্ম রহস্যের (mystic) কথা। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের লোক শুনিতে চায় না; কিন্তু, যখনই আমরা অবতারবাদ স্বীকার করিয়াছি তখনই আমরা অধ্যাত্ম জগতের কথাই তুলিয়াছি এবং একবার যখন এই কথা তোলা হইয়াছে তখন দৃঢ়তার সহিত ইহার আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

অবতার সম্বন্ধে গীতার মত কি তাহা বলা হইল। আমরা অবতারের সম্ভাবনা যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি * অবতরণের প্রণালীও সেইরূপ ভাবে আলোচনা করিলাম কারণ মানুষের বুদ্ধি এ সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি তুলিতে পারে তাহার হিসাব লওয়া এবং তাহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন। সত্য বটে যে গীতাতে বাহ্যিক অবতারের (physical avatar-hood) স্থান বেশী নহে, বাহ্যিক অবতার না ধরিলেও গীতা-শিক্ষার অর্থ বুঝিতে বিশেষ হানি হয় না। তথাপি গীতা-শিক্ষার ক্রমপরম্পরায় বাহ্যিক অবতার বাদের এক বিশিষ্ট স্থান আছে, গীতাশিক্ষার কাঠামোই এই—অবতার একজন শ্রেষ্ঠ

* পঞ্চদশ অধ্যায়

মনুষ্যকে, বিভূতিকে, দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। তবে, ইহাও সত্য যে মানবাত্মাকে নিজের মধ্যে তুলিয়া লইবার নিমিত্ত ভগবানের আভ্যন্তরীন অবতরণ, মানব অন্তঃকরণের মধ্যে অবতরণই প্রধান ব্যাপার—অন্তরের, ভিতরের খ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধ লইয়াই কথা। কিন্তু, যেমন আভ্যন্তরীন জীবন বিকাশের নিমিত্ত বাহ্যিক জীবনের সহায়তা সমধিক প্রয়োজনীয়, তেমনিই ভিতরে ভগবানের মহান্ প্রকাশের নিমিত্ত বাহ্যিক অবতারও কম প্রয়োজনীয় নহে। মানসিক ও শারীরিক রূপের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি বা অনুশীলনের দ্বারা আভ্যন্তরীন সত্য বস্তুর বিকাশে সহায়তা হয়; পরে এই আভ্যন্তরীন বস্তু, আরও শক্তির সহিত, নিজের আরও উৎকৃষ্ট রূপে বাহ্যজীবনের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপে বাহ্য মন ও শরীর আধ্যাত্মিক সত্তার উপর ক্রিয়া করে, আবার আধ্যাত্মিক সত্তা বাহ্য শরীর মনের উপর ক্রিয়া করে—এই দুইয়ের পরস্পরের উপর সতত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া মানুষের মধ্যে যুগে যুগে ভগবানের প্রকাশের লীলা চলিতেছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম

অবতারের জন্মের ন্যায় অবতারের কর্ম্মেরও দুই অর্থ এবং দুই রূপ আছে। ক্রমান্বয়ে উন্নতি অবনতির, উত্থান পতনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়মের বশে মানবজাতি কখনও উন্নতির দিকে, কখনও অবনতির দিকে পরিচালিত হইতেছে। প্রকৃতির এই নিয়ম সত্ত্বেও যে ধর্ম্ম মানবজাতির অবনতি প্রতিরোধ করিয়া মানুষকে ক্রমশঃ দেবত্বের দিকে লইয়া যায় সেই ধর্ম্মের গ্লানি দূর ও সংরক্ষণই অবতারের কর্ম্ম এবং ভাগবত শক্তি বাহ্য জগতের উপর ক্রিয়া করিয়া এই কর্ম্ম সম্পাদন করে,—ইহাই অবতারের কর্ম্মের বাহিরের দিক। অবতারের কর্ম্মের একটা ভিতরের দিকও আছে; ভাগবতমুখী চৈতন্যের দিব্যশক্তি ব্যক্তির আত্মার উপর ও জাতির আত্মার উপর ক্রিয়া করে এবং এইরূপে মানুষের মধ্যে ভাগবতের নব নব প্রকাশ হয় এবং মানুষের ঊর্দ্ধমুখী আত্ম-বিকাশের বিশেষ সুবিধা ও সহায়তা হয়। সাধারণ কর্ম্মপ্রবণ মানুষ স্বভাবতঃই মনে করে যে কেবল বাহ্যজগতে একটা মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্তই অবতারের আবির্ভাব হয়, কিন্তু

বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ধারণা ঠিক নহে। বাহ্যিক কর্ম্ম এবং ঘটনার নিজস্ব কোন মূল্য নাই, তাহাদের পশ্চাতে যে শক্তি ও ভাব থাকে তাহা হইতেই তাহাদের মূল্য।

যে সন্ধিক্ষণে অবতারের আবির্ভাব হয়, তাহা বাহ্য ঘটনার এবং জড় জগতে মহাপরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণ বলিয়াই বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যখন মানবজাতির চৈতন্যের কোন মহাপরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে হয় এবং কোন নূতন বিকাশ সম্পন্ন করিতে হয়, চৈতন্যজগতের সেই সন্ধিক্ষণেই অবতারের আবির্ভাব হয়। এই পরিবর্ত্তন সাধনের নিমিত্ত একটা দিব্যশক্তির প্রয়োজন; কিন্তু এই শক্তিতে চৈতন্যের প্রকাশ যত বড় থাকে ইহার কাজও তত বড় হয়। এই জন্যই মানবীয় মন ও আত্মার মধ্যে ভাগবত চৈতন্যের আবির্ভাব আবশ্যক। তবে, যখন প্রধানতঃ কেবল মানসিক ও ব্যবহারিক জগতের পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে হয়, তখন অবতারের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হয় না; তখন চৈতন্যের খুব উন্নতি হয়, শক্তির মহাপ্রকাশে মানুষ তৎকালের নিমিত্ত তাহাদের সাধারণ স্তর হইতে উর্দ্ধে উঠে; এবং চৈতন্য শক্তির এই অভ্যুদায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে উচ্চসীমায় উঠে; ইহারাই বিভূতি এবং কেবল ইহাদের নেতৃত্বের দ্বারাই উল্লিখিত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। ইউরোপে রিফর্মেশন (Reformation) এবং ফরাসী বিপ্লব (French Revolution) এইরূপ পরিবর্ত্তন; এগুলি মহান্ আধ্যাত্মিক ঘটনা নহে, এগুলি কেবল বুদ্ধি ও

কর্ম্মজগতের পরিবর্ত্তন—একটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় চলিত ভাব ও ধারণা প্রভৃতির পরিবর্ত্তন, অপরটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাব ও আদর্শের পরিবর্ত্তন; ইহাদের ফলে চৈতন্যজগতে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা মানসিক ও ব্যবহারিক পরিবর্ত্তন কিন্তু আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন নহে। কিন্তু, যখন আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া যুগান্তর আনয়ন করা উদ্দেশ্য হয় তখন ইহার উদ্ভাবক বা নেতারূপে মানবীয় মন ও আত্মার মধ্যে ঐশ্বরিক চৈতন্যের পূর্ণ বা আংশিক আবির্ভাব হয়। তাঁহাই অবতার।

গীতায় অবতারের বাহ্যিক উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়; যুগে যুগে যখন ধর্ম্ম মলিন হয়, অবসন্ন হয়, হীনবল হয়, অধর্ম্ম সবল ও অত্যাচারী হইয়া মাথা তুলিয়া উঠে তখন অবতার আবির্ভূত হন এবং ধর্ম্মকে পুনরায় প্রবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; এবং যেহেতু তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম মানুষের ভিতর দিয়াই মূর্ত্তি গ্রহণ করে, তজ্জন্য অবতারের লৌকিক ও বাহ্যিক উদ্দেশ্য হয় অধর্ম্মের পীড়নে অভিভূত সাধুগণকে পরিত্রাণ করা এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সহায়ক দুষ্কর্ম্মকারীদিগকে বিনাশ করা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৪।৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৪।৮

কিন্তু এখানে গীতা যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছে সহজেই

তাহার এমন সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যাহাতে অবতারত্বের গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম শব্দটির একটি নৈতিক অর্থ আছে, একটি দার্শনিক অর্থ আছে এবং একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে—এই সকল অর্থের যে কোন একটি লইয়া এবং অপরগুলি অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্ম শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে, ধর্ম্ম কেবল নৈতিক (ethical) অর্থে অথবা কেবল দার্শনিক (philosophical) অর্থে অথবা কেবল আধ্যাত্মিক (religious) অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ধর্ম্ম শব্দের নৈতিক অর্থ হইতেছে সৎকর্ম্মের নীতি, ন্যায্য আচরণের বিধান অথবা আরও বাহ্যিক ও ব্যবহারিক অর্থে ধর্ম্মের নৈতিক অর্থ হইতেছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়ের বিধান; অথবা আরও সংক্ষেপে এই অর্থে ধর্ম্ম হইতেছে কেবল সমাজের অনুশাসন পালন। ধর্ম্মের এই অর্থ গ্রহণ করিলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে যখন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সজ্জনগণকে রক্ষা করিতে এবং অসজ্জনগণকে বিনাশ করিতে, অন্যায় অত্যাচার ধ্বংস করিয়া মানবসমাজে ন্যায় ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা করিতে অবতার আবির্ভূত হন।

এইরূপে পুরাণে কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন বর্ণনা করা হইয়াছে—কুরুদের অসৎকর্ম্মের ভার পৃথিবীর পক্ষে এত দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িয়াছিল যে পৃথিবী তাহার ভারের লাঘব করিতে ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিয়াছিল, তাই বিষ্ণু

কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, অত্যাচারিত পাণ্ডবগণকে উদ্ধার করেন এবং দুষ্কর্ম্মী কৌরবগণের বিনাশ সাধন করেন। বিষ্ণুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের প্রয়োজনও এইভাবেই বর্ণিত হইয়াছে—রাবণের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে রাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়গণের অন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দৈত্য বলীর প্রভাব ধ্বংস করিতে বামন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু, এইরূপে কেবল নৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধিই অবতারের উদ্দেশ্য বলিয়া পুরাণাদিতে যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে অবতার ব্যাপারের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় নাই, ইহা সহজেই বুঝা যায়। এরূপ বর্ণনায় অবতারের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কথা ধরা হয় নাই, এবং এইরূপ বাহ্য প্রয়োজনই যদি সব হইত তাহা হইলে খৃষ্ট ও বুদ্ধকে অবতারের পর্য্যায় হইতে বাদ দিতে হইত, কারণ সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধু-গণের বিনাশ মোটেই তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, তাঁহারা আনিয়াছিলেন সকল মানবের জন্য এক নূতন আধ্যাত্মিক বাণী, দিব্য জীবন লাভের এক অভিনব ধর্ম্ম। আবার অন্য পক্ষে যদি আমরা ধর্ম্ম শব্দের শুধু আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করি, ধর্ম্ম বলিতে কেবল আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মজীবনের নীতি মাত্র বুঝি, তাহা হইলে আমরা অবতার ব্যাপারের মূল সত্যটি ধরি বটে, কিন্তু অবতারের কর্ম্মের একটা বিশেষ আবশ্যকীয় দিক বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। ভগবানের অবতারের

ইতিহাসে সকল সময়েই আমরা দুই প্রকারের কর্ম্ম দেখিতে পাই এবং এইরূপই হইবার কথা কারণ অবতার জগতের মধ্যে ভগবানের কার্য্যেরই ভার গ্রহণ করেন, জগতে ভগবানের ইচ্ছা ও জ্ঞান যে ভাবে কার্য্য করে অবতারও সেই ভাবে কর্ম্ম করেন এবং এই কার্য্যের সর্ব্বদাই দুইটা দিক, একটি হইতেছে অন্তর্জগতে আত্মার উন্নতি সাধন, অপরটি হইতেছে মানবসমাজের, মানবজীবনের বাহ্য পরিবর্ত্তন সংসাধন।

কোন মহান্ আধ্যাত্মিক গুরু ও ত্রাণকর্ত্তারূপে, খৃষ্ট বা বুদ্ধরূপে অবতার আবির্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক প্রকাশ কাল শেষ হইবার পরে তাঁহার কর্ম্মের ফলে মানবজাতির কেবল নৈতিক জীবনে নহে, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনও আদর্শের গভীর পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। আবার অন্য পক্ষে তিনি দিব্য জীবন, দিব্য ব্যক্তিত্ব, দিব্য শক্তি লইয়া রাম বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বাহ্যতঃ সামাজিক, বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন; কিন্তু এরূপ অবতারের ফল সকল সময়েই মানবজাতির আভ্যন্তরীন জীবন গঠন ও দিব্য জন্মলাভে চিরস্থায়ী ভাবে সহায়তা করিয়া থাকে। বড়ই রহস্যের কথা যে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের স্থায়ী, ঐকান্তিক, ব্যাপক ফল হইয়াছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, এমন কি যে সকল যুগ ও দেশ এই দুই ধর্ম্মের তত্ত্বকথা, সাধনা ও অনুষ্ঠান বর্জ্জন করিয়াছে তাহারাও ইহাদের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের

প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। বুদ্ধ, বুদ্ধের সঙ্ঘ এবং বুদ্ধের ধর্ম্ম পরবর্ত্তী হিন্দুধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বটে কিন্তু হিন্দুর জীবনে, হিন্দুর ধ্যানধারণায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের প্রভাব যে ছাপ মারিয়া দিয়াছে তাহা কখনও মুছিবার নহে; বর্ত্তমান ইউরোপ নামে খ্রীষ্টান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ সমূহ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল হইতে উদ্ভূত, তাঁহাদের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ খ্রীষ্ট প্রচারিত আধ্যাত্মিক সত্যেরই সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ মাত্র। অন্যদিকে রাম ও শ্রীকৃষ্ণের যুগের কোন ইতিহাস নাই, কেবল কাব্য পুরাণের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাদের কার্য্যাবলীর পরিচয় পাই এবং এই সকলকে আমরা কাল্পনিক বলিয়াও ধরিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের জীবনকে আমরা কাল্পনিক বলিয়াই ধরি অথবা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই গ্রহণ করি তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ ব্যক্তির ও জাতির আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁহাদের দিব্য আদর্শের প্রভাব চিরস্থায়ী হইয়াই রহিয়াছে। অবতার দিব্য জীবন ও চৈতন্যের ব্যাপার, কোন বাহ্য কর্ম্ম সম্পাদনেই ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু এই কর্ম্ম শেষ হইবার পরও, আধ্যাত্মিক জীবনে ইহার প্রভাব বরাবর থাকিবেই; আবার, ইহার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইতে পারে, কোন নূতন ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া, আধ্যাত্মিক সাধনা

প্রচার করিয়া। কিন্তু এই নূতন শিক্ষা বা সাধনার উপযোগিতা যখন শেষ হইয়া যাইবে তখনও মানবজাতির চিন্তা, স্বভাব ও বাহ্যজীবনে ইহার চিরস্থায়ী প্রভাব থাকিবেই।

অতএব অবতারের কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার মত বুঝিতে হইলে ধর্ম্ম শব্দের সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ, গভীর এবং ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, যে বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ নিয়মের দ্বারা ভগবান মানবজাতির আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করেন তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভারতে ধর্ম্ম বলিতে কেবল সদসৎ কর্ম্মের নীতি, ন্যায় অন্যায়ের বিধান বা নৈতিক অনুশাসন বুঝায় না; বাহ্য ও অন্তর্জগতে নানা রূপ, নানা কর্ম্ম, নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ভগবানের ইচ্ছা সাধিত ও বিকশিত হইতেছে—ইহার জন্য মানুষের সহিত ভগবানের, জগতের ও অন্যান্য জীবের সকল প্রকার সম্বন্ধ যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সমগ্র অনুশাসনই ধর্ম্ম। আমরা যাহাকে ধরিয়া থাকি এবং যাহা আমাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলীকে ধরিয়া রাখে—এই দুইই ধর্ম্ম *। ধর্ম্ম শব্দের প্রাথমিক অর্থ আমাদের প্রকৃতির মূল নীতিকে বুঝায়, ইহা অলক্ষ্যে আমাদের সমস্ত কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে এবং এই অর্থে প্রত্যেক বস্তু, শ্রেণী, জাতি, ব্যক্তি বা সঙ্ঘের স্ব স্ব ধর্ম্ম আছে। আবার, আমাদের মধ্যে ভাগবত প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইবে; যে সকল আভ্যন্তরীন ক্রিয়ার দ্বারা সেই ভাগবত প্রকৃতি আমাদের

* ধৃ ধাতু হইতে "ধর্ম্ম" শব্দের উৎপত্তি এবং ইহার অর্থ "ধরা"।

সত্তায় বিকশিত হইয়া উঠে সেই সকল ক্রিয়ার নীতিকেও ধর্ম্ম বলা যায় এবং ইহাই ধর্ম্ম শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। আবার নিজেদিগকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে সুষ্ঠুভাবে ভাগবত আদর্শের দিকে অগ্রসর করাইবার জন্য আমাদের বহির্মুখী চিন্তা ও কর্ম্ম এবং আমাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করি, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা যায়, ইহাই ধর্ম্ম শব্দের তৃতীয় অর্থ।

ধর্ম্মকে সাধারণতঃ সনাতন ও অপরিবর্ত্তনশীল বলা হয়; ধর্ম্মের মূল নীতি, আদর্শ এইরূপই বটে, কিন্তু ইহার আকারের পরিবর্ত্তন ও বিকাশ সকল সময়েই চলিতেছে, কারণ মানুষ এখনও সেই সনাতন অক্ষর আদর্শে পৌছিতে পারে নাই বা এখনও তাহার মধ্যে বাস করে নাই, কিন্তু সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছে, তাহাকে জানিবার জন্য এবং জীবনে তাহা সাধন করিবার জন্য ক্রমশঃ তৈয়ারী হইয়া উঠিতেছে। এই পথে যাহা কিছু আমাদিগকে দিব্য পবিত্রতা, উদারতা, জ্ঞান, স্বাধীনতা, তেজ, শক্তি, আনন্দ, প্রেম, শুভ, ঐক্য ও সৌন্দর্য্যে বাড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে সেই সবই ধর্ম্ম, এবং যাহা কিছু ইহার বিরুদ্ধ, ইহার প্রতিবন্ধক তাহাই অধর্ম্ম, তাহা আমাদের মধ্যে অপবিত্রতা, সঙ্কীর্ণতা, বন্ধন, অজ্ঞান, দুর্ব্বলতা, নীচতা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ, অনৈক্যের বৃদ্ধি করে; উন্নতির পথে মানুষকে এই সবই ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এই অধর্ম্ম ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, ধর্ম্মকে পরাভূত করিতে চায়, আমাদিগকে

পিছনের দিকে, নীচের দিকে টানে,—অশুভ, অজ্ঞান ও অন্ধকারের দিকে লইয়া যাইতে চায়। এই দুইয়ের মধ্যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলিতেছে; কখনও ধর্ম্মের শক্তির জয় হইতেছে কখনও অধর্ম্মের শক্তির জয় হইতেছে। বেদে ইহা দেবাসুরসংগ্রামের রূপকের ভিতর দিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই জোরোয়াষ্ট্রীয়ান (Zoroastrianism) ধর্ম্মে আহুরমাজ্‌দা ও অর্হিমানের সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই পরবর্ত্তী ধর্ম্মসমূহে মানবজীবন ও মানবাত্মাকে অধিকার করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর ও সয়তান বা ইব্‌লিসের সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সবের দ্বারাই অবতারের কর্ম্ম নির্ণীত হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিধান মত সাধক তাহার মুক্তিপথের বিরোধী ব্যাপার সমূহ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধ এই তিন শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মের বিধানেও আমরা খ্রীষ্টানুযায়ী জীবন যাপনের ধর্ম্ম, চার্চ্চ (church) এবং খ্রীষ্ট এই তিনটি দেখিতে পাই। এই তিন প্রকরণ সকল অবতারেরই কর্ম্মের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তিনি একটি ধর্ম্ম দেখাইয়া দেন, সাধনার এক ধারা দেখাইয়া দেন—তাহার সাহায্যে নীচের জীবন হইতে উচ্চজীবন লাভ করা যায়; কর্ম্ম সম্বন্ধে বিধি এবং অন্যান্য মনুষ্য ও জীবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ এই ধর্ম্মেরই অঙ্গ; অষ্টাঙ্গমার্গে সাধনা অথবা বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতার নীতি অথবা এইরূপ অন্য

কোন ভাবে জীবনে ভাগবত ভাবের প্রকাশ এই ধর্ম্মের অঙ্গ। তাহার পর তিনি (অবতার) সঙ্ঘের স্থাপনা করেন, তাঁহাকে কেন্দ্ররূপে আশ্রয় করিয়া ও তাঁহার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যাহারা একত্রিত হয় তাহাদের মধ্যে সখ্য ও একতা স্থাপন করেন, কারণ মানুষের সকল চেষ্টারই যেমন একটা ব্যষ্টির দিক আছে তেমনই একটা সমষ্টির দিকও আছে এবং যাহারা একই পথের অনুসরণ করে তাহারা স্বভাবতঃই পরস্পরের সহিত আধ্যাত্মিক সাহচর্য্য ও একতায় বদ্ধ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব ধর্ম্মেও এই তিন আছে, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান,—বৈষ্ণব মতানুযায়ী ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম্মই ভাগবত, যাহাদের মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের সঙ্ঘই ভক্ত, যাহাতে এই ভাগবৎ প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ পরিণতি সেই পরম প্রেমাস্পদই, ভগবান। অবতার এই তৃতীয়টির প্রতিনিধি, অবতারই সেই দিব্যপুরুষ ও সত্তা যিনি সঙ্ঘ ও ধর্ম্মের প্রাণ, ইনি নিজের আলোকে সঙ্ঘ ও ধর্ম্মকে আলোকিত করেন, জীবিত রাখেন এবং মনুষ্যগণকে আনন্দ ও মুক্তির দিকে লইয়া যান।

গীতা এই তিনটিরই আরও উদার ও ব্যাপক * অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। কারণ গীতায় যে ঐক্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা বেদান্তমতানুযায়ী সর্ব্বগত ঐক্য—তাহার দ্বারা আত্মা

* বাস্তবিক পক্ষে গীতার শিক্ষা অন্যান্য ধর্ম্মের শিক্ষা অপেক্ষা উদার ও ব্যাপক।

নিজেকে সর্ব্বভূতে এবং নিজের মধ্যেই সর্ব্বভূতকে দেখে এবং সকলের সহিত নিজেকে এক করিয়া লয়।

অতএব, মানুষের সকল প্রকার সম্বন্ধকে লইয়া উচ্চ ভাগবত-ভাবের মধ্যে উত্তোলন করাই এখানে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝায়; প্রচলিত সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মমতকে ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা আলোকিত করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে; এই ধর্ম্মের নীতি হইতেছে ঐক্য, সাম্য, ঈশ্বর প্রণোদিত মুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম, দিব্য আত্মজ্ঞান, ভাগবতজ্ঞান এবং সকল জ্ঞান ও কর্ম্মের চরম পরিণতি ভাগবত প্রেম। প্রেম ও ভক্তির দ্বারা ভগবান লাভের সাধনার কথা গীতা যেখানে বলিয়াছে, সেইখানেই ভাগবত ভক্তদের সখ্যতা ও পরস্পরকে ভগবান লাভে সহায়তার কথাও উঠিয়াছে এবং ইহাই সঙ্ঘের ভিত্তি; কিন্তু, গীতার শিক্ষা অনুসারে প্রকৃত সঙ্ঘ হইতেছে সমগ্র মানবজাতি। সমগ্র জগত এই ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাহার যেমন ক্ষমতা সে সেই ভাবেই চলিতেছে—

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ";

সাধক সকলের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিতে, তাহাদের সুখ দুঃখ, তাহাদের সমগ্র জীবন নিজের করিয়া লইতে সাধনা করেন; যে মুক্ত পুরুষ সর্ব্বভূতের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি সকল মানবজাতির কল্যাণের জন্যই কর্ম্ম করেন, সর্ব্বভূতে যে ঈশ্বর রহিয়াছেন তাঁহার সেবা করেন, লোকসংগ্রহের নিমিত্ত, সকলকে স্বধর্ম্মে উ

ভাগবত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, সকলকে ক্রমশঃ ভগবানের অভিমুখে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কর্ম্ম করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণই অবতার কিন্তু তিনি এই অবতারের উপরেই সব ঝোঁক দেন নাই, কিন্তু এই অবতার যাঁহার প্রতিনিধি সেই পুরুষোত্তমের উপরেই ঝোঁক দিয়াছেন, সকল অবতার এই পুরুষোত্তমেরই নরজন্ম, মানুষ যে সকল নাম ও রূপের পূজা করিয়া থাকে সে সব এই পুরুষোত্তমেরই প্রতিমা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে পন্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাঁর দ্বারাই মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে পারে, এই কথা বলা হইয়াছে বটে কিন্তু এই পন্থা অন্যান্য পন্থা হইতে স্বতন্ত্র নহে, অন্যান্য সকল পন্থাই ইহার অন্তর্গত। ভগবান তাঁহার অনন্ত সত্তার মধ্যে সকল অবতার, সকল শিক্ষা, সকল ধর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন।

এই জগত্ এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধ দুই প্রকারের, ভিতরের যুদ্ধ ও বাহিরের যুদ্ধ; গীতা এই দুই প্রকার যুদ্ধের উপরেই ঝোঁক দিয়াছে। ভিতরের যুদ্ধে মানুষকে, ব্যক্তিকে, তাহার ভিতরের শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয় এবং বাসনা, অজ্ঞান, অহঙ্কারকে বধ করিতে পারিলেই এই যুদ্ধে জয় হয়। কিন্তু, মানব সমাজে একটা বাহিরের যুদ্ধও আছে, এখানে ধর্ম্মপক্ষ ও অধর্ম্মপক্ষ এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলে। মানুষের মধ্যে যে ভাগবত ভাব, ভাগবত প্রকৃতি আছে এবং যে সকল মনুষ্য এই ভাব ও প্রকৃতির অধিকারী বা সাধক, এই সব

ধর্ম্মপক্ষের সহায় হয় এবং দুর্দ্ধর্ষ অহঙ্কারপূর্ণ আসুরিক ও রাক্ষসিক প্রকৃতি ও এইরূপ প্রকৃতির মনুষ্য সকল অধর্ম্ম পক্ষের সহায় হয়। এই সংগ্রামের রূপক স্বরূপ দেবাসুরের যুদ্ধের কথায় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য পরিপূর্ণ; মহাভারতের যে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্র স্বরূপ তাহাও এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধেরই ছবি বলিয়া প্রায়ই বর্ণিত হইয়া থাকে; পাণ্ডবেরা দেবতার সন্তান, নররূপে দেবশক্তি, তাহারা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করিতেছে এবং তাহাদের প্রতিদ্বন্দীরা দানবীয় শক্তির অবতার অসুর। এই বাহিরের যুদ্ধেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করিতে, দুষ্কৃত অসুরগণের প্রভুত্ব ধ্বংস করিয়া এবং অধর্ম্মের শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অবতার আবির্ভূত হন। যেমন ব্যক্তিগত মানবাত্মার মধ্যে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে, তেমনিই বাহ্য জগতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে, সমগ্র মানবজাতিকে স্বর্গ-রাজ্যের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিতে অবতার আগমন করেন।

অবতারের আগমনের নিগূঢ় ফল তাহারা লাভ করে যাহারা ইহা হইতে দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে, যাহাদের চিত্ত তাঁহার চিন্তাতেই পূর্ণ হয়, যাহারা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ, যাহারা জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এবং নিম্ন প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি লাভ করে, মদ্‌ভাবমাগতাঃ।

অবতার আসিয়া দেখাইয়া দেন যে মানুষের এই নীচের প্রকৃতির উপর দিব্য প্রকৃতি মানুষের মধ্যেই রহিয়াছে, অবতার আসিয়া দেখাইয়া দেন যে দিব্য কর্ম্মের স্বরূপ কি—এরূপ কর্ম্ম মুক্ত, নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ—ভাগবত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি দিব্য পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন যেন তাঁহার দিব্য চরিত্রে মানুষের চিত্ত মন ভরিয়া উঠে এবং তাঁহার সঙ্কীর্ণ অহমিকা দূর হইয়া যায়, যেন এইরূপে সে ক্ষুদ্র অহং হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত ও বিরাট সত্তায় উঠিতে পারে, মৃত্যুসংসার হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃতত্বে পৌঁছিতে পারে। তিনি ভাগবত শক্তি ও প্রেমরূপে অবতীর্ণ হন, এই মূর্ত্তিমন্ত শক্তি ও প্রেম মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে যেন তাহারা সেই দিব্যশক্তি ও প্রেমেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, যেন মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া, বাসনা লইয়া, কামক্রোধাদির দ্বন্দ্ব লইয়াই পড়িয়া না থাকে, এই সব দুঃখ ও অশান্তি হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ যেন দিব্য শান্তি ও দিব্য আনন্দের মধ্যে বাস করিতে পারে *। ভগবান কি নাম বা রূপ লইয়া, ভাগবতের কোন ভাবে ভর করিয়া অবতীর্ণ হন তাহাতেও বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; কারণ মানুষ আপন, আপন স্বভাবানুসারে ভগবান কর্ত্তৃক

---

* জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৪।৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥৪।১০

নির্দ্দিষ্ট পথই অনুসরণ করিতেছে, সেই পথই শেষকালে তাহাদিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাইবে; তিনি যখন তাহাদিগকে পথ দেখাইতে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার যে ভাব তাহাদের স্বভাবের অনুযায়ী সেই ভাবের অনুসরণই তাহাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট; মানুষ যে ভাবে ভগবানকে গ্রহণ করে, ভালবাসে, উপভোগ করে, ভগবানও সেই ভাবে মানুষকে গ্রহণ করেন, ভালবাসেন, উপভোগ করেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

অষ্টাদশ অধ্যায়

দিব্য কর্ম্মী

তাহা হইলে দিব্য জন্ম (এক বৃহত্তর চেতনায় অভিনব দেবজন্ম লাভ) লাভ করা এবং দিব্য জন্মলাভের পূর্ব্বে ইহার উপায়স্বরূপ ও পরে ইহার অভিব্যক্তি স্বরূপ দিব্য কর্ম্ম করা—ইহাই গীতা কথিত কর্ম্মযোগের সব। গীতা কর্ম্মের এমন কোন বাহ্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করে নাই, যাহা বাহ্যদৃষ্টিতেই চিনিতে পারা যায়, সংসারের প্রচলিত সমালোচনায় যাহার বিচার করিতে পারা যায়; এমন কি মানুষ সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে যে পাপপুণ্যের প্রভেদ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে চায় গীতা বুঝিয়া সুজিয়াই সে সব প্রভেদ পরিত্যাগ করিয়াছে। গীতা দিব্যকর্ম্মের যে সব লক্ষণ দিয়াছে সে সব অতিশয় গূঢ় ও আভ্যন্তরীণ; যে চিহ্নের দ্বারা দিব্য কর্ম্ম চেনা যায় তাহা অদৃশ্য, আধ্যাত্মিক—সাধারণ ভালমন্দ, পাপপুণ্য বিচারের অতীত।

আত্মা হইতেই দিব্যকর্ম্ম সকল উদ্ভূত হয় এবং কেবল সেই আত্মার আলোকেই তাহাদিগকে চেনা যাইতে পারে। গীতায় বলা হইয়াছে, "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র

মোহিতাঃ," "কোনটি কর্ম্ম, কোনটিই বা অকর্ম্ম, এ বিষয়ে জ্ঞানিগণও মোহিত ও ভ্রান্ত হন," কারণ তাঁহারা সাধারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায়, জ্ঞানবুদ্ধির মানদণ্ড লইয়া বিচার করেন বলিয়া, বাহ্যদিকটা লইয়াই ভেদাভেদ করেন কিন্তু এ বিষয়ের যাহা মূলতত্ত্ব তাহার কোনও সন্ধান পান না।

তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।
কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ ॥৪।১৬।১৭

—"আমি তোমাকে সেই কর্ম্মের কথা বলিব, যাহা জানিলে তুমি সমস্ত অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। কর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, অন্যায় কর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, অকর্ম্ম বা নিষ্ক্রিয়তা কি তাহাও বুঝিতে হইবে। এ সংসারে কর্ম্ম গভীর অরণ্যের মত, গহন। প্রচলিত ভাব, নীতি ও আদর্শের আলোকে মানুষ হোঁচট খাইতে খাইতে কোন রকমে এই গহন অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে; এই সকল নীতি ও আদর্শ বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন সমাজের ভাব ও আদর্শের মিশ্রণের ফল, এই সবকে লোকে অক্ষর ও সনাতন বলে বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহারা দেশকালানুগতিক এবং অনিত্য; এই সকল নীতি ও আদর্শের ভিত্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া দেখাইবার নানারূপ চেষ্টা করা হয় বটে কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে ইহারা ব্যবহারিক ও অজ্ঞানপ্রসূত। জ্ঞানী-ব্যক্তি এই সকল ভাব ও আদর্শের ভিত্তি স্বরূপ কোন

সনাতন সত্য ও নীতির সন্ধান করিতে করিতে শেষে চরম প্রশ্ন তুলিতে বাধ্য হন—সমস্ত কর্ম্ম ও সংসারই কি মিথ্যা, মায়ার ফাঁদ নহে? সমস্ত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া, অকর্ম্ম; ইহাই কি ক্লান্ত, জ্ঞানপ্রাপ্ত মানবাত্মার শেষ আশ্রয়স্থল নহে? কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যে এ বিষয়ে জ্ঞানীদেরও বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। কারণ, নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা নহে, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানলাভ করা যায়, মুক্তিলাভ করা যায়।

তাহা হইলে এ সমস্যার মীমাংসা কি? কোন প্রকারের কর্ম্ম করিলে আমরা এই জীবনের অশুভ সমূহ হইতে মুক্তি পাইব, এই সংশয়, এই ভ্রম, এই শোক হইতে মুক্তি পাইব, আমাদের খাঁটি মহদুদ্দেশ্যোপ্রণোদিত কার্য্যেরও কুফল হইতে, ব্যর্থতা হইতে মুক্তি পাইব, এইরূপ অসংখ্য প্রকারের অশুভ ও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইব? ইহার উত্তর এই যে, কোনরূপ বাহ্যিক ভেদ করিবার আবশ্যক নাই, সংসারের প্রয়োজনীয় কোন কর্ম্মই বর্জ্জন করিবার আবশ্যক নাই; বরং সকল কর্ম্মই করা কর্ত্তব্য, তবে ভগবানের সহিত আত্মাকে যুক্ত রাখিয়াই সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। অকর্ম্ম, অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা পন্থা নহে; যে ব্যক্তি উচ্চতম বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তিনি বুঝেন যে এরূপ অকর্ম্মের অবস্থায় বাস্তবিক পক্ষে অনবরত কার্য্য চলিতে থাকে, এই অবস্থা প্রকৃতি এবং প্রকৃতির গুণাবলীর ক্রিয়ার অধীন। যে ব্যক্তি মুক্তিলাভের জন্য

শারীরিক কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে চায়, তাহার এখনও ভ্রম আছে যে সেই বুঝি কর্ম্ম করে, প্রকৃতি নহে; সে জড়তাকে মুক্তি বলিয়া ভুল করে; সে জানে না যে, যে অবস্থা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হয়, যেখানে ইঁট পাথর অপেক্ষাও অধিক জড়তা, সেখানেও প্রকৃতির ক্রিয়া অবাধে চলিতেছে। আবার অন্যদিকে পূর্ণ কর্ম্মস্রোতের মধ্যেও আত্মা সকল প্রকার কর্ম্ম হইতে মুক্ত, কর্ত্তা নহে, কোন কৃতকর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ নহে। যে ব্যক্তি আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বাস করে, প্রকৃতির গুণের অধীনতায় বাস করে না, কেবল মাত্র সেই ব্যক্তিই কর্ম্ম হইতে মুক্তি পাইয়াছে। ইহাই গীতার নিম্নলিখিত বাক্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।

সবুদ্ধিমান মনুষ্যেষু"—যিনি কর্ম্মের মধ্যে দেখেন কর্ম্ম নাই এবং নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও দেখেন কর্ম্ম চলিতেছে তিনিই মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধিমান। গীতার এই বাক্য সাংখ্যকৃত পুরুষ প্রকৃতির প্রভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত—পুরুষ মুক্ত, নিষ্ক্রিয় আত্মা, কর্ম্মের মধ্যেও চিরশান্ত, শুদ্ধ, অবিচলিত, আর প্রকৃতি চিরক্রিয়াশীলা। প্রকৃতি তাহার দৃশ্য কর্ম্মস্রোতের মধ্যে যেমন কর্ম্ম করিতেছে, জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বলিয়া যাহা দেখায় তাহার মধ্যেও তেমনিই কর্ম্ম করিতেছে। বুদ্ধির চরম চেষ্টার ফলে আমরা এই জ্ঞানই লাভ করি, অতএব যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্, স বুদ্ধিমান

মনুষ্যেষু,—যে ভ্রান্ত ব্যক্তি নীচের বুদ্ধির বাহ্যিক, অনিশ্চিত, অস্থায়ী প্রভেদ সমূহের দ্বারা জীবন ও কর্ম্মের বিচার করিতে চাহে, সে প্রকৃত বুদ্ধিমান নহে। অতএব মুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মকে ভয় পান না, তিনি সর্ব্বকর্ম্মকারী মহাকর্ম্মী, কৃৎস্ন-কর্ম্ম-কৃৎ; অপরের ন্যায় তিনি প্রকৃতির অধীনে কর্ম্ম করেন না, পরন্তু আত্মার নিথর শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবানের সহিত যোগে শান্ত ভাবে কর্ম্ম করেন। ভগবানই তাঁহার সকল কর্ম্মের ঈশ্বর, কেবল তাঁহার ভিতর দিয়া ঐ সকল কর্ম্ম হইয়া থাকে, তাঁহার প্রকৃতি সজ্ঞান ঈশ্বরের অধীনে যন্ত্রের ন্যায় ঐ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে। এই জ্ঞানের তীব্র, পুণ্য অগ্নিশিখায় তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম যেন পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, তাঁহার মনে ঐ সকল কর্ম্মের কোন দাগ পড়ে না, সকল কর্ম্মের মধ্যেও তাঁহার মন শান্ত, নীরব, অবিচলিত, শুভ্র, নির্ম্মল ও পবিত্র থাকে। কর্ত্তৃত্বের অভিমানশূন্য হইয়া, এই মোক্ষদায়ক জ্ঞানের আলোকে সমস্ত কর্ম্ম করা দিব্য কর্ম্মীর প্রথম লক্ষণ।

বাসনা হইতে মুক্তি, দ্বিতীয় লক্ষণ; কারণ যেখানে কর্ত্তার ব্যক্তিগত অহঙ্কার নাই সেখানে বাসনা অসম্ভব; সেখানে বাসনা কোন আহার্য্য পায় না, অবলম্বন না পাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, ক্ষীণ হইয়া লোপ পায়। মুক্ত ব্যক্তি অন্যান্য লোকের মতই সকল প্রকার কর্ম্ম করিতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায়; বরং তিনি অন্যান্য লোক অপেক্ষা বৃহত্তর

কর্ম্ম অধিকতর শক্তি ও দৃঢ়তার সহিতই সম্পাদন করিয়া থাকেন, কারণ ভগবদিচ্ছার মহতী শক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া ক্রিয়া করে; কিন্তু তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম ও আরম্ভ নীচের বাসনা ও সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। তিনি তাঁহার কর্ম্মের ফলে সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন; আর যখন কেহ ফলের জন্য কর্ম্ম করে না, কিন্তু ভগবানের হস্তে কেবল অহঙ্কারশূন্য যন্ত্র মাত্র, এইভাবে কর্ম্ম করে, সেখানে বাসনা কোন স্থান পাইতে পারে না,—এমন কি ভগবানের কার্য্য সফল করিবার বাসনা বা কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনাও থাকিতে পারে না, কারণ ফল ভগবানের, ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট এবং ভগবান নিজেই কর্ম্মের কর্ত্তা—এবং ভগবান নিজের যে শক্তিকে কর্ম্মের ভার দিয়াছেন সেই শক্তিরই সকল কৃতিত্ব, ক্ষুদ্র মনুষ্যের তাহাতে কোন কৃতিত্ব নাই। মুক্ত মানবের মন ও আত্মা কিছুই করে না, ন কিঞ্চিৎ করোতি; যদিও তিনি তাঁহার স্বভাবের ভিতর দিয়াই কর্ম্মে নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রকৃতি, শক্তি, চৈতন্যময়ী দেবীই হৃদ্দেশে অবস্থিত ভগবান কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ঐ কর্ম্ম করেন।

তাই বলিয়া যে সুচারুভাবে, সফলতার সহিত কর্ম্ম করিতে হইবে না, কি উপায়ে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে তাহা বিচার করিতে হইবে না, তাহা নহে; বরং যোগস্থ হইয়া শান্তভাবে

কর্ম্ম করিলে তাহা যেরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, আশা নিরাশায় কম্পিত হৃদয়ে, ক্ষুদ্র অক্ষম বুদ্ধির নানা বাধায়, অস্থির ইচ্ছার চাঞ্চল্যে কর্ম্ম করিলে তাহা সেরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না; গীতা আর এক স্থানে বলিয়াছে যে কর্ম্ম করিবার প্রকৃত কৌশলই যোগ, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। কিন্তু, এই সকল কর্ম্ম ব্যক্তিগত স্বভাবের ভিতর দিয়া এক বিরাট, বিশ্বব্যাপী, নামরূপের অতীত জ্যোতি ও শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। কর্ম্মযোগী জানেন যে তাঁহাকে যে শক্তি দেওয়া হইয়াছে উহা ভগবৎনির্দ্দিষ্ট ফললাভের উপযোগী হইয়া উঠিবে এবং তাঁহার ইচ্ছা, ভাগবতজ্ঞানের দ্বারাই সূক্ষ্মভাবে নিয়মিত হইবে।

এই ইচ্ছা কর্ম্মীর ব্যক্তিগত বাসনা বা কামনা নহে, কোনরূপ ব্যক্তিগত জয় বা লাভ ইহার লক্ষ্য নহে, ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এক দিব্য বিজ্ঞানময়ী শক্তির প্রেরণা। এরূপ কর্ম্ম সাধারণের চক্ষে সাফল্যমণ্ডিতও হইতে পারে, বিফলও হইতে পারে; কিন্তু, কর্ম্মযোগী জানেন যে বাহ্যতঃ যাহাই মনে হউক সমস্ত জয় পরাজয়, লাভ লোকসানে সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞঃ ভগবানের অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়, ভগবান কখন বাহ্য জয়ের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছা সম্পাদন করেন, আবার কখনও বাহ্য পরাজয়ের ভিতর দিয়াই তাঁহার ইচ্ছা অধিকতর জোরের সহিত সম্পন্ন করেন। অর্জ্জুনকে যে যুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে,

তাহাতে জয় সুনিশ্চিত; কিন্তু, যদি নিশ্চিত পরাজয়ই তাহার সম্মুখে থাকে তথাপি তাহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে কারণ, যে বিরাট আয়োজনের দ্বারা ভগবানের ইচ্ছা নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে এই যুদ্ধ করার ভারই উপস্থিত অর্জ্জুনের উপর দেওয়া হইয়াছে।

মুক্ত মানবের ব্যক্তিগত কোন আশা, আকাঙ্ক্ষা নাই; তিনি কোন দ্রব্যই নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন না; ভগবানের ইচ্ছা যাহা আনিয়া দেয় তিনি তাহাই গ্রহণ করেন, কোনও দ্রব্যে লোভ করেন না, কাহাকেও ঈর্ষা করেন না; তিনি যাহা পান রাগদ্বেষশূন্য হইয়াই তাহা গ্রহণ করেন; কোন কিছু হারাইলে তিনি দুঃখ বা শোক করেন না। তাঁহার চিত্ত ও আত্মা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অধীন; সকল প্রকার প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভ হইতে তাহারা মুক্ত, বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে তাহারা বিচলিত হইয়া ভিতরে গোলযোগের সৃষ্টি করে না। তাঁহার কর্ম্ম বাস্তবিকই কেবল শারীরিক, শারীরং কেবলং কর্ম্ম; কারণ, বাকী আর যাহা কিছু তাহা ঊর্দ্ধ হইতেই আইসে, মানবীয় স্তরে উৎপন্ন হয় না, তাহা ভগবান পুরুষোত্তমের ইচ্ছা, জ্ঞান ও আনন্দের প্রতিরূপ মাত্র। অতএব তিনি কর্ম্মে ও কর্ম্মের ফলে ঝোঁকি দিয়া তাঁহার চিত্ত, মনে সেই সকল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেন না, যাহাদিগকে আমরা অন্তরের রিপু বা পাপ বলিয়া থাকি। কারণ, বাহিরের কর্ম্ম আদৌ পাপ নহে, কিন্তু কর্ম্মীর ব্যক্তি-

গত ইচ্ছা, মন ও চিত্তের যে অশুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এই কর্ম্মের আনুসঙ্গিক বা কারণ, বাস্তবিক পক্ষে তাহাই পাপ; যাহা ব্যক্তিগত নহে, যাহা নামরূপের অতীত আধ্যাত্মিক সত্তা তাহা সকল সময়েই শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধম্ এবং সেই সত্তার দ্বারা অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মই তাহারই মত শুদ্ধ, পবিত্র। এই আধ্যাত্মিক অব্যক্তিত্বই * (Spiritual impersonality) দিব্য কর্ম্মীর তৃতীয় লক্ষণ। অবশ্য যে সকল মানব কতকটা মহত্ত্ব এবং উদারতা লাভ করিয়াছেন তাহারা সকলেই অনুভব করেন যে তাঁহাদের ব্যক্তিগত সত্তার অতীত এক শক্তি বা প্রেম বা ইচ্ছা এবং জ্ঞান তাঁহাদের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তিগত অহঙ্কারের ভাব হইতে মুক্ত নহেন এবং মাঝে মাঝে এই অহঙ্কার খুবই প্রবল হইয়া

---

* আমরা এখানে ইংরাজী impersonality'র বাংলা প্রতিশব্দরূপে "অব্যক্তিত্ব" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু, কথাটা বেশ প্রাঞ্জল নয়। Impersonality বলিতে কি বুঝায় সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। আমার শরীর ও অন্তকরণকে যন্ত্র করিয়া যে শক্তি কার্য্য করিতেছে সে শক্তি আমার মধ্যে, আমার নামরূপে সীমাবদ্ধ নহে, সে শক্তি অসীম বিশ্বব্যাপী; এই শক্তি যে ফলের জন্য আমার ভিতর দিয়া কর্ম্ম করিতেছে তাহারও লক্ষ্য আমার এই ক্ষুদ্র "আমি" নহে পরন্তু, শক্তি যাহার দাসী সেই পরমেশ্বরই সকল কর্ম্মের, সকল ফলের ভোক্তা—এইরূপ ভাব যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখনই আমাদের হয় impersonal ভাব; ভবিষ্যতে এই অর্থেই আমরা "অব্যক্তিত্ব" শব্দ ব্যবহার করিব এই অর্থ গ্রন্থের মধ্যেই আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে— অনুবাদক।

উঠে। কিন্তু মুক্ত পুরুষের এই স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে; কারণ তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত সত্তাকে নামরূপের অতীত সত্তায় মিশাইয়া দিয়াছেন,—সেখানে ইহা আর তাঁহার নিজের নহে, ভগবান পুরুষোত্তম ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন,—তিনি সকল সান্ত গুণকে অনন্তভাবে, অবাধে ব্যবহার করিতেছেন এবং কিছুর দ্বারাই বদ্ধ হইতেছেন না। যাঁহার এরূপ মুক্তি লাভ হইয়াছে, তিনি আত্মা হইয়াছেন, তিনি আর শুধু প্রকৃতির গুণ সমূহের সমষ্টিমাত্র নহেন; প্রকৃতির কার্য্যের জন্য ব্যক্তিত্বের যে আভাসটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহা কিছুর দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহা একটা উদার, নমনীয়, বিশ্বব্যাপী বস্তু. তাহা অনন্তের মুক্ত আধার, পুরুষোত্তমের জীবন্ত প্রতিরূপ।

এই জ্ঞান, এই বাসনাশূন্যতা এবং এই অব্যক্তিত্বের ফল আত্মা ও প্রকৃতিতে পূর্ণ সমতা। সমতা দিব্যকর্ম্মীর চতুর্থ লক্ষণ। গীতা বলেন, দিব্যকর্ম্মী সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়াছেন; তিনি দ্বন্দ্বাতীতঃ। আমরা দেখিয়াছি যে তিনি জয় পরাজয়, কৃতকার্য্যতা, অকৃতকার্য্যতা সবই সমান চক্ষে দেখেন এবং তাঁহার চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হয় না; কিন্তু শুধু ইহাই নহে, তিনি সকল দ্বন্দ্বের উপরে উঠিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন করেন। সংসারের ঘটনানিচয়ের সম্বন্ধে সাধারণ মনুষ্যের মনোভাব যে সকল বাহ্য ভেদাভেদের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, দিব্যকর্ম্মী সে সকল ভেদাভেদকে তত বড় করিয়া দেখেন না। তিনি এই সকল ভেদাভেদ

অস্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তিনি এই সকলের উপরে। শুভ ও অশুভ ঘটনার প্রভেদ সকাম মনুষ্যের পক্ষে গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু দিব্যপ্রকৃতিসম্পন্ন নিষ্কাম পুরুষের নিকট শুভ ও অশুভ উভয়েই সমান আদরের কারণ ইহাদের সংমিশ্রণের দ্বারাই সনাতন শুভের ক্রমবিকাশশীল রূপ গড়িয়া উঠিতেছে। তাঁহার পরাজয় নাই কারণ তাঁহার পক্ষে সমস্ত ঘটনাই প্রকৃতির কুরুক্ষেত্রে দিব্যজয়ের দিকেই চলিয়াছে—এই যে কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের বিকাশ হইতেছে, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, এখানকার প্রত্যেক ঘটনাই এই যুদ্ধের পরম প্রভু, কর্ম্মসকলের ঈশ্বর, ধর্ম্মের নেতা ভগবানের দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা আছে। মানুষের সম্মান বা অপমান দিব্যকর্ম্মীকে বিচলিত করিতে পারে না, মানুষের প্রশংসা বা মানুষের নিন্দা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না; কারণ তাঁহার কার্য্যের একজন মহত্তর দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন বিচারকর্ত্তা আছেন, এক স্বতন্ত্র মানদণ্ড আছে; এবং তাঁহার কর্ম্মের প্রেরণা সাংসারিক পুরস্কারের উপর এতটুকুও নির্ভর করে না। ক্ষত্রিয় অর্জ্জুন স্বভাবতঃই যশঃ ও মানের আদর করিবেন, অপমান ও কাপুরুষ অপবাদকে মৃত্যুর ন্যায় পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে ঠিক; কারণ সম্মান রক্ষা করা, জগতে সাহসিকতার আদর্শ অটুট রাখা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ; কিন্তু মুক্ত পুরুষ অর্জ্জুনের পক্ষে এ সব গ্রাহ্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে শুধু জানিতে হইবে যে কর্ত্তব্যম্

কর্ম্ম কি, ভগবান তাঁহার নিকট কোন কর্ম্ম দাবি করিতেছেন, ভগবানে ফলাফল সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সেই কর্ম্ম করিতে হইবে। এমন কি তিনি সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় পাপপুণ্যের প্রভেদেরও উপরে উঠিয়াছেন; যাহারা অহঙ্কারের প্রভাব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রবল রিপুগণের বশ্যতা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের পক্ষে পাপপুণ্যের প্রভেদ একান্ত আবশ্যক,—কিন্তু যিনি মুক্ত, তিনি এই সকল চেষ্টার উপরে উঠিয়াছেন এবং সাক্ষী, প্রবুদ্ধ আত্মার পবিত্রতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাপ তাহা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, এবং তিনি যে চূড়ায় উঠিয়াছেন, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অসৎকর্ম্মে তাহার ক্ষয় নাই বা সৎকর্ম্মে তাহার বৃদ্ধি নাই, তাহা দিব্য নিঃস্বার্থ প্রকৃতির অটুট অক্ষয় পবিত্রতা। সেখানে পাপপুণ্যবোধের কোন স্থান নাই, কোন উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা নাই।

অজ্ঞানের অধীন অর্জ্জুন হৃদয়ের মাঝে ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং মনে মনে বিচার করিতে পারেন যে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তাহার পক্ষে পাপ হইবে কারণ অত্যাচারী শক্তিকে বাড়িতে দিলে দেশের উপর, জাতির উপর যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার হইবে সে সবের দায়িত্ব তাঁহারই উপর পড়িবে; অথবা তিনি হিংসা ও নরহত্যার প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করিতে পারেন এবং মনে মনে বিচার করিতে পারেন যে সকল অবস্থাতেই রক্তপাত

পাপ এবং কিছুতেই ইহার সমর্থন করা যায় না। এই দুই প্রকার মনোভাবই সমান ভাবে ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত, ইহাদের মধ্যে কোনটির জয় হইবে বা লোকে কোনটিকে গ্রাহ্য করিবে তাহা অবস্থা, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে। অথবা, শত্রুর বিরুদ্ধে বন্ধুদিগকে সাহায্য করিতে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায় ও শুভকে সমর্থন করিতে অর্জ্জুন কেবল আত্মসম্মান বোধ ও হৃদয়বৃত্তির প্রেরণাতেই নিজেকে বাধ্য মনে করিতে পারেন। কিন্তু, মুক্ত পুরুষের দৃষ্টি এই সব বিরোধী আদর্শ ও নীতিকে অতিক্রম করে; তিনি শুধু দেখেন যে ধর্ম্মের রক্ষা অথবা বিকাশের নিমিত্ত প্রয়োজন বলিয়া ভগবান তাঁহার নিকট কি চাহেন। তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার নাই, নিজের ব্যক্তিগত কোন রাগ বা দ্বেষ তৃপ্ত করিবার নাই. তাঁহার কর্ম্মের এমন কোন চিরনির্দ্দিষ্ট নীতি বা আদর্শ নাই যাহা বিকাশশীল নব জাতির ক্রমোন্নতির সহিত পরিবর্ত্তিত হয় না অথবা যাহা অনন্তের ডাককেও তুচ্ছ করিয়া বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। তাঁহার নিজের কোন শত্রু জয় করিবার বা বধ করিবার নাই। তিনি দেখেন যে যাহারা তাঁহার বিরোধী তাহারা বাধা প্রদানের দ্বারাই নিয়তির গতিকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ঘটনাচক্রে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন ক্রোধ বা বিদ্বেষ থাকিতে পারে না; কারণ দিব্য প্রকৃতিতে ক্রোধ বা বিদ্বেষের কোন স্থান নাই। বাধা-

মাত্রকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার, ধ্বংস করিবার যে আকাঙ্ক্ষা অসুরের মধ্যে আছে, যে ভীষণ রক্ত-পিপাসা রাক্ষসের আছে, তাঁহার দিব্য প্রকৃতির ধীরতা, শান্তি এবং সর্ব্বতোমুখী সহানুভূতি ও জ্ঞানের মধ্যে সে সব অসম্ভব। তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চান না, বরং সকলের প্রতিই তাহার বন্ধুভাব ও করুণা, অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মিত্র করুণ এব চ। কিন্তু, হৃদয়, স্নায়ু ও রক্তমাংসের শিহরণজনিত যে অনুকম্পা সাধারণতঃ মনুষ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এই দেবোচিত করুণা তাহা হইতে বিভিন্ন; দেবতা যে করুণাদৃষ্টিতে মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সকল আত্মাকেই নিজের মধ্যে আলিঙ্গন করেন, এই করুণা সেই দেবোচিত করুণা। আবার মুক্ত পুরুষ যে শরীরের জীবনটাকে খুব বড় করিয়া দেখেন তাহাও নহে, ইহার উপরে যে আত্মার জীবন আছে তাহার উপরেই তিনি লক্ষ্য রাখেন এবং এই শরীরের জীবনকে সেই আত্মার জীবনের যন্ত্রমাত্র বলিয়াই জানেন। তিনি সহসা হত্যাকাণ্ড বা যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন না, কিন্তু যদি ধর্ম্মের স্রোতে যুদ্ধ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎপদ হন না, এক উদার সমতা ও পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহাকে যাহাদের প্রভুত্বের শক্তি ও উল্লাস নষ্ট করিতে হয় তাহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির কোন অভাব হয় না।

কারণ তিনি সর্ব্বত্র দুইটি জিনিষ দেখেন, তিনি দেখেন

যে ভগবান সর্ব্বভূতে সমানভাবে বাস করিতেছেন, কেবল সাময়িক ঘটনাক্রমে সর্ব্বত্র ভগবানের প্রকাশ সমান নহে। পশু ও মানবে, কুক্কুরে, অস্পৃশ্য চণ্ডালে, বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, সাধুতে ও পাপীতে, উদাসীনে, শত্রুতে এবং বন্ধুতে, শুভকারীতে এবং অনিষ্টকারীতে—সর্ব্বত্র তিনি নিজকে দেখেন, ভগবানকে দেখেন এবং সকলের প্রতিই তাঁহার অন্তরে সমান দয়া, দিব্য ভালবাসা। ঘটনাচক্রে তিনি হয় ত কাহাকেও বাহ্যতঃ আলিঙ্গনে বদ্ধ করেন, আবার কাহাকেও বাহ্যতঃ যুদ্ধে আক্রমণ করেন—কিন্তু, তাঁহার সমদৃষ্টি, উন্মুক্ত হৃদয় এবং সকলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসার কখনও প্রত্যবায় হয় না। তাঁহার সকল কর্ম্মের মূলে এই নীতি থাকে যে মানবজাতিকে ক্রমশঃ দেবত্বের দিকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে ভগবদিচ্ছা তাঁহার ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছে।

দিব্য কর্ম্মীর আর এক লক্ষণ হইতেছে, পূর্ণ আন্তরিক আনন্দ ও শান্তি (ইহা দিব্য চৈত্যন্যেরেও মূলতত্ত্ব), ইহার উৎপত্তি ও স্থায়িত্ব জগতের কোন কিছুর উপরই নির্ভর করে না; এই পূর্ণ আনন্দ ও শান্তি আত্মার চৈতন্যের মূল উপাদান, দিব্য সত্তার ইহাই প্রকৃত স্বরূপ। সাধারণ মানব তাহার সুখের জন্য বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে; অতএব তাহার বাসনা আছে; সেই জন্যই তাহার আছে ক্রোধ, উত্তেজনা, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও শোক; সেই জন্যই সমস্ত জিনিষকেই সে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মানদণ্ডে ওজন করে। ইহাদের কোনটিই দিব্য

আত্মাকে বিচলিত করিতে পারে না ; ইহা কোন কিছুর উপর নির্ভর না করিয়া সদাই পরিতৃপ্ত, নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ; কারণ ইহার রতি, ইহার দিব্য আরাম, ইহার সুখ, ইহার রমণীয় জ্যোতি—সবই সর্ব্বদা ইহার অন্তরস্থিত, ইহার অঙ্গীভূত, আত্মরতিঃ, অন্ত সুখোঽন্তরারামস্তথাঽন্তর্জ্যোতিরেব যঃ। দিব্য পুরুষ বাহ্য বস্তু হইতে যে আনন্দ পান তাহা ঐ বস্তুর জন্য নহে, ঐ বস্তু যে তাঁহার কোন অভাব বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে সে জন্য নহে—ঐ সকল বস্তুতে যে সনাতন আত্মা রহিয়াছে, ভগবানের প্রকাশ রহিয়াছে, ঐ সকল জিনিষের মধ্যে যাহা নিত্য এবং কখনও তাঁহার অগোচর হইতে পারে না তাহার জন্যই তিনি ঐ সকল বস্তুতে আনন্দ পান। বাহ্য বস্তুতেই যাহার আনন্দ তাহার আনন্দের অন্ত আছে, অভাব আছে—কিন্তু, সকল বাহ্য বস্তুই যে সনাতন সত্য বস্তুর বাহ্য নিদর্শন সেই সত্য বস্তুতেই দিব্য পুরুষের আনন্দ এবং তাঁহার সে আনন্দের কখনও অভাব হইতে পারে না। বাহ্য বস্তুর স্পর্শে তাঁহার কোনরূপ আসক্তি নাই, কিন্তু তিনি নিজের আত্মাতে যে আনন্দ পান সকল বস্তুতেই সেই আনন্দ পাইয়া থাকেন কারণ এই সব বস্তুর আত্মা এবং তাঁহার নিজের আত্মা এক, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মার সহিত একাত্মা হইয়াছেন, তাহাদের সকল ভেদের মধ্যেও যে এক সম ব্রহ্ম রহিয়াছে সেই ব্রহ্মের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছেন, ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মা (৫।২১), সর্ব্বভূতাত্ম ভূতাত্মা (৫।৭)। তিনি সুখময়

জিনিষের স্পর্শে উল্লাসিত হন না বা দুঃখময় জিনিষের স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ করেন না ; কোন জিনিষের ব্যথা, কোন বন্ধুর দেওয়া বেদনা, কোন শত্রুর আঘাত—কিছুই তাঁহার হৃদয় বা মনের স্থৈর্য্য নষ্ট করিতে পারে না ; তাঁহার আত্মা স্বভাবতঃ (উপনিষদের ভাষায়) অব্রণম্ ক্ষতশূন্য বা ব্যথাশূন্য। সকল জিনিষেই তাঁহার একই অফুরন্ত আনন্দ—

বাহ্য স্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৫।২১

এই সমতা, অব্যক্তিত্ব, শান্তি, আনন্দ, মুক্তি প্রভৃতি যে সব গুণ দিব্যকর্ম্মীর লক্ষণ, কর্ম্ম করা বা না করার ন্যায় বাহ্য ব্যাপারের উপর সে সব গুণ নির্ভর করে না। বাহ্য ও আভ্যন্তরীন ত্যাগের প্রভেদে, "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগের" প্রভেদে গীতায় পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে। গীতার মতে আভ্যন্তরীন ত্যাগ ভিন্ন বাহ্য ত্যাগের কোন মূল্যই নাই, প্রথমটি ভিন্ন দ্বিতীয়টি প্রায় অসম্ভব ; আবার যেখানে আভ্যন্তরীন মুক্তি আছে সেখানে বাহ্য সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক পক্ষে "ত্যাগ"ই (আভ্যন্তরীন ত্যাগ) প্রকৃত এবং যথেষ্ট সন্ন্যাস।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। ৫।৩

"যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে হইবে ; দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত এই

রূপ ব্যক্তি অনায়াসে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।” দুঃখদায়ক (দুঃখমাপ্তুম্) বাহ্য সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজনই নাই। সমস্ত কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল যে সন্ন্যাস করিতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু, এই সন্ন্যাস বাহ্য নহে, আভ্যন্তরীন, প্রকৃতির তামসিকতায় সমস্ত সমর্পণ করিতে হইবে না, কিন্তু সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যজ্ঞ-রূপে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে, নামরূপের অতীত বিরাট সত্ত্বার শান্তি ও আনন্দের মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে,—এই সত্ত্বা হইতে সমস্ত কর্ম্ম উৎপন্ন হইলেও উহার শান্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করাই প্রকৃত কর্ম্মসন্ন্যাস।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৬।১০

—“যিনি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া (অথবা ব্রহ্মকে কর্ম্মের আধার বা ভিত্তি করিয়া) কর্ম্ম করেন, জলে কমলপত্রের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হন না।”

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কৈবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মশুদ্ধয়ে। ৫।১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ৫।১২

—অতএব যোগিগণ প্রথমে “শরীর, মন ও বুদ্ধির দ্বারা, এমন কি কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনাসক্ত হইয়া আত্ম-

১০

শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের সহিত যুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মের ফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার ঐকান্তিক শান্তি লাভ করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ ব্রহ্মে যুক্ত নহেন তিনি কর্ম্মফলে আসক্ত হন এবং বাসনার বশ কর্ম্ম করিয়া বদ্ধ হন।"

এই প্রতিষ্ঠা, পবিত্রতা ও শুদ্ধি একবার লাভ করিতে পারিলে দেহী আত্মা তাহার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিয়া এবং সমস্ত কর্ম্ম মনের দ্বারা (বাহ্যভাবে নহে, আভ্যন্তরীন ভাবে) সন্ন্যাস করিয়া "নবদ্বার বিশিষ্ট পুরবৎ দেহে কর্ম্ম না করিয়া এবং না করাইয়া অবস্থান করেন"।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখংবশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ৫।১৩

কারণ এই আত্মাই সকলের অন্তরস্থিত, সকল ভেদের অতীত, সর্ব্বব্যাপী আত্মা, "প্রভু", "বিভু", ইনি কোন বিশেষ নামরূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন, সংসারের কোন কর্ম্ম সৃষ্টি করেন না, মনের কর্ত্তৃত্ব ভাবও ইনি সৃষ্টি করেন না, কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফলের সংযোগ অর্থাৎ কার্য্যকারণশৃঙ্খলাও তিনি সৃষ্টি করেন না। মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি রহিয়াছে, "স্বভাব", সেই স্বভাবই এই সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ৫।১৪

ঐ সর্ব্বব্যাপী নামরূপাতীত সত্তা কাহারও পাপ বা পুণ্য

গ্রহণ করেন না; জীবের অজ্ঞান হইতে, কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার হইতে, নিজের পরম সত্ত্বা সম্বন্ধে অজ্ঞান হইতে প্রকৃতির ক্রিয়ার সহিত জড়িতভাব হইতে সকল পাপ পুণ্যের উৎপত্তি; তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞান যখন এই অন্ধকারময় আবরণ হইতে মুক্ত হয়, সেই জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় ভিতরের সত্য আত্মাকে প্রকাশিত করে, তখন সে নিজেকে প্রকৃতির যন্ত্রসমূহের উপরিস্থিত পরম আত্মা বলিয়া জানিতে পারে। নিজেকে শুদ্ধ, অনন্ত, অজেয়, অক্ষর জানিয়া সে আর তখন বিচলিত হয় না; প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্বারা যে তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তখন আর তাহার এ ধারণা থাকে না। নিজেকে সেই নামরূপের অতীত বিরাট সত্ত্বার সহিত সম্পূর্ণভাবে এক করিয়া, সেও প্রকৃতির বন্ধনে পুনরাবৃত্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ৫।১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্‌॥ ৫।১৬
তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধুত কল্মষাঃ॥ ৫।১৭

অথচ এইরূপ মুক্তিতে তাহার কর্ম্ম করিবার কোন বাধাই হয় না। কেবল তাহার এই জ্ঞান থাকে যে সে নিজে

ক্রিয়াপর নহে, বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির গুণত্রয়ই সমুদয় কর্ম্ম করে।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৫।৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্॥ ৫।৯

"তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি অন্তরে নিষ্ক্রিয় নামরূপাতীত সত্ত্বায় যুক্ত থাকিয়া মনে করেন—'আমি কিছুই করিতেছি না'; তিনি যখন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আহার, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষু উন্মোচন ও চক্ষু নিমীলন করেন তখন তিনি এই ধারণা করেন যে শুধু ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ের উপর ক্রিয়া করিতেছে।" তিনি অক্ষর, অপরিণামী আত্মায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গুণত্রয়ের কবল হইতে নিরাপদ হন, ত্রিগুণাতীত হন; তিনি সাত্ত্বিকও নহেন, রাজসিকও নহেন, তামসিকও নহেন; তাঁহার কর্ম্মে প্রাকৃতিক গুণসমূহের যে ক্রমান্বয় পরিবর্ত্তন চলে, আলো ও সুখের, কর্ম্ম ও শক্তির, বিশ্রাম ও জড়িমার যে ছন্দোবদ্ধ লীলা চলে, সে সব তিনি নির্ম্মল শান্তভাবে নিরীক্ষণ করেন। শান্ত আত্মার এই ঊর্দ্ধ-স্থিতি, দ্রষ্টাভাবে নিজের কর্ম্মকে নিরীক্ষণ করা অথচ তাহাতে জড়িত বা বদ্ধ না হওয়া, এই ত্রৈগুণাতীত্য, দিব্যকর্ম্মীর আর একটি মহৎ চিহ্ন। শুধু এই ভাব হইতে প্রকৃতির অন্ধনিয়ম-বাদের উৎপত্তি হইতে পারে, আত্মা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্রও

ায়িত্বহীন, জড়প্রকৃতি আপনা হইতেই সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে এইরূপ মতবাদের উদ্ভব হইতে পারে; কিন্তু, এরূপ মত অসম্পূর্ণ চিন্তার ফল, এই মত গীতা পুরুষোত্তমবাদের দ্বারা পূর্ণভাবে নিরসন করিয়াছে এবং সকল সমস্যার উপযুক্ত মীমাংসা করিয়াছে। গীতার এই মত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতি নিজের কার্য্য নিজে অন্ধভাবে নির্ণয় করে না; পরম পুরুষের ইচ্ছাই প্রকৃতিকে পরিচালিত করে; যিনি পূর্ব্বেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া রাখিয়াছেন, অর্জ্জুন যাঁহার কর্ম্মের মানবীয় যন্ত্র মাত্র, সেই বিশ্বব্যাপী আত্মা সেই প্রপঞ্চাতীত দেবতাই প্রকৃতির কর্ম্মের প্রভু। আমাদের ব্যক্তিগত অহঙ্কার হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপায়স্বরূপ আমাদিগকে ধারণা করিতে হয় বটে যে নামরূপ-হীন বিরাট ব্রহ্মই সকল কর্ম্মের আধার, আমাদের "আমি" প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের মূল নহে; কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের লক্ষ্য হইতেছে সকল কর্ম্ম সর্ব্বভূতমহেশ্বরে, সকলেরই যিনি পরমেশ্বর তাঁহাকে সমর্পণ করা।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।৩।৩০

আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আমাতে তোমার সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া, ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত হইয়া, "আমি" এবং "আমার" চিন্তা বর্জ্জন করিয়া 'বিগতজ্বরঃ' হইয়া যুদ্ধ কর, কর্ম্ম কর, জগতে আমার ইচ্ছা সম্পাদন কর। ভগবানই

সমস্ত কর্ম্মের উদ্ভাবন করেন, নির্দ্দেশ করেন, নিয়মন করেন ; যে মানব নামরূপের অতীত ব্রহ্মভাব লাভ করিয়াছেন, তিনি হন ভগবানের শক্তির শুদ্ধ, নীরব আধার (channel) ; প্রকৃতিতে অব্যাহত ঐ ভগবৎ শক্তি ভগবানের কার্য্য সম্পাদন করে। যিনি মুক্ত কেবল তাঁহারই কর্ম্ম, মুক্তস্য কর্ম্ম, এই প্রকারের, কারণ কোথাও তিনি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম করেন না ; এই প্রকারের কর্ম্ম হয় সিদ্ধ কর্ম্মযোগীর। সে সব কর্ম্ম মুক্ত আত্মা হইতে উত্থিত হয় এবং আত্মাকে কোনরূপ বিচলিত না করিয়াই চলিয়া যায়, ঠিক যেমন গভীর সমুদ্রে ঢেউ উঠিয়া আবার মিশাইয়া যায়, তাহাতে সমুদ্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তনই হয় না।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥৪।২৩

ঊনবিংশ অধ্যায়

সমতা

যেহেতু জ্ঞান, নিষ্কামতা, অব্যক্তিত্ব, সমতা, আভ্যন্তরীন স্বপ্রতিষ্ঠ শান্তি ও আনন্দ এবং ত্রৈগুণাতীত্য মুক্ত আত্মার লক্ষণ, সেই হেতু ইহার সকল কর্ম্মে ঐ সকল গুণ থাকিবেই। সংসারের সকল আঘাত, সকল দ্বন্দ্ব, সকল ঘটনার মধ্যে এরূপ আত্মা যে অবিচলিত শান্তভাব রক্ষা করে, তাহার জন্য উল্লিখিত গুণগুলি একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে ব্রহ্মের যে সম অক্ষরভাব, এই শান্ত ভাব তাহারই প্রতিচ্ছায়া; বিশ্বের বহুর মধ্যে যে অখণ্ড একত্ব চিরকাল অনুস্যূত রহিয়াছে, এই শান্তভাব তাহারই। কারণ জগতের অসংখ্য ভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে এই এক ব্রহ্মই সমতা রক্ষা করিতেছে; এবং ব্রহ্মের সমতাই একমাত্র প্রকৃত সমতা। কারণ, জগতের অন্যান্য বিষয়ে কেবলমাত্র সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য থাকিতে পারে; কিন্তু জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সদৃশ বস্তু সমূহের মধ্যেও আমরা অসমতা ও ভেদ দেখিতে পাই এবং অসমান বস্তু সমূহকে পরস্পরের সহিত সুসম্বদ্ধ করিয়াই জগতে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা যাইতে পারে।

এইজন্যই গীতা কর্ম্মযোগের লক্ষণের মধ্যে সমতার উপর এত অধিক জোর দিয়াছে; মুক্ত আত্মা যে স্বাধীন ভাবে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, এই সমতাই তাহার সন্ধিস্থল। মুক্ত পুরুষ যতক্ষণ আত্মজ্ঞান, নিষ্কামতা, অব্যক্তিত্ব, আনন্দ, ত্রৈগুণাতীত্য লইয়া সংসার হইতে সরিয়া নিজের মধ্যে নিজেকে লইয়াই থাকে, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ সমতার কোন প্রয়োজন হয় না; কারণ, যে সকল বস্তুতে সমতা ও অসমতার দ্বন্দ্ব আছে সে সকল বস্তু হইতে সে দূরে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আত্মা প্রকৃতির কার্য্যের বহুত্ব, ব্যক্তিগত ভেদবৈষম্যের মধ্যে আসে তখনই তাহার মুক্ত অবস্থার অপর গুণগুলিকে সমতার ভিতর দিয়াই কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের সহিত একত্বের উপলব্ধিই জ্ঞান; জগতের বহু বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কে থাকিয়া এই জ্ঞানকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে, সকলের সহিত সমান একত্ব অনুভব করিতে হইবে। এক অক্ষর আত্মার নামরূপ বহু ও বিভিন্ন, আত্মার সত্ত্বা সকল নামরূপের অতীত এবং ইহাই তাহার অব্যক্তিত্ব; জগতের বিভিন্ন নামরূপের সহিত ব্যবহারে আত্মার অব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় সকলের প্রতি সম ও নিরপেক্ষ ব্যবহার করিয়া; অবশ্য সকলের সহিত যে একই প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে তাহা নহে—যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অবস্থা ও সম্বন্ধ ভেদে ব্যবহারেরও প্রকার ভেদ হইবে বটে কিন্তু সকলের প্রতি সকল ব্যবহারেই

ভিতরের ভাব সম ও নিরপেক্ষ রখিতে হইবে। যেমন কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।৯।২৯

তাঁহার প্রিয় কেহ নাই, তাঁহার ঘৃণাভাজনও কেহ নহে, তাঁহার ভিতরে সকলের প্রতিই সমভাব; তথাপি যে ব্যক্তি তাহার ভক্ত তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া, কারণ এরূপ ব্যক্তি ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে তাহা আলাদা এবং সকলেরই প্রভু সেই এক পক্ষপাতশূন্য ভগবান তাঁহার সমীপে যে যে ভাবে আসে, তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেন। সংসারের বিভিন্ন কাম্য বস্তু সমূহ আত্মাকে সীমার মধ্যে, বন্ধনের মধ্যে টানিতে চাহিতেছে—অসীম আত্মা এই টানের অতীত এবং ইহাই তাহার নিষ্কামতা; আত্মাকে যখন এই সকল বস্তুর সম্পর্কে আসিতে হয়, তখন তাহার নিষ্কামতা প্রকাশ করিতে হইবে সকল বস্তুর প্রতি সমান উদাসীন ভাবের দ্বারা অথবা সকল বস্তুতে সমান নিরপেক্ষ অনাসক্ত আনন্দবোধ ও প্রেমের দ্বারা; আত্মার আনন্দ স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহা কোন বাহ্য বস্তুর লাভালাভের উপর নির্ভর করে না, তাহা স্বরূপতঃ অচল অক্ষয়। কারণ, আত্মার আনন্দ নিজেরই মধ্যে; আর যদি জীব জগতের সম্পর্কের মধ্যেও সেই এই আনন্দ পাইতে চায় তাহা হইলে এই সমতার পথ ধরিয়াই আত্মা তাহার মুক্ত স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে।

আত্মা প্রকৃতির স্বভাবতঃ নিত্যচঞ্চল ও অসম গুণসমূহের ক্রিয়ার উর্দ্ধে এবং ইহাই আত্মার ত্রৈগুণাতীত্য; এই আত্মাকে যদি প্রকৃতির অসম দ্বন্দ্বপূর্ণ ক্রিয়ার সম্পর্কে আসিতে হয়, মুক্ত আত্মা যদি নিজের স্বভাবকে কোনরূপ কর্ম্ম করিতে দেয় তাহা হইলে সকল কর্ম্ম, সকল ফল, সকল ঘটনার প্রতি নিরপেক্ষ সমভাবের দ্বারাই আত্মার ত্রৈগুণাতীত্য প্রকাশ করিতে হইবে।

সমতা দিব্যকর্ম্মীর লক্ষণও বটে আবার যাহারা এই পথে অগ্রসর হইতে চায় তাহাদের পরীক্ষাও বটে। আত্মার মধ্যে যদি অসমতার ভাব থাকে তাহা হইলে বাসনার খেলা, ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনুভূতি ও কর্ম্মের খেলা, সাধারণ সুখ দুঃখ বা চাঞ্চল্য ও অতৃপ্তি সংযুক্ত সাধারণ আনন্দের খেলা—এই সব প্রকৃতির অসম খেলা কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে আত্মার অসমতা আছে সেখানে জ্ঞান হইতে বিচ্যুতি আছে, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব সমন্বয়কারী ব্রহ্মের সহিত একত্ব বোধে দৃঢ়তা ও পূর্ণতার অভাব আছে। এই সমতার দ্বারাই কর্ম্মযোগী তাহার কর্ম্মের মধ্যেও উপলব্ধি করে যে সে মুক্ত।

গীতা যে সমতার বিধান দিয়াছে তাহার স্বরূপ খুব উচ্চ ও ব্যাপক; সমতার এই আধ্যাত্মিক স্বরূপই এ বিষয়ে গীতাশিক্ষার বিশেষত্ব। কারণ; হৃদয়, মন, চিত্তের সমতা যে খুবই বাঞ্ছনীয়, তাহা সকলই স্বীকার করিয়া থাকেন, এই শিক্ষা কেবল যে গীতাতেই আছে তাহা নহে; এই সমতার অবস্থায় আমরা

মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার উপরে উঠি। সমতা সকল সময়েই জ্ঞানীজনোচিত স্বভাব এবং সুধী জীবনের আদর্শ বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। গীতা এই আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাকে আরও উপরে তুলিয়াছে। ইন্দ্রিয়াকর্ষণের ঘূর্ণী হইতে, বাসনার বিক্ষুব্ধতা হইতে উঠিয়া দিব্য শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে হইলে আত্মাকে যে অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহার কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ হইতেছে কৃচ্ছ্র বা স্তোয়িক * সমতা (Stoic poise) ও দার্শনিক বা বিচারলব্ধ সমতা (Philosophic poise)। কৃচ্ছ্র সাধন ও কঠোর সহিষ্ণুতার

* গ্রীক্ Stoic সম্প্রদায়কে নির্দ্দেশ করিতে আমরা "স্তোয়িক" শব্দই ব্যবহার করিলাম। এই সম্প্রদায়ের মত হইতেছে, সুখ দুঃখ বোধ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই দুর্ব্বলতাকে পদদলিত করিতে হইবে, মনের জোরে সুখ দুঃখকে জয় করিতে হইবে। এই ভাব বলদৃপ্ত অসুরেরা তপস্যা, ইহার মহত্ত্ব আছে, মানবের উন্নতিসাধনে প্রয়োজনও আছে, কিন্তু ইহা দুঃখ জয়ের প্রকৃত উপায় নহে। এরূপ দুঃখনিগ্রহে মানবের হৃদয় শুষ্ক, কঠোর, প্রেমশূন্য হইয়া যায়। এইরূপ কৃচ্ছ্র সাধনে স্থায়ী উন্নতি নাই। তপস্যায় শক্তি হয় বটে, কিন্তু এই জন্মে যাহা ছাপাইয়া রাখি, পরজন্মে তাহ সর্ব্বরোধ ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া আসে। গীতা বলিয়াছে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। গীতা যে সমতার শিক্ষা দিয়াছে, তাহ স্তোয়িক সমতার অনেক উপরের জিনিষ। গীতার সমতায় হৃদয় শুষ্ক হয় না, গীতার সমতায় ভোগের স্থান আছে, গীতোক্ত সাধনায় সমতাবাদ ও শান্ত বা শুদ্ধ ভোগ একই পথ। তবে গীতোক্ত সমতালাভের সাধনায় প্রথমাবস্থায় স্তোয়িক সমতার দ্বারা হয়ত কিছু সাহায্য হইতে পারে, গ্রন্থের মধ্যেও এই বিষয় বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

দ্বারা যে আত্মজয় লাভ করা যায় তাহারই উপর স্তোয়িক সমতার প্রতিষ্ঠা। দার্শনিক সমতা ইহা অপেক্ষা শান্তিময়, সুখময়—জ্ঞানলব্ধ আত্মজয়ের উপরেই এই দার্শনিক সমতার প্রতিষ্ঠা; মানসিক বিচারের দ্বারা আমাদের প্রকৃতির বিপর্য্যয় সমূহের প্রতি উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া (উদাসীন বদাসীনঃ) এই সমতা লাভ করা যায়। সর্ব্বদা ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে মাথা নত করিয়া থাকার ভাব, তাঁহার বিধান সর্ব্বদা মাথা পাতিয়া লওয়ার ভাব আর এক প্রকারের সমতা, ইহাকে ভাবের সমতা বা খ্রীষ্টান সমতা বলা যায়। দিব্য শান্তি লাভের এই তিনটি ধাপ ও উপায়—বীরোচিত ভাবে সকল কষ্ট সহ্য করা, জ্ঞানের দ্বারা উদাসীন ভাব অবলম্বন করা, ভক্তির বশে ভগবানের নিকট আত্ম সমর্পণ করা—"তিতিক্ষা", "উদাসীনতা", "নমঃ" বা "নতি"। গীতা তাহার উদার সমন্বয়ের রীতি অনুসারে এই তিন অবস্থাকেই গ্রহণ করিয়াছে এবং আত্মার উন্নতির উপায় স্বরূপ ইহাদের মিশ্রণ ও সমন্বয়ে সাধন করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটিকেই গীতা গভীরতর ভিত্তি, বৃহত্তর লক্ষ্য, উচ্চতর ও আরও ব্যাপক সার্থকতা দান করিয়াছে। কারণ গীতা এই তিন অবস্থারই ভিত্তি আত্মার শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং এই আধ্যাত্মিক সত্ত্বার শক্তি কেবল চরিত্রবল অপেক্ষা মহত্তর, মানসিক বুদ্ধি বিচার অপেক্ষা মহত্তর, হৃদয়ের আবেগ অপেক্ষা মহত্তর।

সাধারণ মানবাত্মা তাহার প্রাকৃত জীবনের অভ্যস্ত

কোলাহলেই একটা সুখ পায়; যেহেতু সে এই সুখ পায় এবং যেহেতু এই সুখ পায় বলিয়া সে নীচের প্রকৃতির এই অশান্ত খেলাতে সায় দেয়, সেইজন্যই এই খেলা চিরকাল চলিতে থাকে; কারণ প্রকৃতি তাহার প্রণয়ী ও ভোক্তা পুরুষের জন্য না হইলে এবং তাঁহার অনুমতি না পাইলে কোন কর্ম্মই করে না। আমরা এই সত্য ধরিতে পারি না কারণ বাস্তবিক যখন বিপদ আমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, তখন শোক, যন্ত্রণা, অসোয়াস্তি, দুর্ভাগ্য, অকৃতকার্য্যতা, পরাজয়, নিন্দা, অপমান প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মন সেই আঘাতে পিছাইয়া পড়ে, আবার ইহাদের বিপরীত ও সুখময় সম্পদ উপস্থিত হইলে তৃপ্তি, সৌভাগ্য, আনন্দ, কৃতকার্য্যতা, জয়, গৌরব প্রশংসাকে আলিঙ্গন করিয়া লইতে মন আগ্রহের সহিত লাফাইয়া উঠে; কিন্তু আত্মার সংসার-লীলায় যে আনন্দ ইহাতে তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। মনের সকল হর্ষ, বিষাদ, দ্বন্দ্বের পশ্চাতে আত্মার সে আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে। যোদ্ধা তাহার ক্ষতের বেদনায় কোন শারীরিক সুখ অনুভব করে না, পরাজয়েও মানসিক তৃপ্তি লাভ করে না; কিন্তু, যুদ্ধে তাহার পূর্ণ আনন্দ, যুদ্ধে যে জয়ের আশা আছে তাহার জন্য সে পরাজয়ের সম্ভাবনাকেও বরণ করিয়া লয়, এবং এই আশা আশঙ্কার মিশ্রণ যুদ্ধের জন্য তাহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে! এমন কি তাহার ক্ষতের বেদনা স্মরণ করিয়াও সে সুখ ও গৌরব অনুভব

করে—ক্ষত যখন সারিয়া যায় তখন এই সুখের অনুভূতি পূর্ণ, কিন্তু ক্ষতের যন্ত্রণাভোগের কালেও অনেক সময় সুখের অনুভূতি থাকে এবং যন্ত্রণাবোধের দ্বারাই সেই সুখ পুষ্ট হয়। পরাজয়ের মধ্যেও তাহার এই সুখ ও গৌরব বোধ থাকে যে একজন অধিকতর বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সে পশ্চাৎপদ হয় নাই; অথবা, যদি সে নীচ প্রকৃতির লোক হয় তবে এই পরাজয়ের ফলে তাহার ভিতর যে ঘৃণা ও প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠে তাহার মধ্যেও সে এক প্রকার নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করে। এইরূপেই আত্মা সংসারের সাধারণ খেলায় আনন্দ গ্রহণ করে।

ব্যথা ও যন্ত্রণার ভয়ে মানুষ বিপদ ও উৎপাত হইতে সরিয়া থাকিতে চায়, আত্মরক্ষার নীতিকে (জুগুপ্সা) কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত ইহাই প্রকৃতির কৌশল—ব্যথা ও যন্ত্রণার প্রতি মনের এই বিরাগের জন্য মানুষ এই রক্তমাংসের ভগ্নপ্রবণ দেহটাকে অযথা ধ্বংসের মধ্যে লইয়া যায় না এবং এইরূপেই আত্মহত্যা হইতে রক্ষা পায়; জীবনের পক্ষে উপকারী স্পর্শ সমূহে মানুষ সুখ পায় এবং এই রাজসিক সুখের লোভ দেখাইয়াই প্রকৃতি মানুষকে জড়তা হইতে, তামসিকতা হইতে টানিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে এবং মানুষের জয়, পরাজয়, দ্বন্দ্ব, বাসনা, কামনার ভিতর দিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। আমাদের অন্তরাত্মা এই দ্বন্দ্ব ও চেষ্টার মধ্যেই একটা সুখ পায়, এমন কি বিপদ, যন্ত্রণাতেও এক প্রকার

সুখ পায়—অতীতের স্মৃতিতে সে সুখ খুবই পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু, বর্ত্তমান বিপদ ও যন্ত্রণার মধ্যেও সে সুখবোধ থাকে এবং অনেক সময় ইহা খুব পরিস্ফুট হইয়া বিপদগ্রস্ত মনুষ্যের দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে ধৈর্য্য আনিয়া দেয়; কিন্তু সংসারের যে সুখ-দুঃখময় মিশ্রিত খেলাকে আমরা জীবন বলি তাহার সমগ্রটির দ্বারাই বাস্তবিক পক্ষে আত্মা আকৃষ্ট হয়, জীবনের সমস্ত চেষ্টা বাসনা, রাগ, দ্বেষ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, জীবনের সকল প্রকার বৈচিত্র্যই প্রকৃতপক্ষে আত্মাকে আকর্ষণ করে। আমাদের রাজসিক বাসনাময় আত্মার কাছে একঘেয়ে সুখ ভাল লাগে না; বিনাযুদ্ধে যে জয়লাভ, যে সুখে বিচ্ছেদ নাই, দুঃখের ছায়া নাই, এই সবে রাজসিক আত্মা বেশী দিন তৃপ্তি অনুভব করে না, শীঘ্রই এ সব অরুচি, ক্লান্তি ও অবসাদ আনয়ন করে; পশ্চাতে অন্ধকারের ছায়া না থাকিলে কোন আলোককে পূর্ণভাবে উপভোগ করা এরূপ আত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না; কারণ এরূপ আত্মা যে সুখ চায় ও উপভোগ করে তাহার স্বরূপই এই, তাহা আপেক্ষিক—তাহার বিপরীত দুঃখভোগের উপরেই সেই সুখভোগ নির্ভর করে—বিপরীত দুঃখের আস্বাদ-গ্রহণ না করিলে সে সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় না। আমাদের মন যে জীবনলীলায় সুখ পায় তাহার গূঢ় রহস্য এই যে আমাদের অন্তরাত্মা এই দ্বন্দ্বের খেলায় এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে।

মনকে যদি বলা যায় যে এই সব দ্বন্দ্ব ছাড়িয়া শুদ্ধ আনন্দময়

আত্মার অমিশ্র সুখের মধ্যে উঠিতে হইবে, তাহার সকল দ্বন্দ্বে এই শুদ্ধ আত্মাই তাহাকে শক্তি দিয়াছে, ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব সম্ভব করিয়াছে—তাহা হইলে মন তৎক্ষণাৎ সে ডাক হইতে পিছাইয়া পড়িবে। সে এরূপ শুদ্ধ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না; আর যদিই বা বিশ্বাস করে, তথাপি মনে করে যে সেরূপ উচ্চ অবস্থায় জীবন নাই, সংসারে যে বৈচিত্র্যময় খেলার সে রস পাইয়াছে ঐ উচ্চের অবস্থায় সেই রস নাই; সে অবস্থা আস্বাদহীন, অরুচিকর। অথবা সে অনুভব করে যে ঐ উচ্চ অবস্থায় উঠিতে যে কঠিন চেষ্টার প্রয়োজন, তাহা তাহার সামর্থ্যে কুলাইবে না; উপরে উঠিবার চেষ্টা হইতে সে পশ্চাৎপদ হয়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে বাসনাময় আত্মা যে সকল আশার স্বপ্ন দেখে সে সব সফল করা অপেক্ষা এই আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন মোটেই কঠিন নহে, অথবা এরূপ আত্মা তাহার বাসনার তৃপ্তির জন্য অস্থায়ী জিনিষের পশ্চাতে উন্মত্তভাবে ধাবমান হইয়া যে বিপুল উদ্যম ও চেষ্টা করে, বাস্তবিক পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে তাহা অপেক্ষা বেশী চেষ্টা বা কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। তাহার অনিচ্ছার প্রকৃত কারণ এই যে, সে যে অবস্থায় রহিয়াছে সে অবস্থা ছাড়াইয়া তাহাকে এমন এক উচ্চতর, শুদ্ধতর অবস্থায় উঠিতে বলা হইতেছে যেখানকার আনন্দের স্বরূপ সে বুঝে না, এমন কি তাহা যে সত্যই আছে তাহাও বেশ বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু তাহার নীচের অশুদ্ধ প্রকৃতির যে আনন্দ সেইটির

সহিতই সে পরিচিত, কেবল সেইটিকেই বেশ বুঝিতে পারে, ধরিতে পারে। এই নীচের অবস্থাতে যে আনন্দ তাহাও যে একেবারে দোষের বা অলাভের তাহা নহে; আমাদের প্রাকৃত সত্ত্বা (material being) তামসিক অজ্ঞান ও জড়তার একান্ত অধীন, এই অবস্থার উপরে আমাদের মানবীয় প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইলে রাজসিক দ্বন্দ্বময় জীবনের ভিতর দিয়া, বাসনাময় জীবনের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়; মানুষকে যে স্তরে স্তরে ক্রমান্বয়ে উঠিয়া পরম জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে হয়, সেই ঊর্দ্ধগমনেরই পথে ইহা রাজসিক স্তর। গীতাতে এই স্তরকেই "মধ্যমা গতিঃ" বলা হইয়াছে; কিন্তু, আমরা যদি চিরকাল এই স্তরেই পড়িয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের ঊর্দ্ধগমন, আত্মার পূর্ণ বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাত্ত্বিক সত্ত্বা ও স্বভাবের ভিতর দিয়া ত্রিগুণের অতীত অবস্থায় যাওয়াই আত্মার পূর্ণ পরিণতি লাভের পন্থা।

নীচের প্রকৃতির দ্বন্দ্বময় খেলা হইতে উপরে উঠিতে হইলে আমাদিগকে সমতার দিক দিয়াই যাইতে হইবে—মনের সমতা, চিত্তের সমতা, আত্মার সমতা—ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই। তবে মনে রাখা উচিত যে যদিও শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগকে নীচের প্রকৃতির তিন গুণের উপরে উঠিতে হইবে তথাপি প্রথম প্রথম আমাদিগকে এই তিন গুণের একটি না একটিকে আশ্রয় করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। সমতার আরম্ভ সাত্ত্বিক হইতে পারে, রাজসিক হইতে পারে অথবা তামসিকও হইতে

পারে; কারণ, মানবচরিত্রে তামসিক সমতারও সম্ভাবনা আছে। এই সমতা খাঁটি তামসিক হইতে পারে, প্রকৃতিগত জড়তার বশে জীবনের আনন্দ উপভোগে অনিচ্ছা, সংসারের সুখ দুঃখের আঘাতে অসাড়তা ইহা খাঁটি তামসিক সমতার লক্ষণ। আবার, কামনা উপভোগের সঞ্চিত ক্লান্তি হইতে সমতা আসিতে পারে, অথবা সংসারযুদ্ধে নিরাশ ও পরাভূত হইয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার প্রতি বিরাগ আসিতে পারে, সাংসারিক ব্যাপারে অবসাদ, ভয় বা আতঙ্ক আসিতে পারে; এরূপ ভাব মিশ্রিত ভাব, রজোতামসিক, তবে ইহার মধ্যে নিম্নতর গুণ তামসিকতাই প্রবল। আবার, তামসিক প্রকৃতির মধ্যে কিছু সাত্ত্বিক ভাবের দিকে ঝোঁক থাকিতে পারে, বুদ্ধি বিচারের দ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে যে জীবনের বাসনা সমূহের তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না, আত্মার এমন শক্তি নাই যে সংসারকে জয় করিতে পারে, সমস্ত জীবনটাই দুঃখময় ও অনিত্য, এখানে কোন সত্য নাই, আলোক নাই, সুখ নাই; এইরূপ ভাবকে সত্ত্বতামসিক সমতা বলা যাইতে পারে, ইহা প্রকৃত পক্ষে সমতা নয়, ইহা এক প্রকার উদাসীনতা, সবই সমান ভাবে পরিত্যাগ করা—তবে এইরূপ ভাব হইতে প্রকৃত সমতা আসিতে পারে। বস্তুতঃ তামসিক সমতা প্রকৃতির আত্মরক্ষণ নীতি, জুগুপ্সানীতি হইতে উদ্ভুত; সাধারণতঃ এই নীতির বশে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হইতে লোক স্বভাবতঃ সরিয়া থাকিতে চায়; কিন্তু, এই প্রবৃত্তির বশে যখন লোকে

সমস্ত প্রাকৃতিক জীবনকেই দুঃখময় ভাবিয়া তাহা হইতে সরিয়া থাকিতে চায়—আত্মা যে আনন্দ চায় সংসারে সে আনন্দ নাই, তাহার পরিবর্ত্তে শুধু যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা আছে এইরূপ মনোভাবে যে সমতা তাহাই তামসিক সমতা।

কেবল মাত্র তামসিক সমতাতেই প্রকৃত মুক্তি নাই; কিন্তু প্রকৃতির উপরে অবস্থিত অক্ষর আত্মার মহত্তর সত্তা, সত্যতর শক্তি, উচ্চতর আনন্দের উপলব্ধি করিয়া এই তামসিক সমতাকে যদি সাত্ত্বিক সমতাতে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আরম্ভ হিসাবে এইরূপ সমতার শক্তি খুব; ভারতের বৈরাগ্য ধর্ম্ম (Indian asceticism) এই মার্গই অবলম্বন করে। তবে এই ভাবের স্বাভাবিক ঝোঁক হইতেছে সন্ন্যাসের দিকে, সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার দিকে, কিন্তু গীতা যে ভিতরে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সংসারে থাকিয়াই নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছে সে দিকে ইহার ঝোঁক নহে। গীতা, কিন্তু, এরূপ তামসিক সমতাকেও স্থান দিয়াছে; সংসারের দোষ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ প্রভৃতির আলোচনা করিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হইবার অনুমতি গীতায় আছে, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্ (১৩।৮); এই পথে বুদ্ধের সাধনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ; জরাও মরণ হইতে মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই যাহারা আত্ম-সংযম অভ্যাস করিতে চায় গীতায় তাহাদের পন্থা পরিত্যক্ত হয় নাই, জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে। (৭।২৯) তবে

ইহা হইতে প্রকৃত কোন ফল লাভ করিতে হইলে এই সঙ্গে এক উচ্চতর অবস্থার সাত্ত্বিক উপলব্ধি চাই, এবং ভগবানে আনন্দ ও আশ্রয় গ্রহণ করা চাই, মাম্ আশ্রিত্য। তখন এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪।২০

আত্মা গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের অমৃত সত্তা উপভোগ করে। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণাকে বরণ করিতে যে তামসিক অনিচ্ছা তাহা মানুষকে অধোগামী ও দুর্ব্বলই করিয়া দেয়, এবং নির্ব্বিশেষে সকলকে সন্ন্যাস ও সংসার-বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া বিপজ্জনক, কারণ এরূপ শিক্ষার ফলে অনুপযুক্ত আত্মায় তামসিক দুর্ব্বলতা ও তামসিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হয়, "বুদ্ধিভেদম্ জনয়েৎ", উচ্চতর অবস্থা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য যখন আত্মার হয় নাই, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করিবার নিমিত্ত, আত্মার কল্যাণেরই নিমিত্ত যে রাজসিক চেষ্টা ও দ্বন্দ্ব প্রয়োজন তাহা দমাইয়া দেওয়া হয়, জীবনের প্রতি ভালবাসা, ধৃতি ও উৎসাহ কমাইয়া দিয়া আত্মার অনিষ্টই করা হয়। কিন্তু, যে সকল আত্মা উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এরূপ তামসিক বৈরাগ্য উপকারী হইতে পারে; তাহাদের যে রাজসিক বাসনা ও নিম্নস্তরের জীবনের প্রতি তীব্র আগ্রহ তাহাদের সাত্ত্বিক উচ্চজীবন লাভের অন্তরায়, এই

তামসিক বৈরাগ্য দ্বারা তাহা বিনষ্ট হয়। এইরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা তাহারা নিজেদের জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে, সেই অবস্থায় তাহারা ভগবানের ডাক শুনিতে পায়—"অনিত্যমসুখং লোকমিমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্"—"এই অনিত্য ও দুঃখময় সংসারে কে রহিয়াছ, এস, আমাতে আনন্দ গ্রহণ কর।"

তথাপি এই সমতা সংসারের সকল জিনিষেরই প্রতি সমান বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; এইরূপে সংসার হইতে সরিয়া আসিয়া উদাসীন হইয়া থাকা যায় কিন্তু ইহার মধ্যে সে শক্তি নাই যাহার দ্বারা সংসারের সকল প্রকার সুখ ও দুঃখের স্পর্শ সমান ভাবে অনাসক্তি ও নির্ব্বিকারতার সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে; এইরূপ অনাসক্ত ও নির্ব্বিকার চিত্তে সংসারের সকল সুখ দুঃখ গ্রহণ করা গীতোক্ত সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ। অতএব যদি আমরা তামসিক বৈরাগ্য লইয়াই আরম্ভ করি, সেটা শুধু উচ্চতর সাধনায় আমাদিগকে প্রথমে প্রবৃত্ত করিবার জন্য, কিন্তু চিরকাল বিষাদে নিমগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য নহে। আর, এই উচ্চ সাধনা আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে যে তামসিক বৈরাগ্য অবলম্বন করিতেই হইবে এমনও কোনও কথা নাই। আমরা প্রথমে যে সকল জিনিষ হইতে পলাইয়া যাইতে চাই, যখন সে সকল জিনিষকে জয় করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা করিব তখনই প্রকৃত সাধনার আরম্ভ হইবে। এইখানেই এক প্রকার রাজসিক সমতা সম্ভব হয়; চিত্তবিক্ষোভ ও দুর্ব্বলতার উপরে উঠিতে,

আত্মসংযম, আত্মজয় করিতে শক্তিশালী লোক যে গর্ব্ব অনুভব করে তাহা এই রাজসিক সমতার নিম্নতম অবস্থা; এই মনোভাব হইতে আরম্ভ করিয়া এবং ইহাকে মূলসূত্র ধরিয়া নীচের প্রকৃতির সকল দুর্ব্বলতার বশ্যতা হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিবার যে সাধনা তাহাই স্টোয়িক আদর্শ (Stoic ideal)। তামসিক বৈরাগ্য যেমন প্রকৃতির আত্মরক্ষণ নীতির, জুগুপ্সা-নীতির পরিণাম, রাজসিক উর্দ্ধমুখী সাধনাও তেমনি প্রকৃতির যুদ্ধ ও চেষ্টার প্রবৃত্তির, প্রভুত্ব ও জয়ের দিকে মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁকের পরিণাম; তবে কেবলমাত্র যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জয় সম্ভব সেই ক্ষেত্রেই এই যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়। আমরা সাধারণ চেষ্টায় দুই এক বিষয়ে সাময়িক ভাবে জয়লাভ করিতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ না আমরা আমাদের অন্তর্প্রকৃতিকে জয় করিতে পারিতেছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কোন জয়ই সম্পূর্ণ বা নিশ্চিত নহে। তাই সাধক নানা বিক্ষিপ্ত বাহ্যিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে এবং সাময়িক সাফল্য ও জয় লাভ করিতে চেষ্টা না করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনা ও অন্তর্জয়ের দ্বারা একেবারে প্রকৃতিকে এবং জগৎকে জয় করিতে চায়। তামসিক বৈরাগ্য সংসারের সুখ ও দুঃখ উভয় হইতেই সরিয়া পলাইতে চায়; রাজসিক সাধনা তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে সহ্য করিতে, জয় করিতে, তাহাদের উপরে উঠিতে চায়। মহাভারতে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেমন লৌহ ভীমকে আলিঙ্গনের মধ্যে টানিয়া লইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিই

ষ্টোয়িক সাধনা কুস্তিগিরের ন্যায় বাসনা ও রিপুগণকে আলিঙ্গনের ভিতর লইয়া তাহাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। যে সকল সুখের বা দুঃখের জিনিষ শরীর ও মনের চাঞ্চল্যের কারণ, ষ্টোয়িক সাধক তাহাদের আঘাত সমান ভাবে সহ্য করে ; এই সাধনা তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন আত্মা কিছুতে ক্লিষ্ট বা আকৃষ্ট না হইয়া, কোনরূপ উত্তেজিত বা ব্যথিত না হইয়া সকল প্রকার বাহ্যস্পর্শ সহ্য করিতে পারে। এই সাধনা চায় যে মানুষ তাহার প্রকৃতিকে জয় করুক, প্রকৃতির প্রভু হউক।

গীতা অর্জ্জুনের ক্ষাত্র স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া এই বীরোচিত সাধনার কথাই প্রথমে বলিয়াছে। পরম শত্রু বাসনাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিতে বলা হইয়াছে। গীতা সমতার যে প্রথম বর্ণনা দিয়াছে তাহা ষ্টোয়িক আদর্শের সমতা।

দুঃখেষ্বনুদ্‌বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ২।৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ২।৫৭

"যাঁহার মন দুঃখের মাঝে অবিচলিত এবং সুখের মাঝে স্পৃহাশূন্য, যাঁহা হইতে আসক্তি ও ক্রোধ ও ভয় দূর হইয়াছে, সেইরূপ মুনিকেই স্থিতধী বলা হয়। যিনি সর্ব্ব বিষয়ে স্নেহশূন্য, ইহা শুভ উহা অশুভ বলিয়া যিনি আনন্দিত হন না বা দ্বেষ করেন না তাঁহার বুদ্ধি জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত।" গীতা একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছে যদি কেহ আহার করিতে নিবৃত্ত

হয়, তাহা হইলে বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয় না বটে ; কিন্তু বস্তুতে ইন্দ্রিয়ের যে লালসা, "রস", তাহা থাকিয়াই যায় ; কেবল যখন বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াও ইন্দ্রিয় বাহ্য ভোগের জন্য লালায়িত হয় না, আস্বাদ-সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, শুধু তখনই হয় আত্মার উচ্চতম অবস্থা। রাগ, দ্বেষ হইতে মুক্ত, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা বিষয়ের উপর বিচরণ করিয়াই আত্মার ও প্রকৃতির উদার ও মধুর স্বচ্ছতা লাভ হয়, সেখানে শোক বা দুঃখের কোন স্থান নাই।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২।৬৪

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। ২।৬৫

যেমন নদীর জল সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না, সেইরূপে বাসনা সমূহ আত্মায় প্রবেশ করিবে অথচ আত্মা তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইবে না ; এইরূপে অবশেষে সমস্ত বাসনা বর্জ্জন করা যায়। ক্রোধ ও বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হওয়া, রাগ, দ্বেষ, ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যে মুক্ত অবস্থার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা পুনঃ পুনঃ বিশেষ জোর দিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইহার জন্য আমাদিগকে এই সকলের বেগ সহ্য করিতে শিখিতেই হইবে, কিন্তু ইহাদের কারণের সম্মুখীন না হইলে, বিষয় হইতে পলায়ন করিলে তাহা কখনই সম্ভব হয় না।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।

কাম ক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ৫।২৩

"এই সংসারে, এই দেহেই যিনি কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন তিনিই যোগী, তিনিই সুখী।" ইহার উপায় হইতেছে "তিতিক্ষা"—সহ্য করিবার সঙ্কল্প ও শক্তি।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ২।১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ২।১৫

"বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শই শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখের কারণ, এই সকল স্পর্শ আসে যায়, অনিত্য, ইহাদিগকে সহ্য করিতে শিক্ষা কর। কারণ যে ব্যক্তি এই সকল বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে ব্যথিত বা বিচলিত হন না, যে ধীর ও জ্ঞানী ব্যক্তি সুখে দুঃখে সমান, তিনিই অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হন।" যাঁহার আত্মা সমভাবাপন্ন (equal souled) তিনি দুঃখ সহ্য করেন কিন্তু দ্বেষ করেন না, তিনি সুখ গ্রহণ করেন কিন্তু উল্লসিত হন না। এমন কি সহিষ্ণুতার দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণাকেও জয় করিতে হইবে এবং ইহাও স্তোয়িক (stoic) সাধনার অঙ্গ। জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা হইতে পলায়ন করা হইবে না, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে নিতান্ত

তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জয় করিতে হইবে *। প্রকৃতির নীচের খেলা মায়ার রূপ সকল হইতে ভয়ে পলায়ন করা নহে, কিন্তু সে সবের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে জয় করাই তেজস্বী পুরুষ সিংহের (পুরুষর্ষভ) প্রকৃত স্বভাব। এইরূপে বাধ্য হইয়া প্রকৃতি তাহার মায়ার আবরণ খুলিয়া ফেলে, পুরুষ যে মুক্ত আত্মা, তাহার সেই প্রকৃত স্বরূপ পুরুষকে দেখাইয়া দেয়—পুরুষ তখন বুঝিতে পারে যে সে প্রকৃতির দাস নহে, সে প্রকৃতির অধীশ্বর, স্বরাট, স্বম্রাট।

কিন্তু, গীতা এই স্তোয়িক (Stoic) সাধনা, এই বীরোচিত আদর্শ শুধু সেই সর্ত্তে স্বীকার করিয়াছে, যে সর্ত্তে গীতা তামসিক বৈরাগ্যও স্বীকার করিয়াছে,—ইহার উপরে থাকা চাই জ্ঞানের সাত্ত্বিক দৃষ্টি, ইহার মূলে থাকা চাই আত্মস্বরূপ-লাভের লক্ষ্য, এবং ইহার গতি হওয়া চাই ঊর্দ্ধে দিব্যজীবন লাভের দিকে অগ্রসর-হওয়া। যে স্তোয়িক সাধনা কেবল মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলবৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেয়, তাহা তামসিক ক্লান্তি, নিস্ফল বিষাদ এবং বন্ধ্যা জড়তা হইতে কম বিপজ্জনক বটে কিন্তু তাহা একেবারে অমিশ্র মঙ্গল নহে কারণ তাহা হইতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক মুক্তি না আসিয়া কেবল হৃদয়হীনতা এবং নিষ্ঠুর উদাসীনতা আসিতে পারে।

* গীতা বলিয়াছে, ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি; তেজস্বী ও জ্ঞানী পুরুষ তাহাদ্বারা ব্যথিত হয় না, বিচলিত হয় না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় না। কিন্তু তাহাদিগকে স্বীকার করা হয়, জয় করিবার জন্যই, জরামরণমোক্ষায় যতন্তি।

গীতার সাধনায় স্তোয়িক সমতা সমর্থিত হইয়াছে শুধু এইজন্য যে এইরূপ সমতার সহিত আত্মার অক্ষরাবস্থার একটা সম্বন্ধ পাওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ সমতার সাহায্যে সেই মুক্ত অক্ষর আত্মার স্বরূপ বুঝিবার (পরং দ্রষ্ট্বা) এবং সেই নূতন আত্মজ্ঞানে স্থিতি লাভ করিবার (এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ) সহায়তা হইতে পারে।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। ৩।৪৩

"বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, আত্মাকে আত্মশক্তির প্রয়োগেই ধীর ও নিশ্চল কর এবং দুর্নিবার শত্রু কামকে বিনাশ কর।" সাত্ত্বিকতার ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞানলাভই যখন লক্ষ্য শুধু তখনই তাহার সহায় স্বরূপ তামসিক বৈরাগ্য বা রাজসিক জয়ের সার্থকতা আছে, নতুবা তাহাদের সমর্থন করা যায় না।

দার্শনিক, মণীষী, জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল পরিণামেই সত্ত্বগুণের উপর নির্ভর করেন না. কিন্তু প্রথম হইতেই তাঁহার প্রকৃতির সাত্ত্বিকতার সাহায্যে আত্মজয়ের সাধনা করেন। সাত্ত্বিক সমতা হইতেই তাঁহার সাধনা আরম্ভ। তিনিও লক্ষ্য করেন যে বাহ্য ও জড় জগৎ অনিত্য, তাহা হইতে বাসনার তৃপ্তি হয় না, বা প্রকৃত আনন্দলাভ করা যায় না, কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে শোক, ভয় বা নিরাশার উদয় হয় না। তিনি শান্ত বিচার-

বুদ্ধির দৃষ্টিতে সব দেখেন এবং দ্বেষ বা মোহের বশীভূত না হইয়া নিজের অভীষ্ট নির্ণয় করেন।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ৫।২২

"বস্তুর সংস্পর্শ হইতে যে সকল ভোগসুখ উৎপন্ন হয় সে সকল পরিণামে দুঃখের কারণ, তাহাদের আদি আছে, অন্ত আছে; অতএব যিনি জ্ঞানী, যাঁহার বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে (বুধঃ) তিনি সে সকল ভোগে আনন্দ লাভ করেন না।" "তাঁহার আত্মা বাহ্য বস্তুর স্পর্শে আসক্ত হয় না; তিনি আপনাতেই আপনার আনন্দের সন্ধান পান"।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্। ৫।২১

তিনি বুঝিতে পারেন যে তিনি নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু, আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ (৬।৫), অতএব তিনি নিজের প্রভুত্ব বর্জন করিয়া নিজেকে কাম, ক্রোধাদির হস্তে ছাড়িয়া দেন না, নাত্মানমবসাদয়েৎ, কিন্তু, নিজের আভ্যন্তরীন শক্তির সাহায্যে কামক্রোধাদির বশ্যতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করেন, উদ্ধরেদাত্মনাত্মনং; কারণ যিনি নিজের মধ্যে অবিদ্যার খেলাকে, নীচের অশুদ্ধ আত্মাকে জয় করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পান যে তাঁহার শুদ্ধ আত্মার মত তাঁহার পরম বন্ধু ও সহায় আর কেহ নাই, বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ (৬।৬)। তিনি হন

জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, সাত্ত্বিক সমতার দ্বারা যোগী *, তিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদৃষ্টি সম্পন্ন, তিনি শীত উষ্ণে, সুখ দুঃখে, মান অপমানে সমভাবাপন্ন ও প্রশান্ত।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৬।৮

শত্রু, মিত্র, উদাসীন মধ্যস্থ সকলের প্রতিই তাঁহার সমভাব, কারণ তিনি দেখেন যে এই সকল সম্বন্ধ অনিত্য, জীবনের চিরপরিবর্ত্তনশীল অবস্থা হইতে এই সকল সম্বন্ধের উৎপত্তি। এমন কি বিদ্যার, শুদ্ধতার, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষ যে ছোট বড়, উচ্চ নীচ বিচার করে, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে বিভ্রান্ত হন না। সাধু ও অসাধুর প্রতি, পুণ্যবান, বিদ্বান, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ এবং পতিত চণ্ডালের প্রতি—সকলের প্রতিই তিনি সমবুদ্ধি সম্পন্ন। গীতা এইরূপে সাত্ত্বিক সমতার বর্ণনা করিয়াছে; বিজ্ঞ ব্যক্তির যে শান্ত জ্ঞানসম্মত সমতার সহিত জগৎ পরিচিত, গীতার এই সাত্ত্বিক সমতার বর্ণনায় তাহার সারটুকু সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

তাহা হইলে এই সমতা এবং গীতা যে বৃহত্তর সমতার শিক্ষা দিয়াছে এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? বিচার বিতর্কের দ্বারা যে বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান পাওয়া যায় তাহার সহিত আধ্যাত্মিক বৈদান্তিক জ্ঞানের যে প্রভেদ, এই দুই সমতার মধ্যেও সেই প্রভেদ; এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপরে,

---

* কারণ সমতাই যোগ, সমত্বম্ যোগ উচ্যতে (২।৪৮)।

বৈদান্তিক ঐক্যজ্ঞানের উপরেই গীতাশিক্ষার ভিত্তি। দার্শনিক পণ্ডিতগণ সাধারণ মনবুদ্ধির দ্বারা বিচার বিতর্ক করিয়া ভিতরে সমভাব রক্ষা করেন ; কিন্তু, সমতার শুধু এইরূপ ভিত্তি মোটেই দৃঢ় নহে। কারণ, যদিও দার্শনিক বিজ্ঞব্যক্তি সতত সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া অথবা নিজের মনের অভ্যাসের দ্বারা নিজেকে নিজের বশে রাখেন, তথাপি বাস্তবিক পক্ষে তিনি তাঁহার নীচের প্রকৃতি হইতে মুক্ত নহেন, নানাদিক দিয়া নানাভাবে এই নীচের প্রকৃতি তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাকে প্রত্যাখ্যান ও দমন করা হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতি যে কোন মুহূর্ত্তে সুযোগ পাইয়া হঠাৎ ভীষণ প্রতিশোধ লইতে পারে। কারণ, নীচের প্রকৃতির খেলা সকল সময়েই ত্রিধা খেলা, সত্ত্ব, রজঃ, তমের খেলা, এবং সাত্ত্বিক মনুষ্যকে কবলিত করিবার জন্য রজঃ ও তমঃ সতত ওৎ পাতিয়া থাকে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ২।৬০

"সিদ্ধিলাভে যত্নশীল জ্ঞানী ব্যক্তির মনকেও প্রবল বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক হরণ করে।" সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হইতে হইলে সত্ত্বগুণের উপরে, বুদ্ধির উপরে (বুদ্ধেঃ পরং) যে আত্মপুরুষ রহিয়াছে তাহার আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন আর অন্য উপায় কিছু নাই—ঐ আত্মপুরুষ দার্শনিকের মনোময় পুরুষ নহে কিন্তু দিব্য ঋষির বিজ্ঞানময় পুরুষ ; উহা গুণত্রয়ের

অতীত। সকল সাধনার উদ্‌যাপন করিতে হইবে উর্দ্ধের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে দিব্য জন্মলাভ করিয়া।

দার্শনিক জ্ঞানীর যে সমতা তাহা স্তোয়িক সাধকের সমতার ন্যায়, বা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সমতার ন্যায়ই মানুষ হইতে স্বতন্ত্র ও দূরে নিজের মধ্যেই নিজে থাকার নির্জ্জন সমতা; কিন্তু যে ব্যক্তি দিব্য জন্মলাভ করিয়াছেন তিনি শুধু নিজের মধ্যেই নহে, কিন্তু সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সকলের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অতএব তাঁহার সমতা সহানুভূতি ও ঐক্যে পরিপূর্ণ। তিনি সকলকে নিজের সহিত অভিন্ন দেখেন এবং নিজের একক মুক্তির জন্য মোটেই ব্যগ্র নহেন; বরং তিনি অপরের সুখদুঃখের বোঝা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লন, যদিও তিনি নিজে সে সুখ দুঃখের দ্বারা বিচলিত বা বশীভূত হন না। গীতা একাধিকবার বলিয়াছে যে সিদ্ধ ঋষিগণ সর্ব্বদা উদার সমতার সহিত সকলের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন, এইরূপ হিতসাধনেই তিনি কাজ পান, আনন্দ পান, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। পরম সিদ্ধ যোগী কেবল উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে বাস করিয়া নির্জ্জনে আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন না, পরন্তু তিনি যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, জগতের মঙ্গলের জন্য, জগতের মধ্যেই যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার জন্য, তিনি সর্ব্বকর্ম্মকারী, সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মী। কারণ তিনি যেমন একজন ঋষি, একজন যোগী তেমনই আবার তিনি একজন ভক্ত, একজন ভাগবতপ্রেমিক ও

ভক্ত সেবক—তিনি ভগবানকে যেখানে দেখেন সেইখানেই ভালবাসেন এবং তিনি সর্ব্বত্রই ভগবানকে দেখিতে পান; আবার, তিনি যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে সেবা করিতে তিনি বিমুখ হন না; তাঁহার কর্ম্ম তাঁহাকে মিলনসুখ হইতেও বঞ্চিত করে না, কারণ তাঁহার সকল কর্ম্ম তাঁহার হৃদিস্থিত ভগবান হইতেই উত্থিত হয় এবং সর্ব্বভূতে যে এক ভগবান বিরাজিত রহিয়াছেন তাঁহারই উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। গীতার সমতা উচ্চ, উদার সমতা, এই সমতায় সকলকেই ভাগবত সত্তা ও ভাগবত প্রকৃতির একত্বের মধ্যে উত্তোলিত করা হয়।

বিংশ অধ্যায়

সমতা ও জ্ঞান

গীতাশিক্ষার এই গোড়ার দিকে যোগ ও জ্ঞান আত্মার ঊর্দ্ধগমনের দুই পক্ষস্বরূপ। বাসনাশূন্য হইয়া, সকল বস্তু ও সকল লোকের প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্বরূপ [illegible] কর্ম্ম করা যায় সেই কর্ম্মের ভিতর দিয়া মিলনই যোগ, আর যাহা এই বাসনাশূন্যতা, এই সমতা, এই যজ্ঞশক্তির ভিত্তি তাহাই জ্ঞান। বস্তুতঃ এই দুই পক্ষই পরস্পরকে উড়িতে সাহায্য করে; মানুষের দুইটি চক্ষু যেমন একের পর একটি দেখে বলিয়াই একই সঙ্গে দেখিতে পারে, তেমনিই যোগ ও জ্ঞান সূক্ষ্মভাবে ক্রমান্বয়ে পরস্পরকে সাহায্যপূর্ব্বক একই সঙ্গে কার্য্য করিয়া পরস্পরকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করে। কর্ম্ম যেমন ক্রমশঃ বেশী বেশী নিষ্কাম হয়, সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, যজ্ঞভাবাপন্ন হয়, তেমনিই জ্ঞানও বর্দ্ধিত হইতে থাকে; আবার জ্ঞান যেমন বর্দ্ধিত হয় সেই সঙ্গে আত্মাও বাসনাশূন্যতায়, যজ্ঞার্থে কর্ম্মের সমতায় দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই গীতা বলিয়াছে যে সকল প্রকার দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ বড় (৪।৩৪)।

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি। ৪।৩৬

* * * *

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। ৪।৩৯

"যদি তুমি সমুদয় পাপী অপেক্ষাও অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা সমুদয় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে। ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।" জ্ঞানের দ্বারা কাম এবং কামের জ্যেষ্ঠ সন্তান পাপ ধ্বংস হয়। মুক্ত মানব যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে পারেন কারণ তাঁহার মন, চিত্ত ও আত্মা আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, গতসঙ্গস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (৪।২৩)। তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইবামাত্র ফুরাইয়া যায়, ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, প্রবিলীয়তে: সে কর্ম্ম তাঁহার আত্মার উপর কোন প্রতিক্রিয়ার ফল রাখিয়া যায় না, কোন দাগ বা সংস্কার রাখিয়া যায় না। তাঁহার স্বভাবের ভিতর দিয়া ভগবানই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সেই কর্ম্ম মানুষের নিজের নহে, মানুষ কেবল যন্ত্রমাত্র। কর্ম্মটিও তখন হয় ব্রহ্মসত্তারই শক্তি (৪।২৪)।

এই অর্থেই গীতা বলিয়াছে যে, সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত হয়, সম্পূর্ণ হয় জ্ঞানে, সর্ব্বং কর্ম্মাখিলম্ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৪।৩৮

"প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।" ইহার দ্বারা মোটেই বোঝায় না যে যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তখন কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়। ইহার প্রকৃত অর্থ গীতা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে—

যোগ সংন্যস্ত কর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪।৪২

যিনি জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় নষ্ট করিয়াছেন এবং যোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মাকে পাইয়াছেন, সেরূপ ব্যক্তি নিজের কর্ম্মরাশির দ্বারা বদ্ধ হয় না। আর এক স্থানে গীতা বলিয়াছে, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে (৫।৭)—যাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মা হইয়াছে, তিনি কর্ম্ম করেন কিন্তু সে কর্ম্ম তাহাকে স্পর্শ করে না, তিনি সেই কর্ম্মের জালে বদ্ধ হন্ না, তাঁহার আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে এমন কোন প্রতিক্রিয়া ঐ কর্ম্ম হইতে সৃষ্টি হয় না, কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। অতএব, গীতার মতে বাহ্য কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ ভাল, কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে (৫।২), কারণ দেহবান লোককে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতেই হয় এবং সেই জন্য তাহাদের পক্ষে বাহ্যকর্ম্ম সন্ন্যাস কঠিন ব্যাপার, দুঃখমাপ্তুম্ কিন্তু, অন্যদিকে কর্ম্মযোগই যথেষ্ট, কর্ম্মযোগ সহজে এবং দ্রুতগতিতে জীবকে ব্রহ্মে লইয়া আসিতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে এই কর্ম্ম-

যোগ হইতেছে সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা; ইহাতে বাহিরে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় না, কেবল ভিতরে ত্যাগ করিতে হয়, শারীরিক কর্ম্মত্যাগ নহে, আধ্যাত্মিক ভাবে সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে, পরমেশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি (৫।১০), ময়ি সংন্যস্য (৩।৩০)। এইরূপে কর্ম্মরাশি যখন ব্রহ্মে সংন্যস্ত হয়, তখন যন্ত্রের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বা ব্যক্তিত্ব কিছু থাকে না; সে কর্ম্ম করিয়াও কিছু করে না; কারণ সে শুধু কর্ম্মফল ত্যাগ করে নাই কিন্তু সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছে। তখন ভগবান স্বয়ং তাহার নিকট হইতে তাহার কর্ম্মের বোঝা তুলিয়া লইয়াছেন; পরমেশ্বরই তখন কর্ত্তা, কর্ম্ম এবং ফল সবই হইয়াছেন।

গীতা এই যে জ্ঞানের কথা বলিয়াছে ইহা মানসিক বুদ্ধি বিচারের ক্রিয়া নহে; সত্যের * দিব্য সূর্য্যালোকে বর্দ্ধিত আত্মার উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্তিকেই গীতাতে জ্ঞান নাম দেওয়া হইয়াছে। দুঃখদ্বন্দ্বময় অশান্ত নীচের প্রকৃতি হইতে বহু উর্দ্ধে, নির্ম্মল অধ্যাত্ম আকাশে অক্ষর ব্রহ্ম বিরাজিত, এখানকার পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, পুণ্যও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, আমাদের পাপের বোধও তিনি গ্রহণ করেন না, পুণ্যের বোধও গ্রহণ করেন না; নীচের প্রকৃতির সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, আমাদের জয়েতে যে সুখ তাহাতেও তিনি উদাসীন, আমাদের পরাজয় যে দুঃখ তাহাতেও তিনি উদাসীন; তিনি

* এই সত্য সম্বন্ধেই ঋগ্বেদ বলিয়াছে :—"তৎ সত্যম্ সূর্য্যম্ তমসি ক্ষীয়ন্তম্", আমাদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের আবরণে লুক্কায়িত সূর্য্যই সেই সত্য।

শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বব্যাপী, প্রভু বিভু, শান্ত, তেজস্বী, শুদ্ধ, সর্ব্ববস্তুতে সমান, প্রকৃতির মূল ; তিনি সাক্ষাৎভাবে আমাদের কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, কিন্তু প্রকৃতি ও প্রকৃতির কর্ম্মের সাক্ষী ; কর্ত্ত বলিয়া আমাদের যে ভ্রম এই ভ্রমও তাঁহার দেওয়া নহে, নীচের প্রকৃতির অজ্ঞান হইতে এই ভ্রমের উৎপত্তি। কিন্তু এই মুক্তা অবস্থা, এই ঈশ্বরত্ব, এই শুদ্ধতা আমরা দেখিতে পাই না ; প্রকৃতি-গত অজ্ঞানের দ্বারা আমরা মোহগ্রস্ত, তাই আমাদের অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের যে সনাতন আত্মজ্ঞান লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না, অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ কিন্তু, যাঁহারা অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত জ্ঞানের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট জ্ঞান আসিয়া তাঁহাদের প্রকৃতিগত অজ্ঞান দূর করিয়া দেয় ; বহুকাল লুক্কায়িত সূর্য্যের ন্যায় এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং এই নীচের প্রকৃতির উপরে অবস্থিত পরম ব্রহ্ম সত্ত্বাকে আমাদের নিকট উদ্ভাসিত করে,—

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্॥ ৫।১৬

বহুকাল একাগ্রভাবে সাধনা করিয়া, আমাদের সমুদয় চেতন সত্ত্বাকে তদভিমুখী করিয়া, তাহাকেই আমাদের সমগ্র লক্ষ্য করিয়া, আমাদের বুদ্ধির একমাত্র বিষয় করিয়া এবং এইরূপে শুধু আমাদের মধ্যেই নহে কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাকে দেখিয়া

আমরা তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মনঃ হই, জ্ঞানরূপ সলিলের * দ্বারা আমাদের নীচের প্রকৃতির সমস্ত দুঃখ, পাপ ও অজ্ঞান ধৌত করিয়া লই।

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠা স্তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ॥ ৫।১৭

ইহার ফল হয় এই যে সকল বস্তু ও সকল ব্যক্তির প্রতি পূর্ণ সমভাব হয়, গীতা বলিয়াছে ; কেবল তখনই আমরা আমাদের কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পারি। কারণ, ব্রহ্ম সমস্বরূপ, সমম্ ব্রহ্ম,—যখন আমাদের এইরূপ পূর্ণ সমভাব হয়, সাম্যে স্থিতং মনঃ, যখন আমরা বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে সমদর্শী হই, এবং সকলকে এক ব্রহ্ম বলিয়া জানি, কেবল তখনই সেই একত্বের মধ্যে বাস করিয়া আমরা ব্রহ্মের মতই দেখিতে পারি যে আমাদের কর্ম্ম সমূহ প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত হইতেছে, তখন আর আসক্তি, পাপ বা বন্ধনের ভয় থাকে না। তখন আর দোষ বা পাপ হইতে পারে না ; কারণ তখন আমরা কামনা ও কামনাজাত কর্ম্ম ও সংস্কারপূর্ণ সংসারকে জয় করিয়াছি, জ্ঞানলাভ করায় এই সকল অজ্ঞানের খেলা জয় করিয়াছি, তৈর্জিত সর্গঃ, এবং পরম দিব্য প্রকৃতির মধ্যে বাস করায় তখন আর আমাদের

* ঋগ্বেদ এইরূপে সত্যের স্রোতধারার কথা বলিয়াছে, এই জলে পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান, এই জল দিব্য সূর্য্যালোকে পরিপূর্ণ, ঋতস্য ধারাঃ, আপো বিচেতসঃ, সর্ব্বতীর আপঃ। এখানে যাহা উপমা মাত্র, বেদে তাহা স্থূলরূপক।

কর্ম্মে কোন দোষ বা ত্রুটি নাই ; কারণ এই সমস্ত দোষ ত্রুটি অজ্ঞানের অসমতা হইতেই উদ্ভূত। সমান ব্রহ্ম দোষশূন্য, নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম, পাপপুণ্যের গণ্ডগোলের উপরে ; ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিয়া আমরাও পাপ পুণ্যের উপরে উঠি ; আমরা সেই পবিত্র, নির্ম্মলভাবে, সমতার সহিত, সর্ব্বভূতের হিত-কামনাকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করি, ক্ষীণকল্মষাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। আমাদের অজ্ঞানের অবস্থাতেও আমাদের হৃদিস্থিত ঈশ্বরই আমাদের কর্ম্মের কারণ, তবে তিনি তাঁহার মায়ার ভিতর দিয়া, আমাদের নীচের প্রকৃতির অহঙ্কারের ভিতর দিয়া আমাদিগকে পরিচালিত করেন * ; এই অহঙ্কারই আমাদের কর্ম্মবন্ধনের সৃষ্টি করে, আমাদের উপর কর্ম্মের ফল টানিয়া আনে, অন্তরে পাপ পুণ্যের ভাব সৃষ্টি করে, বাহিরে সুখ দুঃখ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করে, ইহাই কর্ম্মের বিরাট শৃঙ্খল। যখন জ্ঞানের দ্বারা আমরা এই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হই, তখন ঈশ্বর আর গুপ্তভাবে থাকেন না, আমাদের পরম আত্মারূপে সাক্ষাৎভাবে আমাদের সমুদয় কর্ম্ম গ্রহণ করেন, জগতের হিত সাধনের নিমিত্ত আমাদিগকে নির্দ্দোষ যন্ত্রভাবে, নিমিত্তমাত্রম্, ব্যবহার করেন। জ্ঞান ও সমতার নিগূঢ় মিলন এইরূপই ; নীচের বুদ্ধিতে জ্ঞান প্রকৃতির সমভাবরূপে প্রতি-

---

* ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

ফলিত; ঊর্দ্ধে, চেতনার উচ্চভূমিতে, জ্ঞান সত্ত্বার আলোক এবং সমতা প্রকৃতির উপাদান।

এই "জ্ঞান" শব্দটি ভারতীয় দর্শন ও যোগশাস্ত্রে সর্ব্বত্র পরম আত্মজ্ঞানের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; যে আলোকের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া আমরা আমাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হই তাহাই জ্ঞান; যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা নানা বিষয় জানিতে পারি, নানাদিক হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের মনের ভাণ্ডার পূর্ণ করি, ভারতীয় শাস্ত্রে তাহাকে জ্ঞান বলা হয় নাই; পাশ্চাত্যদেশে জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সৌন্দর্য্যনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিই জ্ঞান বলিয়া পরিচিত, ভারতে জ্ঞান বলিতে এ সব বুঝায় না। এই সব জ্ঞানের দ্বারাও যে আত্মার উন্নতির সাহায্য হয় তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে এ সব জীবনের লীলাতে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু আত্মস্বরূপলাভে কোন সাহায্য করিতে পারে না। যৌগিক জ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যে এই সব জ্ঞান তখনই স্থান পায় যখন পরমবস্তুকে, আত্মাকে, ভগবানকে জানিবার জন্য আমরা ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করি; যখন জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জগতের বাহ্য দৃশ্য ও ঘটনাবলীর রহস্য ভেদ করি এবং তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের কারণ স্বরূপ যে এক সত্য বস্তু রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাই,—যখন মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অন্তরকে বুঝিতে পারি, আমাদের ভিতর নীচের খেলা ও উপরের খেলার প্রভেদ, অপরা প্রকৃতি ও পরা

প্রকৃতির প্রভেদ বুঝিতে পারি এবং একটিকে বর্জ্জন করিয়া অপরটিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি,—যখন দর্শন শাস্ত্রের আলোকে আমরা জগতের মূলতত্ত্বগুলি জানিতে পারি এবং যাহা সৎ, যাহা নিত্য তাহার মধ্যে বাস করিতে পারি,—যখন নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা পাপ পুণ্যের প্রভেদ বুঝিতে পারি এবং পাপকে বর্জ্জন করিয়া, পুণ্যেরও উপরে উঠিয়া দিব্য প্রকৃতির শুদ্ধ পবিত্রতার মধ্যে বাস করিতে পারি, যখন কলাবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দিব্য সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাই,—যখন সাংসারিক জ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই যে ভগবান তাঁহার জীবগণকে লইয়া কি খেলা করিতেছেন এবং মানুষের সেবার ভিতর দিয়া ভগবানেরই সেবা করিতে এই জ্ঞান লাগাইতে পারি,—কেবল তখনই এই সকল জ্ঞানকে যৌগিক জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তখনও এই সব জ্ঞান কেবলমাত্র সহায়তাই করিতে পারে; প্রকৃত যে জ্ঞান, তাহা মনের অগোচর, মন কেবল তাহার ছায়ামাত্র পাইতে পারে, সে জ্ঞানের স্থান হইতেছে আত্মায়।

কিরূপে এই জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি সে সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছে যে এই জ্ঞানের প্রথম দীক্ষা লাভ করিতে হয় তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণের নিকট,—যাঁহারা শুধু বিচার বিতর্ক করিয়া নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ (৪।৩৫); কিন্তু, এই জ্ঞান প্রকৃত ভাবে লাভ করা যায় নিজেদের ভিতর হইতেই—"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালে-

নাত্মনি বিন্দতি” (৪।৩৯)—যে ব্যক্তি যোগের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন তিনি সেই জ্ঞান যথাসময়ে স্বীয় অন্তঃকরণে স্বয়ংই লাভ করেন, অর্থাৎ এই জ্ঞান ভিতর হইতে গড়িয়া উঠে, এবং তিনি বাসনাশূন্যতায়, সমতায়, ভগবদ্ভক্তিতে যত বাড়িয়া উঠেন, জ্ঞানেও তেমনিই বাড়িয়া উঠেন। কেবল পরমজ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে ; মানুষের বুদ্ধি যে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাহা ইন্দ্রিয়ের ও বিচারশক্তির সাহায্যে কষ্টে সৃষ্টে বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। পরম জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, প্রত্যক্ষানুভূত, স্বপ্রকাশ—ইহা লাভ করিতে হইলে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত ও সংযত করিতেই হইবে, সংযতেন্দ্রিয়, যেন আর আমরা তাহাদের ছলনায় ভ্রান্ত না হই, কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়গণ যেন সেই পরম জ্ঞানের নির্ম্মল দর্পণ স্বরূপ হয় ; যে পরম বস্তুর ভিতর সর্ব্বভূত রহিয়াছে, আমাদের সমগ্র চেতনাকে তাহার সহিত যুক্ত করিতে হইবে, তৎপরঃ,—এইরূপে তাহার আলোকময় সত্ত্বা আমাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

আর চাই আমাদের এমন শ্রদ্ধা, এমন বিশ্বাস, কোনরূপ সংশয়েই যাহাকে বিচলিত হইতে দেওয়া চলিবে না, শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪।৪১

“যে অজ্ঞান ব্যক্তির বিশ্বাস নাই, যাহার আত্মা সংশয়যুক্ত সে বিনষ্ট হয় ; সন্দেহাকুলচিত্ত মানবের ইহলোকও নাই, পর-

লোকও নাই, কোন সুখও নাই।" বস্তুতঃ ইহা সত্য যে বিশ্বাস ভিন্ন ইহজগতে স্থায়ী কিছু সম্পাদন করা যায় না, কিম্বা ঊর্দ্ধ-লোক লাভের নিমিত্তও কিছু করা যায় না,—কোন নিশ্চিত ভিত্তি ও দৃঢ় অবলম্বনকে ধরিতে না পারিলে ইহকালের বা পরকালের কাজ কিছুই সফল করা যায় না, কোন তৃপ্তি বা সুখ লাভ করা যায় না; যে মন কেবল সংশয়পূর্ণ তাহা শূন্যতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। তবু কিন্তু নিম্নস্তরের জ্ঞানে সংশয় ও অবিশ্বাসের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা আছে; উপরের জ্ঞানে এ সব বিষম বাধা,—কারণ এখানকার গূঢ়তত্ত্ব এই যে এখানে বুদ্ধির দ্বারা সত্য অসত্যের বিচার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয় না, পরন্তু স্বতঃপ্রকাশমান সত্যকে ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়। বুদ্ধির স্তরে যে জ্ঞান তাহার সহিত সকল সময়েই অসম্পূর্ণতা বা মিথ্যা মিশিয়া রহিয়াছে, অতএব সংশয় দৃষ্টিতে এই জ্ঞানকে পরীক্ষা করিয়া মিথ্যার ভাগ বর্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু উচ্চস্তরের জ্ঞানে মিথ্যা স্থান পাইতে পারে না এবং নানামতের সংস্পর্শে আসিয়া বুদ্ধি যে সংশয় উৎপাদন করে তাহা কেবল বিচারের দ্বারা দূর করা যায় না, ক্রমশঃ অনুভূতি ও উপলব্ধির দ্বারা সে সংশয় আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। এইরূপে লব্ধ জ্ঞানে যে কোন অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন তাহা দূর করিতে হইলে যতটুকু উপলব্ধি হইয়াছে তাহাতে সংশয় করিলে চলিবে না, কিন্তু আত্মার মধ্যে গভীরতর, উচ্চতরভাবে বাস করিয়া, পূর্ণতর

অনুভূতি উপলব্ধির দ্বারা সেই অসম্পূর্ণতা দূর করিতে হইবে। যেটুকু এখনও অনুভূত হয় নাই, বিশ্বাসের দ্বারাই তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, সন্দেহপূর্ণ বিচারের দ্বারা নহে, কারণ এই জ্ঞান দান করা বিচার বিতর্কের সাধ্যাতীত, বাস্তবিক বিচার বিতর্কের দ্বারা মন যে সকল ধারণার মধ্যে জড়াইয়া পড়ে, অনেক সময়েই সে সব উচ্চস্তরের জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত,—এই সত্য বিচারের দ্বারা প্রমাণের বিষয় নহে, জীবনের মধ্যে ইহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, ক্রমবিকাশের দ্বারা আমাদিগকে যে উচ্চ আত্মস্বরূপ লাভ করিতে হইবে, ইহা সেই সত্য। এই সত্য স্বয়ংসিদ্ধ, আমরা যে অজ্ঞানের ছলনার মধ্যে বাস করি তাহা না থাকিলে ইহা আপনিই প্রকাশ হইত ; যে সংশয়, মোহ আমাদিগকে এই সত্য দেখিতে ও অনুসরণ করিতে দেয় না তাহা অজ্ঞানসম্ভূত, অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থম্ সংশয়ম্,—আমাদের ইন্দ্রিয়বিক্ষুব্ধ, নানামতে ভ্রান্ত হৃদয় ও মন নীচের ব্যবহারিক সত্যে ডুবিয়া আছে বলিয়াই তাহারা উপরের সত্য বস্তু সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। গীতা বলিয়াছে জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা এই সংশয় ছেদন করিতে হইবে, অনুভূতি উপলব্ধির দ্বারা এই সন্দেহ দূর করিতে হইবে, সতত যোগের অনুসরণ করিয়া, অর্থাৎ যস্মিন বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং, সেই পরম বস্তুর সহিত যোগে জীবন যাপন করিয়া সকল সন্দেহ ভ্রান্তি নিরসন করিতে হইবে।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪।৪৩

সর্ব্বদা ব্রহ্মে অবস্থিত ব্রহ্মবিৎব্যক্তি সকল সময়েই সেই উচ্চতর জ্ঞানের আলোকে সমস্ত জিনিষ অবলোকন করেন। তাহা অন্য জিনিষকে ছাড়িয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মকে দেখা নহে, পরন্তু সমস্ত জিনিষকেই ব্রহ্মে দেখা, আত্মবৎ দেখা। কারণ, গীতা বলিয়াছে, যে জ্ঞানলাভ করিলে আর আমাদিগকে আমাদের মানসিক প্রকৃতির মোহজালের মধ্যে পুনরায় পড়িতে হয় না "সেই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা সর্ব্বভূতকেই (কাহাকেও বাদ না দিয়া) আত্মাতে দেখিবে, পরে আমাতে দেখিবে।"

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাশ্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৪।৩৬

এই কথাই গীতা অন্যত্র আরও বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছে—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
দক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥৬।২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৬।৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৬।৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৬।৩২

"সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী সর্ব্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন। যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন,

আমি তাঁহাকে কখনও হারাই না, তিনিও আমাকে কখনও হারান না। যিনি একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন না কেন, তিনি আমার মধ্যেই বাস করেন, কর্ম্ম করেন। হে অর্জ্জুন, যিনি সুখে দুঃখে সর্ব্বত্র সকলকে সমানভাবে নিজের মত দেখেন, আমার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।" ইহাই উপনিষদের প্রাচীন বৈদান্তিক জ্ঞান, এই জ্ঞানকে গীতা সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে; তবে এই জ্ঞানের অন্যান্য পরবর্ত্তী বিবৃতির তুলনায় গীতার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে এই জ্ঞানের সাহায্যে কেমন করিয়া কার্য্যতঃ দিব্য জীবন গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহারই উপর গীতা একান্তভাবে ঝোঁক দিয়াছে। এই একত্ব জ্ঞানের সহিত কর্ম্মযোগের সম্বন্ধ গীতায় বার বার বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে,—দেখান হইয়াছে যে সংসারে মুক্তভাবে কর্ম্ম করিবার ভিত্তিই হইতেছে এই একত্বের জ্ঞান। গীতা যখনই জ্ঞানের কথা বলিয়াছে, তখনই ইহার ফল স্বরূপ সমতার কথাও বলিয়াছে; গীতা যখনই সমতার কথা বলিয়াছে তখনই ফিরিয়া এই সমতার ভিত্তি স্বরূপ জ্ঞানের কথাও বলিয়াছে। গীতা যে সমতার উপদেশ দিয়াছে তাহার আরম্ভ এবং শেষ কেবল আত্মমুক্তির উপযোগী নিশ্চল অবস্থায় নহে; তাহা সকল সময়েই কর্ম্মের ভিত্তি। মুক্ত পুরুষের ভিতরের দিকে প্রতিষ্ঠারূপে থাকে অক্ষর ব্রহ্মের পরম শান্তি; তাহার বাহিরের কর্ম্ম হয় ঈশ্বরের কর্ম্মের ন্যায় বিরাট, মুক্ত, সম,

সর্ব্বব্যাপী—এই কর্ম্মের শক্তি আসে ভিতরে প্রতিষ্ঠিত শান্তি হইতে; এই দুইকে এক করিয়াই দিব্যকর্ম্ম ও দিব্যজ্ঞানের সমন্বয় হয়।

অন্যান্য দর্শন, নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রে জীবনের যে সকল নীতি রহিয়াছে, গীতা তাহাদের কিরূপ মহান্ বিস্তার সাধন করিয়াছে তাহা এখন সহজেই বুঝা যায়। সহিষ্ণুতা, উদাসীনতা এবং আত্মসমর্পন যে তিনপ্রকার সমতার ভিত্তি তাহা আমরা বলিয়াছি; গীতা যে কেবল এই তিনটিরই সমন্বয় সাধন করিয়াছে শুধু তাহাই নহে, গীতা তাহাদিগকে বিরাট গভীর ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে মহান্ অত্যুচ্চ সার্থকতা প্রদান করিয়াছে। সহিষ্ণুতার দ্বারা আত্মজয় করিবার যে শক্তি আত্মার আছে তাহার জ্ঞানই স্তোয়িক জ্ঞান (Stoic knowledge), নিজের প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই এই সমতা লাভ করিতে হয়, সতত সজাগ দৃষ্টি, খাড়া পাহারার দ্বারা প্রকৃতির স্বাভাবিক বিদ্রোহ সমূহকে দমন করিয়া এই সমতা বজায় রাখিতে হয়; ইহা হইতে এক প্রকার উচ্চধরণের সুখ শান্তি পাওয়া যায় কিন্তু মুক্ত পুরুষের জীবনে যে পরম আনন্দ তাহা লাভ করা যায় না; এই মুক্ত জীবন বিধিনিষেধ অনুসারে যাপিত হয় না, দিব্য প্রকৃতির শুদ্ধ সহজ সিদ্ধাবস্থা হইতে আপনা হইতেই জীবনের সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়,—সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে,—"তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন, কর্ম্ম

করেন।"—এখানে সিদ্ধি আহরণ করিতে হয় না, চেষ্টা করিয়া রক্ষা করিতে হয় না কারণ উহা আত্মার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। আমাদের নীচের প্রকৃতিকে জয় করিতে সাধনার প্রথমাবস্থায় ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সার্থকতা গীতা স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় কতকটা জয়লাভ করিতে পারিলেও, পূর্ণজয়ের মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবানের সহিত যোগ সাধন ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই,—সেই এক দিব্যপুরুষের সত্তায় নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিতে হইবে, ভগবদিচ্ছার মধ্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে লয় করিতে হইবে। প্রকৃতির এবং তাহার কর্ম্মের একজন দিব্য প্রভু আছেন, তিনি প্রকৃতির মধ্যে বাস করিয়াও প্রকৃতির উপরে, তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সত্তা, আমাদের বিরাট আত্মা; তাঁহার সহিত এক হওয়াই আমাদের দিব্যাবস্থালাভ। ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া আমরা পূর্ণ মুক্তি ও পরম জয় লাভ করি। স্তোয়িকদের যে আদর্শ, যে তপস্বী আত্মজয়ের দ্বারা বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও জয় করিয়া প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহার সহিত বেদান্তের স্বরাট্, সম্রাট আদর্শের বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে; কিন্তু সেই প্রভুত্ব নীচের স্তরে। স্তোয়িকের প্রভুত্ব সতত আত্মার উপর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর বলপ্রয়োগ করিয়া বজায় রাখিতে হয়; যোগীর যে পূর্ণ মুক্ত প্রভুত্ব তাহা দিব্য প্রকৃতির চিরন্তন ঈশ্বরত্ব হইতে স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত,—নীচের প্রকৃতি যাহার যন্ত্রমাত্র, ঊর্দ্ধে

সেই দিব্যপ্রকৃতির মুক্ত বিশালতায় বাস করিয়াই এই পূর্ণ জন্মে পূর্ণ স্বাধীনতায় সহজ, স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তিনি সকল জিনিষের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন, তাঁহার কারণ এই যে তিনি সকল জিনিষের সহিত একাত্মা হন, সর্ব্বভূতাত্ম—ভূতাত্মা। প্রাচীন রোমক সমাজের একটি দৃষ্টান্ত লইয়া স্তোয়িক মুক্তি বুঝান যাইতে পারে,—যে ক্রীতদাসকে তাহার যোগ্যতার জন্য মুক্তি দেওয়া হইত (libertus), সে যেমন মুক্ত হইয়াও বস্তুতঃ পূর্ব্ব প্রভুরই অধীন থাকিত, স্তোয়িক সাধনায় মুক্ত ব্যক্তিকেও প্রকৃতি তেমনিই তাহার যোগ্যতার জন্য মুক্তি দেয়। কিন্তু গীতা যে মুক্তির কথা বলিয়াছে তাহা স্বাধীন মনুষ্যের (freeman) জন্মগত স্বাধীন মুক্তি, দিব্য প্রকৃতিতে জন্মলাভ করিয়া এই মুক্তি আপনা হইতেই লাভ করা যায়। মুক্ত পুরুষ যাহাই করুন, যেখানেই থাকুন তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন; তিনি ঘরের দুলাল বালবৎ, তাঁহার ভুল হইতে পারে না, পতন হইতে পারে না কারণ তিনি যাহা এবং তিনি যাহা করেন সে সবই পরম আনন্দময় পরম প্রেমময়, পরম সুন্দর। তিনি যে সাম্রাজ্য ভোগ করেন, রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্, তাহা সুখ ও মধুরতার রাজ্য, তাহার সম্বন্ধে গ্রীক পণ্ডিতের এই কথা বলা যায়—"শিশুরই রাজ্য"— "The Kingdom is of the child."

বিশ্বজগতের প্রকৃত ধারা, বাহ্যবস্তুর অনিত্যতা, সাংসারিক ভেদ বৈষম্যের নিরর্থকতা এবং আভ্যন্তরীন ধীরতা, শান্তি,

আলোক ও আত্মনির্ভরতার সার্থকতা—এই সবের জ্ঞানই দার্শনিক * জ্ঞান। ইহা দার্শনিকজ্ঞানলব্ধ উদাসীনতার সমতা; ইহা হইতে উচ্চ শান্ত ভাব আইসে কিন্তু উচ্চতর আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করা যায় না; এই মুক্তি সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা—উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া কত লোক হাবুডুবু খাইতেছে, এই দুরবস্থা হইতে কেহ মুক্তিলাভ করিয়া উচ্চ শৈলশেখর হইতে যেরূপ অন্যান্য সকলের দুরবস্থা দর্শন করে সেইরূপ দার্শনিক জ্ঞানের আলোকে সংসারের দুঃখ ও অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সংসার হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া এই মুক্তিলাভ করা যায়—শেষ পর্য্যন্ত ইহা সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ইহা সংসারের কোন কাজেই লাগে না। সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ দার্শনিক উদাসীনতার যে উপযোগিতা আছে গীতা তাহা স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু, যে উদাসীনতা গীতার চরমলক্ষ্য তাহাতে সংসার হইতে বিচ্ছিন্নতার কোন ভাব নাই, সে অবস্থাকে ঠিক উদাসীনতা বলা চলে কিনা সন্দেহ। যেন উচ্চে বসিয়া আছে এরূপ একটা ভাব সে অবস্থায় আছে বটে, উদাসীনবৎ, কিন্তু

* ইংরাজী 'philosophy' শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপ বাংলায় "দর্শন" শব্দ ব্যবহারই প্রচলিত রীতি এবং আমরাও সেই রীতি অনুসরণ করিয়াছি। তবে মনে রাখা উচিত যে philosophy তত্ত্বদর্শী ঋষির অপরোক্ষানুভূত তত্ত্বজ্ঞান নহে, মানসিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিতর্ক করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা লইয়াই philosophy.

যেমন ভগবান উচ্চে বসিয়া রহিয়াছেন—সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তথাপি তিনি সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতেছেন এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়া জীবকে রক্ষা করিতেছেন। সর্ব্বভূতের সহিত একত্বের উপলব্ধির উপর এই সমতা প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক সমতাতে যে অভাব আছে, এখানে তাহা পূর্ণ হইয়াছে; কারণ ইহার মূলে শান্তি আছে, উপরন্তু প্রেম আছে। এই সমতার অবস্থায় সর্ব্বভূতকে নির্ব্বিশেষে ভগবানের মধ্যে দেখা যায়, সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মবোধ হয় অতএব সকলের প্রতিই পরম সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া যায়। কেহই বাদ থাকে না, "অশেষেণ", কেবল যে সব শুভ, সুন্দর ও আনন্দদায়ক শুধু সেই সবই নহে, যত নীচ, পতিত, পাপী, কুরূপ হউক না কেন এই সার্ব্বজনীন ঐকান্তিক সহানুভূতি ও আধ্যাত্মিক একত্ব হইতে কোন বস্তু, কোন ব্যক্তিকেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। এখানে যে কেবল ঘৃণা, ক্রোধ বা হৃদয়হীনতার স্থান নাই শুধু তাহাই নহে, এখানে সরিয়া থাকা, তাচ্ছিল্য, গরিমা বা দাম্ভিকতারও স্থান নাই। মানুষের বাহ্যিক অজ্ঞান, দুঃখ, দুর্দ্দশার জন্য তাহার প্রতি দেবোচিত করুণা থাকিবে, তাহাকে জ্ঞান দিবার, শক্তি দিবার, আনন্দ দিবার দেবোচিত প্রবৃত্তি থাকিবে; কিন্তু মানুষের মধ্যে যে দিব্য আত্মা রহিয়াছে তাহার প্রতি আরও অধিক কিছু থাকিবে, ভক্তি ও প্রেম থাকিবে। কারণ সকলের ভিতর হইতে,—যেমন সাধু ও জ্ঞানীর ভিতর হইতে, তেমনই চোর, চণ্ডাল, পতিতার ভিতর হইতেও সেই

প্রেমময় চাহিয়া আছেন এবং আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন —"এখানেও আমিই"। সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতি, "সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থিত আমাকে যে ভালবাসে"—দিব্য সার্ব্বজনীন প্রেমের চরম পূর্ণতা ও গভীরতার এত বড় শক্তিমান কথা জগতের আর কোন শাস্ত্রে, কোন ধর্ম্মে বলা হইয়াছে?

আত্মসমর্পণ এক প্রকার ভক্তসুলভ সমতার ভিত্তি—এই সমতা ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে নতি, সংসারের সমস্ত দুঃখ কষ্ট মাথা পাতিয়া গ্রহণ করা। গীতায় এই আত্মসমর্পণ আরও পূর্ণতর, সমগ্র সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নিকট সমর্পণ করা। ইহা কেবল মাত্র নিষ্ক্রিয় নতি (passive submission) নহে, পরন্তু ইহা সক্রিয় আত্মদান (active self-giving)। গীতার সমর্পণের অর্থ কেবল সমস্ত জিনিষেই ভগবানের ইচ্ছা দেখা এবং স্বীকার করিয়া লওয়া নহে, কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব্ব কর্ম্মের প্রভু ভগবানের যন্ত্র করিয়া দেওয়া; এই যন্ত্রভাব কেবল দাসভাব মাত্র নহে, "আমি ভগবানের দাস", এই ভাবে কর্ম্ম করারও উপরে হইতেছে গীতার যন্ত্রভাব,—প্রথমাবস্থায় যাহাই হউক অন্ততঃ শেষ পর্য্যন্ত আমাদের চৈতন্য ও কর্ম্ম এমন পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে যেন আমাদের সত্তা ভগবানের সত্তার সহিত এক হইয়া যায় এবং আমাদের অহঙ্কার-শূন্য আধার যেন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্রমাত্র হয়। শুভ অশুভ, সুখ দুঃখ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য—সকল প্রকার ফলই সর্ব্বকর্ম্মের প্রভু ভগবানের বলিয়াই গ্রহণ করা হয়, অতএব শেষ

যন্ত্র শোক দুঃখ যে কেবল সহ্য করা হয় তাহা নহে, শোক দুঃখ একেবারে লোপ পায় ;—হৃদয়ে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যন্ত্রের ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন বোধ থাকে না ; সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ভগবান পূর্ব্ব হইতেই সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষের অহঙ্কার ভগবানের ইচ্ছার কোন ব্যতিক্রমই করিতে পারে না, এই জ্ঞান হয়। অতএব একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"আমার দিব্য ইচ্ছা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে আমি ইতিপূর্ব্বেই সব করিয়া রাখিয়াছি, হে অর্জ্জুন, তুমি এখন কেবল নিমিত্ত মাত্র হও"—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ (১১।৩৩)। এইরূপ ভাব হইতেই শেষে ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত ভাগবত ইচ্ছার সম্পূর্ণ যোগ হয় এবং ক্রমশঃ জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত এমন অবস্থালাভ করা যায় যে তখন যন্ত্র নিখুঁত ভাবে ভগবানের শক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়। বিরাটের সহিত ব্যক্তির এই চরম মিলনের অবস্থায় আত্মসমর্পণের পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, মন দিব্য আলোক ও শক্তির আধার হয়, ইচ্ছাশক্তি জগতে এই দিব্য আলোক ও শক্তির মহান্ জয়শীল যন্ত্র হয়।

অপরে আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করে সে সম্বন্ধেও সমভাব হয়। সর্ব্বত্র এক আত্মাকে দর্শন করিয়া, সর্ব্বভূতে ভগবানকে দর্শন করিয়া অন্তরে যে একত্ববোধ, প্রেম, সহানুভূতির উদয় হয় তাহা কিছুতেই বিচলিত হয় না, অপরে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন। কিন্তু, তাই বলিয়া তাহারা যাহা করিবে নির্বিরোধে তাহা মানিয়া লইতে

হইবে,এমন কোন কথাই নাই ; এরূপ হইতেই পারে না, কারণ সংসারে লোকে আপন আপন অহঙ্কারের তৃপ্তির জন্য দ্বন্দ্ব বিরোধের সৃষ্টি করিতেছে, ভগবদিচ্ছার সহিত ইহাদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী অতএব, যাহারা সর্ব্বদা ভগবদিচ্ছার যন্ত্রভাবে কার্য্য করিবে, তাহাদিগদকে সংসারে বাসনাচালিত অহঙ্কৃত নানা ব্যক্তির, নানা কর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেই হইবে। সেইজন্যই অর্জ্জুন বাধা দিতে, যুদ্ধ করিতে, জয় করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাকে ঘৃণা বা ব্যক্তিগত বাসনা বা ব্যক্তিগত শত্রুভাব পরিহার করিয়াই যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে, কারণ মুক্ত পুরুষে এই সকল ভাব সম্ভবে না। ব্যক্তিগত অভিমান বর্জ্জন করিয়া ভগবানের ইচ্ছার নিমিত্ত মাত্র হইয়া, লোক সংগ্রহের জন্য, ভাগবত আদর্শের দিকে লোক সকলকে পরিচালনার জন্য কর্ম্ম করা, এই নীতি ভগবানের সহিত, বিশ্বপুরুষের সহিত জীবের একাত্মবোধ হইতেই উত্থিত হয়, কারণ বিশ্বব্যাপী দিব্যকর্ম্মের উহাই সমগ্র লক্ষ্য ও অর্থ । আবার সর্ব্বভূতের সহিত আমাদের যে একত্ব তাহারও সহিত এহ নীতির কোন বিরোধ নাই, হউক না কেন যে এখানে অনেকেই আমাদের সম্মুখে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত। কারণ ভাগবত আদর্শ তাহাদেরও আদর্শ, যাহাদের বাহ্য মন অজ্ঞান ও অহঙ্কারের দ্বারা বিপথে চালিত হয় এবং ভাগবত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহাদেরও অন্তরের নিগূঢ় লক্ষ্য হইতেছে ভাগবত আদর্শে পৌছান। তাহাদিগকে বাধা দিলে বা পরাস্ত করিলেই তাহাদের সর্ব্বোৎ-

কৃষ্ট বাহ্যিক সেবা বা উপকার করা হয়। ইহা উপলব্ধি করিয়া গীতা বাহ্যিক ব্যবহারবৈষম্যের অবশ্যম্ভাবিতা অস্বীকার করে নাই, কিম্বা অজ্ঞানজনিত দুর্ব্বল অনুকম্পার উপদেশ দেয় নাই, কিন্তু আন্তরিক জ্ঞানসম্মত সমতা ও প্রেমের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আত্মায় সকলের সহিত একত্ব থাকিবে, হৃদয়ে সকলের প্রতি শান্ত প্রেম থাকিবে কিন্তু হস্ত মুক্ত থাকিবে জগতে ভগবানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতে, মানবজাতিকে শুভ ও মোক্ষের পথে আগাইয়া দিতে, সর্ব্বভূতের সমগ্র হিত সাধন করিতে।—এই ব্যক্তির ঐ ব্যক্তির বাহ্যিক মঙ্গল করিতে যাইয়া কখনই তাহা ভাগবত কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।

ভগবানের সহিত একত্ব, সর্ব্বভূতের সহিত একত্ব, সর্ব্বত্র সনাতন দিব্য একতার উপলব্ধি এবং সকল মনুষ্যকে এই একত্বের দিকে টানিয়া লওয়া—ইহাই জীবনের ধর্ম্মরূপে গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা গভীর, উদার, মহৎ ধর্ম্ম আর কিছুই হইতে পারে না। নিজে মুক্ত হইয়া এই একত্বের মধ্যে বাস করা, যে পথে ইহা লাভ করা যায় সমস্ত মানবজাতিকে সেই পথে টানিয়া লওয়া এবং ইতিমধ্যে সমস্ত কর্ম্ম ভগবদর্থে সম্পাদন করা এবং অপরকেও এইরূপে আনন্দের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করা, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, সর্ব্বকর্ম্মানি জোষয়ন্—দিব্যকর্ম্মের ইহা অপেক্ষা উদার বা মহৎ নীতি আর কিছু দিতে পারা যায় না। এই মুক্তি এবং এই একত্বই আমাদের মানবীয় প্রকৃতির নিগূঢ় লক্ষ্য, এবং জাতির জীবনে ইহাই চরম ইচ্ছা। সমগ্র

মানবজাতি আজ যে সুখের জন্য বৃথা খুঁজিয়া মরিতেছে তাহার জন্য এই দিকে ফিরিতেই হইবে; মানুষ এই দিকে তখনই ফিরিবে যখন তাহারা একবার নিজের মধ্যে ও চারিদিকে সর্ব্বেষু, সর্ব্বত্র, ভগবানকে দেখিবার জন্য চক্ষু ও হৃদয়কে উন্মুক্ত করিবে এবং শিখিবে যে তাহারা ভগবানের মধ্যেই বাস করিতেছে, প্রকৃতি কেবল কারাপ্রাচীর মাত্র, ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই হইবে, বড় জোর শৈশবের পাঠশালা মাত্র, ইহাকে ছাড়িয়া উঠিতেই হইবে, তবেই আমরা সাবালক হইতে পারিব, মুক্ত স্বাধীন হইতে পারিব। ভগবান ঊর্দ্ধে রহিয়াছেন, মনুষ্যের মধ্যে রহিয়াছেন, জগতের মধ্যে রহিয়াছেন—সেই সর্ব্বত্র বিরাজমান ভগবানের সহিত একাত্ম হইতে হইবে, ইহাই মুক্তির অর্থ, ইহাই সিদ্ধির পরম রহস্য।

—

একবিংশ অধ্যায়

প্রকৃতির অন্ধনিয়ম

(The Determinism of Nature)

আত্মজ্ঞান ও কর্ম্মের মিলনের দ্বারা যখন আমরা উপরের আত্মাতে বাস করিতে সক্ষম হই, তখন আমরা নীচের প্রকৃতির ক্রিয়া প্রণালী অতিক্রম করি। তখন আর আমরা প্রকৃতি এবং গুণের অধীন থাকি না, কিন্তু আমাদের প্রকৃতির প্রভু, ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া প্রকৃতিকে ভগবদিচ্ছা সম্পাদনে নিয়োজিত করিতে পারি, তখন আর আমাদিগকে কর্ম্মের পাশে বদ্ধ হইতে হয় না; কারণ আমাদের যে উপরের আত্মা তিনিই ভগবান, তিনি প্রকৃতির কর্ম্মের প্রভু এবং কর্ম্মের ফলে বদ্ধ হন না। কিন্তু প্রকৃতিতে অবস্থিত অজ্ঞান আত্মা অজ্ঞানের দ্বারাই গুণে আবদ্ধ হয় কারণ এখানে সে তাহার দিব্য স্বরূপ না জানিয়া মোহবশে অহঙ্কারে আবদ্ধ হয়, মনের ক্ষুদ্র "আমি"কেই নিজের স্বরূপ মনে করে। এই মনের "আমি"কে খুব বড় দেখাইলেও ইহা প্রকৃতিরই একটি মাত্র অঙ্গ (factor) ভিন্ন আর কিছুই নহে; এই "আমি"রূপ গ্রন্থিকে অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতির খেলা চলে এবং এই গ্রন্থিতে অজ্ঞান আত্মা বাঁধা

পড়ে। এই গ্রন্থিকে ছিন্ন করিতে হইবে, এই "আমি"কে কেন্দ্র করিয়া ইহারই তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করা চলিবে না, উর্দ্ধে যে দিব্য বিজ্ঞানময় .আত্মা রহিয়াছে তাহাকেই কেন্দ্র করিতে হইবে, তাহা হইতেই সব লইতে হইবে—এই রূপেই প্রকৃতির গুণত্রয়ের অশান্ত দুঃখময় খেলার উপরে উঠিতে পারা যাইবে।

গীতা যে সকল শ্লোকে বলিয়াছে যে মানুষ প্রকৃতির অধীন সেই সকলকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে গীতার মতে এজগতে কাহারও কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, প্রকৃতির অন্ধ নিয়মানুসারেই এখানে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। অবশ্য গীতা যেরূপ জোরের সহিত কথাটি বলিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহের স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু, গীতার কোন বিশেষ অংশকে স্বতন্ত্র ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা ঠিক নহে, কোন শ্লোককে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়া গীতার সমগ্র শিক্ষার সহিত মিলাইয়া তাহার অর্থ করা উচিত, নতুবা ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। শুধু গীতার কথা নহে, সকল সত্য সম্বন্ধেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, সমগ্রভাবে না ধরিয়া শুধু অংশবিশেষের উপর ঝোঁক দিলে প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। গীতার মধ্যে সমস্ত কথাই পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, অতএব কোন বিশেষ অংশকে বুঝিতে হইলে, সমগ্র গ্রন্থের শিক্ষার সহিত মিলাইয়া তাহার অর্থ করিতে হইবে। যাহারা শুধু অংশমাত্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়, সমগ্রের জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি রাখে না তাহারা যে বিপথগ্রস্ত হয়, গীতা

তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছে, অকৃৎস্নবিৎ ও কৃৎস্নবিৎ এই দুই শব্দের মধ্যে প্রভেদ করিয়া। সাধারণ লোক অকৃৎস্নবিৎ, জগৎকে খণ্ডভাবে দেখিয়া তাহারা পদে পদে ভুল বোঝে, কিন্তু যোগী কৃৎস্নবিৎ, তিনি সমগ্রভাবে জগতকে দেখিয়া সকল আপাত-বিরোধী তত্ত্বসমূহের সমন্বয় করেন। যোগীজন-বাঞ্ছিত শান্তি ও পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন হইতেছে সমস্ত জগৎকে ধীরভাবে দেখিতে হইবে, সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে, আপাতবিরোধী তত্ত্বসমূহের দ্বারা বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না। আমাদের এই জটিল রহস্যময় জীবনের এক প্রান্তে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা এক প্রকারের সত্য, আবার বিপরীত প্রান্তে প্রকৃতির একরকম পূর্ণ প্রভুত্ব, নিয়ন্তৃতই বিপরীত প্রকারের সত্য ; আবার, এই দুই বিপরীত সত্যের বিকৃত ছায়া ক্রমবিকাশশীল মনের উপর পড়িলে আত্মার এক প্রকার স্বাধীনতার আভাস হয়,—ইহা আংশিক ও আভাসমাত্র, অতএব ইহা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা নহে। এই শেষেরটিকেই সাধারণতঃ আমরা ভুল করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা (free will) নাম দিয়া থাকি, কিন্তু গীতা পূর্ণ মুক্তি ও প্রভুত্ব ভিন্ন আর কিছুকেই স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকার করে নাই।

সকল সময়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে গীতার সমস্ত শিক্ষার পশ্চাতে আত্মা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি মহান্ তত্ত্ব রহিয়াছে, (১) সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব এবং (২) এই তত্ত্ব যাহার দ্বারা সংশোধিত ও সম্পূর্ণ হইয়াছে বেদান্তের সেই

ত্রিধাপুরুষ * ও দ্বিধা প্রকৃতির তত্ত্ব,—প্রকৃতির নীচের রূপ হইতেছে ত্রিগুণময়ী মায়া, অপরা প্রকৃতি এবং ইহার উর্দ্ধের রূপ হইতেছে পরাপ্রকৃতি, দিব্যপ্রকৃতি, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। গীতার শিক্ষার নানাস্থানে যে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ আপাত-দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় সে সমুদয়ের প্রকৃত সমন্বয় করিবার ইহাই মূল সূত্র। বস্তুতঃ আমাদের চেতনাময় জীবনের বিভিন্ন স্তর আছে এবং যাহা এক স্তরে কার্য্যতঃ সত্য উপরের আর এক স্তরে উঠিলে তাহাই আর সত্য থাকে না কারণ যখনই আমরা উপরের স্তরে উঠি তখনই উহা ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করে, উপরের স্তর হইতে আমরা সমস্ত জিনিষকে আরও সমগ্র ভাবে দেখিতে পারি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা নির্দ্ধারণ করিয়াছে যে মনুষ্য, পশু, বৃক্ষলতা এমন কি ধাতুদ্রব্য পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই বস্তুতঃ একই প্রকারের জীবনের সাড়া পাওয়া যায়, অতএব সকলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমের স্নায়বিক চৈতন্য আছেই। কিন্তু, প্রত্যেকেই যদি নিজের ভিতরের ব্যাপার বর্ণনা করিতে পারিত তাহা হইলে প্রকৃতির একই প্রকারের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার চারি প্রকার বিভিন্ন এবং খুবই বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যাইত কারণ আমরা যতই বিবর্ত্তনক্রমে উপরে উঠি, ততই সেই সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন মূল্য, বিভিন্ন অর্থ ধারণ করে। মানবাত্মার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমাদের সাধারণ মানসিক অবস্থায়

* ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও পুরুষোত্তম।

যেটিকে আমরা স্বাধীন ইচ্ছা বলি, এরূপ বলা আমাদের পক্ষে কতকটা যুক্তিসঙ্গত হইলেও, উচ্চস্তরে আরূঢ় যোগী সেটিকে স্বাধীনতা বলিবেন না—আমাদের রাত্রি তাঁহার নিকট দিন, আমাদের দিন তাঁহার নিকট রাত্রি, আমরা যেটিকে স্বাধীন ইচ্ছা বলি, তিনি দেখেন সেটি প্রকৃতির গুণের বশ্যতা, তাহাতে কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। তিনি একই জিনিষ দেখেন, কিন্তু উর্দ্ধ হইতে সর্ব্বজ্ঞের দৃষ্টিতে দেখেন, কৃৎস্নবিৎ আর আমরা দেখি আমাদের আংশিক জ্ঞানের গণ্ডী হইতে, অকৃৎস্নবিৎ —ইহা অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যেটাকে আমাদের স্বাধীনতা বলিয়া গর্ব্ব করি, তিনি দেখেন যে সেটা দাসত্ব।

নিম্ন প্রকৃতির জালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও আমরা যে আমাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করি, গীতা ইহাকে অজ্ঞান বলিয়া বুঝিয়াছে এবং এই অজ্ঞান ধারণার বিরুদ্ধেই গীতা বলিয়াছে যে, এই নীচের স্তরে আমাদের "আমি" সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির গুণের অধীন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩।২৭
তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ৩।২৮
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়া সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তান কৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ৩।২৯

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩।৩০

—"কর্ম্মসকল প্রকৃতির গুণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাদিত হইতেছে কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ় ব্যক্তি মনে করে যে তাহার "আমি"ই বুঝি সব করিতেছে। কিন্তু গুণ ও কর্ম্মের বিভাগের প্রকৃত তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি বুঝেন যে গুণসকলেরই পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে এবং ইহা বুঝিয়া তিনি আসক্তি দ্বারা তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ হন না। সমগ্রের জ্ঞান যাহাদের আছে তাঁহারা যেন, সমগ্রের জ্ঞান যাহাদের নাই, যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমোহিত তাহাদিগকে তাহাদের মানসিক স্থিতি হইতে বিচলিত না করেন। তোমার সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, কামনা ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া শোকত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর।" এখানে চেতনার দুই স্তর স্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে—এক স্তরে আত্মা অহঙ্কারের জালে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির তাড়নায় কর্ম্ম করিতেছে কিন্তু তাহার ভ্রম হইতেছে বুঝি সে স্বাধীন ভাবেই কর্ম্ম করিতেছে, আর এক স্তরে আত্মা অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়াছে, নীচের প্রকৃতির "আমি"র সহিত আর নিজেকে এক বলিয়া ভাবে না, উপর হইতেই প্রকৃতির কার্য্য অবলোকন করিতেছে, পরিচালন করিতেছে, অনুমতি দিতেছে।

আমরা বলি যে আত্মা প্রকৃতির অধীন; কিন্তু অন্যদিকে আবার গীতা আত্মা ও প্রকৃতির স্বরূপ প্রভেদ করিতে গিয়া

বলিয়াছে যে আত্মা সকল সময়েই ঈশ্বর, প্রকৃতি তাঁহার অধীনে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এখানে গীতা বলিয়াছে যে আত্মা অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হয় কিন্তু বেদান্তের মতে আত্মা চিরমুক্ত ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন।

তাহা হইলে এই যে আত্মা অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ়, প্রকৃতির অধীন, এই আত্মা কোন্ বস্তু? উত্তর হইতেছে এই যে, যখন আমরা আত্মার অধীনতা বা বিমূঢ়তার কথা বলি তখন আমরা আমাদের নীচের স্তরের জীবনের ভাষা প্রয়োগ করি মাত্র; আমরা এখানে যাহাকে আত্মা বলি তাহা প্রকৃত আত্মা, প্রকৃত "পুরুষ" নহে, তাহা প্রকৃত আত্মার ছায়া মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে নিম্নস্তরে যাহাকে আমরা সাধারণতঃ "আমি" বলি তাহাই প্রকৃতির অধীন; এইরূপ অধীনতা অবশ্যম্ভাবী কারণ এই "আমি" নিজেই প্রকৃতির অংশ, প্রকৃতির যন্ত্রেরই একটি প্রক্রিয়া; মানসিক চেতনায় আত্মজ্ঞান যখন এই "আমি"কেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করে, তখন নিম্নস্তরে আত্মার মত একটা আভাসের সৃষ্টি হয়। এইরূপে সাধারণতঃ যাহাকে আমরা আত্মা বলি তাহা প্রকৃত পুরুষ নহে, তাহা প্রকৃতির "আমি", বাসনাকামনা-ময় আত্মা, তাহা প্রকৃতির কার্য্যাবলীর উপরে পুরুষের চেতনার প্রতিচ্ছায়া; বাস্তবিক পক্ষে ইহা প্রকৃতির তিনগুণেরই একটি ক্রিয়া, অতএব প্রকৃতিরই অঙ্গ। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে আমাদের মধ্যে দুইটি আত্মা রহিয়াছে, একটি হইতেছে আভাস-আত্মা বা বাসনাকামনাময় আত্মা—গুণত্রয়ের রূপা-

স্তরের সহিত ইহারও রূপান্তর হয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে গুণত্রয়ের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত; অপরটি হইতেছে প্রকৃতি ও তাহার গুণের অতীত, মুক্ত, শাশ্বত পুরুষ। আমাদের দুইটা "আমি" রহিয়াছে, আভাস আত্মা কেবল আমাদের কাঁচা "আমি", ইহা আমাদের মানসিক কেন্দ্র, ইহা প্রকৃতির নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল ক্রিয়াকে, নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নামরূপকে গ্রহণ করে, বলে—"আমিই এই নামরূপ, এই যে প্রাকৃত ব্যক্তি সব কাজ কর্ম্ম করিতেছে ইহাই আমি"—কিন্তু এই প্রাকৃত ব্যক্তি প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা প্রকৃতির গুণেরই সমবায় মাত্র। আর আমাদের যে প্রকৃত আত্মা, আমাদের বড় বা পাকা "আমি" তাহা বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির ভর্ত্তা, ভোক্তা, ঈশ্বর বটে কিন্তু তাহা নিজে নিত্যপরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃত নাম-রূপের সহিত এক নহে। তাহা হইলে মুক্তির উপায় হইতেছে এই কাঁচা আমির বাসনা কামনা বর্জ্জন করা এবং আত্মা সম্বন্ধে মিথ্যাধারণা বর্জ্জন করা। গুরু তাই বলিলেন—নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ,—"বাসনা অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া, আত্মার সমস্ত কাতরতা হইতে মুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর।"

আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে এই মত, সাংখ্যকৃত প্রকৃতিপুরুষ-তত্ত্বদ্বয়ের বিশ্লেষণ হইতে উৎপন্ন। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অকর্ত্তা; প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, কর্ত্রী। পুরুষ চেতনাময় সত্তা; প্রকৃতি জড়, অচেতন, সে নিজের সমস্ত কার্য্যাবলী চেতনাময় সাক্ষী পুরুষে প্রতিফলিত করে। প্রকৃতি তাহার গুণত্রয়ের অসমতার

দ্বারা কর্ম্ম করে, এই তিন গুণ অনবরত পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে, মিশ্রিত হইতেছে, রূপান্তরিত হইতেছে; প্রকৃতির অহঙ্কারের ক্রিয়ার দ্বারা পুরুষ এই সকল গুণের কর্ম্মকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করে এবং এইরূপেই নিত্য শান্ত পুরুষে কর্ত্তৃত্ব, পরিবর্ত্তনশীল নামরূপ ও অনিত্যলীলার ভাব সৃষ্টি হয়। অশুদ্ধ প্রাকৃতিক চৈতন্য পুরুষের শুদ্ধ আত্মচৈতন্যকে মেঘাচ্ছন্ন করে; মন অহঙ্কার ও নামরূপে মগ্ন হইয়া প্রকৃত পুরুষকে ভুলিয়া যায়; আমরা মনের এই ভ্রমের দ্বারা এবং দেহপ্রাণের বাসনাকামনার দ্বারা আমাদের বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত হইতে দিই। যতদিন পুরুষ এই কার্য্যে অনুমতি দিবে, ততদিন আমাদের প্রাকৃত জীবন অহঙ্কার, বাসনা ও অজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইবেই।

কিন্তু ইহাই যদি সব হইত তাহা হইলে মুক্তির একমাত্র উপায় হইত এই অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া এবং এইরূপে প্রকৃতির গুণের সাম্যাবস্থা আনয়ন করিয়া তাহার সকল কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া। ইহা এক প্রকারের প্রতিকার তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সেইরূপ রোগচিকিৎসার মত যাহাতে রোগের সঙ্গে রোগীরও শেষ হইয়া যায়—গীতা এইরূপ চিকিৎসা-কেই পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছে। বিশেষতঃ অজ্ঞানীদের উপর এই শিক্ষা চাপাইলে তাহারা তামসিক নিষ্ক্রিয়তাই অবলম্বন করিবে; তাহাদের বুদ্ধিতে মিথ্যা ভেদজ্ঞান, মিথ্যাবিরোধ উপস্থিত হইবে, বুদ্ধিভেদঃ; তাহাদের কর্ম্মের প্রবৃত্তি এবং তাহা-দের বুদ্ধি পরস্পরের বিরোধী হইবে, প্রকৃত সূত্র ধরিতে না

পারিয়া তাহারা গোলমালে পড়িবে, মিথ্যাচার, আত্মপ্রতারণার সৃষ্টি হইবে অথবা তামসিক নিশ্চেষ্টতার উদ্ভব হইবে,—বলা বাহুল্য যে সংসারে ও কর্ম্মে প্রবৃত্তির এইরূপ অভাব মুক্তি নহে, ইহা প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণ তমোগুণের অধীনতা, অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির অধীনতা। অথবা তাহারা ইহার কোন মর্ম্মই গ্রহণ করিতে পারিবে না, এই উচ্চশিক্ষার দোষ ধরিবে, ইহার বিরুদ্ধে বলিবে যে তাহারা তাহাদের মনের ভিতর স্বাধীনতার উপলব্ধি পাইতেছে তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না এবং এইরূপে নিজেদের তর্কযুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মূঢ়তা ও আত্মপ্রতারণায় দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, অজ্ঞান অন্ধকারে আরও বেশী ডুবিয়া মুক্তির সম্ভাবনা নষ্ট করিবে।

বাস্তবিক পক্ষে এই সকল উচ্চতর সত্য উচ্চ ক্ষেত্রেরই উপযোগী—চেতনার উচ্চতর স্তরেই তাহাদিগকে উপলব্ধি করা যায় এবং জীবনে পরিস্ফুট করিয়া তোলা যায়। নীচে হইতে এই সকল সত্যকে দেখিলে ভুল দেখা হইবে, ভুল বোঝা হইবে, সম্ভবতঃ তাহাদের অপব্যবহারই করা হইবে। পাপ-পুণ্যের প্রভেদ সাধারণ অহঙ্কারময় মানবজীবনেরই উপযোগী, পশুত্ব হইতে দেবত্বে পৌঁছিবার পথের মধ্যে অবস্থিত যে মানবীয় স্তর সেইখানেই পাপপুণ্যের প্রভেদ সত্য ও প্রয়োজনীয়; কিন্তু উচ্চতর স্তরে উঠিলে আমরা পাপপুণ্যের উপরে উঠি, ভগবান যেমন পাপপুণ্যের দ্বন্দ্বের অতীত আমরাও সেইরূপ হই—এই যে সত্য, ইহা এইরূপ উচ্চতর সত্য। কিন্তু নীচের চেতনা

হইতে না উঠিয়া অপরিপক্ক মন লইয়াই যদি আমরা নিম্নস্তরের অনুপযোগী এই সত্যকে ধরিতে যাই তাহা হইলে আমরা বিষম অনর্থ ঘটাইব, পাপ পুণ্যের প্রভেদ অমান্য করিয়া নিজেদের আসুরিক প্রবৃত্তি সমূহকে প্রশ্রয় দিব এবং এইরূপে ভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অধঃপাতে যাইব সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ অচেতসঃ। প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্বও সেইরূপ উচ্চস্তরের সত্য ; এটিকে লোক ভুল বুঝিবে এবং ইহার অপব্যবহার করিবে। এই সত্যের অপব্যবহার তাহারা করে যাহারা বলে যে মানুষকে তাহার প্রকৃতি যেমন গড়িয়াছে সে সেইরূপই হইয়াছে এবং তাহার প্রকৃতি যাহা করাইবে মানুষ তাহাই করিতে বাধ্য। ইহা এক হিসাবে সত্য বটে কিন্তু লোকে ইহাকে যে অর্থে বুঝে তাহা সত্য নহে,—আমরা যদি মনে করি যে পাপ পুণ্য যাহাই করি না কেন তাহাতে আমাদের কোনই দায়িত্ব নাই, আমাদিগকে আমাদের কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে না, তাহা হইলে বিষম ভুল করা হইবে। কারণ আমাদের ইচ্ছা রহিয়াছে, বাসনা রহিয়াছে, ইচ্ছা ও বাসনা লইয়া কর্ম্ম করা আমাদের স্বভাব হইলেও যতদিন আমরা ইচ্ছা ও বাসনার বশে কর্ম্ম করিব ততদিন সেই কর্ম্মের ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। এই কর্ম্মজাল মহা ভয়ঙ্কর, ইহা অন্যায়, যুক্তিবিগর্হিত বা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির নিকট প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু এ জাল আমাদেরই নিজের তৈয়ারী, এই বন্ধনে আমরা সাধ করিয়া বদ্ধ হই।

গীতা বলিয়াছে বটে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি, "সংসারে যাহা কিছু আছে সবই আপন আপন প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, ইহাকে নিগ্রহ করিলে কি হইবে?" যদি শুধু এই কথাটিই ধরা হয় তাহা হইলে মনে হয় যে আত্মার উপর প্রকৃতির ক্ষমতা অসীম, অনতিক্রম্য; সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি,—জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুসারে কাজ করিয়া থাকেন।" ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই গীতা আদেশ করিয়াছে, আমাদের কর্ম্মে যেন আমরা আমাদের প্রকৃতিকেই ঠিক ভাবে অনুসরণ করি।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩।৩৫

"স্বধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুও ভাল, কিন্তু পর-ধর্ম্মের অনুসরণ বিপজ্জনক।" এই "স্বধর্ম্ম" বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমরা তখনই বুঝিব যখন গীতার শেষের দিকে যেখানে পুরুষ, প্রকৃতি এবং গুণত্রয় সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যান আছে, সেখানে আমরা উপস্থিত হইব; স্বধর্ম্মের অনুসরণ বলিতে নিশ্চয়ই ইহা বুঝায় না যে আমরা যাহাকে আমাদের প্রকৃতি বলি সেই প্রকৃতি আমাদিগকে যেদিকে টানিবে, পাপপুণ্য নির্ব্বিশেষে আমাদিগকে সেই দিকেই যাইতে হইবে। কারণ, উল্লিখিত শ্লোক দুইটির (৩।৩৩ এবং ৩।৩৫) মাঝখানে গীতা আর একটি উপদেশ দিয়াছে:—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩।৩৪

—"প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়েই রাগ ও দ্বেষ ওত পাতিয়া বসিয়া আছে; তাহাদের কবলে পড়িও না, তাহারা আত্মার শ্রেয়োমার্গে পরম শত্রু।" ইহার অব্যবহিত পরে অর্জ্জুন যখন প্রশ্ন তুলিলেন যে আমাদের প্রকৃতির অনুসরণ করাতে যদি কোন দোষ নাই তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কে যেন আমাদিগকে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক পাপে প্রবৃত্ত করে, সে সম্বন্ধে কি? তখন তাহার উত্তরে গুরু বলিলেন, কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ,—ইহা কাম এবং কামের সহচর ক্রোধ, ইহারা প্রকৃতির দ্বিতীয় গুণ রজোগুণের সন্তান, এই কাম বা বাসনা আত্মার পরম শত্রু, ইহাকে বধ করিতেই হইবে। গীতা বলিয়াছে, মুক্তির জন্য প্রথমেই চাই পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করা এবং গীতা সর্ব্বদা আত্মজয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ, "সংযমের" উপদেশ দিয়াছে, মনকে, ইন্দ্রিয়কে, সমগ্র নিম্ন প্রকৃতিকে সংযত করিতে বলিয়াছে।

অতএব এখানে একটা প্রভেদ করা আবশ্যক; প্রকৃতির যাহা মূল স্বরূপ, নিজস্ব অবশ্যম্ভাবী খেলা তাহাকে দমন করিবার, চাপিয়া দিবার, নিগ্রহ করিবার চেষ্টা বৃথা; কিন্তু এই গভীরের খেলা ছাড়া প্রকৃতির একটা বাহিরের খেলা আছে, ইহা তাহার স্বরূপের বিকৃতি, তাহার ভ্রান্ত, অবান্তর, লক্ষ্যশূন্য খেলা—এই খেলাকে সংযত করিতেই হইবে। "নিগ্রহ" ও "সংযম" এই

দুইয়ের মধ্যেও প্রভেদ রহিয়াছে,—জোর করিয়া দমন করা, চাপিয়া দেওয়া "নিগ্রহ", আর নিয়মিত সদ্ব্যবহারের দ্বারা আয়ত্তাধীন করাই "সংযম"। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রকৃতির উপর জোর করাই নিগ্রহ, ইহাতে পরিণামে জীবের স্বাভাবিক শক্তি-গুলিকে অবসন্ন করা হয়, আত্মানম্ অবসাদয়েৎ; আমাদের উপরের আত্মার দ্বারা আমাদের নীচের আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করাই সংযম—ইহাতে আমাদের ঐ স্বাভাবিক শক্তি সকল আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কাজ করিবার সুযোগ পায় এবং চূড়ান্ত দক্ষতার সহিত আপন আপন কাজ করিতে পারে,—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। এই সংযমের প্রকৃত স্বরূপ কি গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে তাহা বেশ পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছে।

> উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
>
> আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৬।৫
>
> বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
>
> অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬।৬

—"আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে, আত্মাকে কখনও (ভোগ অথবা দমনের দ্বারা) অবসন্ন করিও না; কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু। সেই ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু যাহার মধ্যে (উপরের) আত্মা (নীচের) আত্মাকে জয় করিয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার (উপরের) আত্মাকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে তাহার (নীচের) আত্মা

শত্রুবৎ এবং শত্রুর স্থায়ই কার্য্য করে।" যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে জয় করিয়াছেন এবং পূর্ণ আত্মজয়ের, আত্ম-লাভের শান্তিতে পৌছিয়াছেন তাঁহার পরমাত্মা তাঁহার বাহ্য মানবীয় চেতনাতেও সুপ্রতিষ্ঠ, "সমাহিত" হয়।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৬।৭

অন্য কথায় বলিতে গেলে, উপরের আত্মার দ্বারা নীচের আত্মাকে জয় করা, প্রাকৃত সত্ত্বাকে আধ্যাত্মিক সত্ত্বার দ্বারা জয় করা, ইহাই মানুষের মুক্তি ও সিদ্ধি লাভের পন্থা।

তাহা হইলে আমরা এখানে দেখিতে পাইতেছি যে প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্বের দৌড় বড় বেশী দূর নহে, কতটুক সীমার মধ্যে এবং ঠিক কি অর্থে ইহা সত্য তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি। প্রকৃতির বশ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া কেমন করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায় ইহা আমরা খুব ভাল করিয়া দেখিতে পাই, যদি আমরা অনুধাবন করি যে প্রকৃতির ক্রমবিকাশপর্য্যায় অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রকৃতির গুণগুলির ক্রিয়া কিরূপ। প্রকৃতির সর্ব্বনিম্নস্তরে যে সকল বস্তু রহিয়াছে সে সকলে তমোগুণেরই পূর্ণ আধিপত্য, তাহারা এখনও আত্ম-চেতনার আলোক লাভ করে নাই এবং তাহারা প্রকৃতির স্রোতের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে চালিত হয়। জড় পরমাণুর (atom) মধ্যেও একটা ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে এই ইচ্ছা স্বাধীন ইচ্ছা নহে কারণ ইহা

যান্ত্রিক (machanical) এবং বাস্তবিক পক্ষে এই ইচ্ছাশক্তি ঐ পরমাণুর অধিকারে নহে, কিন্তু ঐ পরমাণুই এই ইচ্ছাশক্তির অধিকারে। এখানকার বুদ্ধিকে * সাংখ্য যে "জড়" বলিয়াছে তাহা সত্য এবং খুবই স্পষ্ট, ইহা একটা জড় অচেতন তত্ত্ব, এখানে আত্মচৈতন্যের আলোক এখনও বাহিরে দেখা দিতে পারে নাই,—তাহার বোধশক্তি, ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে বলিয়া পরমাণুর নিজের কোন জ্ঞান নাই ; অপ্রবৃত্তি, অজ্ঞানরূপ তমোগুণ ইহাকে সম্পূর্ণ ভাবে অধিকার করিয়া আছে, রজঃকে, সত্ত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছে,—সত্য বটে যে প্রকৃতি এই প্রকারের বস্তু সকলকে বিরাট কর্ম্ম করাইতেছে, কিন্তু জড় যন্ত্রস্বরূপে, যন্ত্রারূঢ়ম্ মায়য়া। ইহারই উপরের স্তরে উদ্ভিদ, এখানে রজঃ বাহিরে পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছে, জীবনীশক্তি দেখা দিয়াছে এবং আমরা যাহাকে সুখ দুঃখ বলিয়া অনুভব করি সেই স্নায়বিক প্রতিঘাতের (nervous reactious) ক্ষমতাও দেখা দিয়াছে, কিন্তু সত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ, ইহা এখনও পরিস্ফুট হইয়া চেতন বুদ্ধির আলোক জাগাইতে পারে নাই ; এখনও সবই জড়, অচেতন বা অর্দ্ধচেতন, এখনও তমঃ রজঃ অপেক্ষা প্রবল এবং দুইয়ে মিলিত হইয়া সত্ত্বকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

ইহার উপরের স্তরে হইতেছে, পশু ; যদিও তমঃ এখনও

---

* প্রকৃতিতে যে বোধ শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে তাহারই সাধারণ নাম, "বুদ্ধি"।

খুবই প্রবল, যদিও আমরা পশুকে তামসিক সর্গেরই অন্তর্গত বলিতে পারি তথাপি এখানে তমঃের বিরুদ্ধে রজঃের শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী এবং রজোগুণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তির উচ্চতর প্রকাশ, কাম, ক্রোধ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সম্ভব হইয়াছে ; সত্ত্বও পরিস্ফুট হইতেছে এবং ইহা এখনও নীচের ক্রিয়ার অধীন হইলেও ইহা হইতে চেতন মনের প্রথম আলোক, কতকটা অহংজ্ঞান, স্মৃতি, এক প্রকারের চিন্তা, বিশেষতঃ সহজাত সংস্কার (instinct) ও পশুসুলভ সাক্ষাৎজ্ঞান (intuition) সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এখনও বুদ্ধি চেতনার পূর্ণ আলোক বিকাশ করে নাই ; অতএব পশুর কার্য্যের জন্য কোন দায়িত্ব তাহার উপর চাপান যায় না। যেমন জড় অণুর অন্ধ চালচলনের জন্য অণুকে দোষ দেওয়া যায় না, পোড়াইবার জন্য অগ্নিকে এবং ধ্বংস করিবার জন্য ঝড়কে দোষ দেওয়া যায় না, তেমনিই হত্যা ও গ্রাস করার জন্য ব্যাঘ্রকেও কোন দোষ দেওয়া যায় না। ব্যাঘ্র যদি জবাব দিতে পারিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মানুষের মত বলিত যে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, কর্ত্তার অহঙ্কার তাহাতে থাকিত এবং সে বলিত—"আমি বধ করি, আমি গ্রাস করি" ; কিন্তু, আমরা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে বাস্তবিক পক্ষে ব্যাঘ্র বধ করে না, ব্যাঘ্রের ভিতরের প্রকৃতিই বধ করে, ব্যাঘ্র গ্রাস করে না, ব্যাঘ্রের ভিতরের প্রকৃতিই গ্রাস করে ; যদি সে বধ করিতে বা গ্রাস করিতে বিরত হয় তবে সেটা স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নহে, সেটা ক্ষুধার অভাব, ভয় বা

আলস্যের দ্বারা এবং ইহা তাহার মধ্যে প্রকৃতির আর একটি গুণের ক্রিয়া, তমোগুণের ক্রিয়া। ব্যাঘ্রের ভিতরের প্রকৃতি যেমন বধ করে তেমনি সেই প্রকৃতিই আবার বধকার্য্য হইতে বিরত হয়। ব্যাঘ্রের মধ্যে যে আত্মাই থাকুক তাহা নির্ব্বিরোধে প্রকৃতির কার্য্যে সায় দেয়। ব্যাঘ্র যখন আলস্যের বশে কোন কর্ম্ম করে না তখন এই আত্মা যেরূপ নিশ্চেষ্ট, ব্যাঘ্র যখন তীব্র হিংসার কার্য্যে নিযুক্ত তখনও সেই আত্মা সেইরূপেই নিশ্চেষ্ট। জড় পরমাণুর ন্যায় পশুও তাহার প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়ার বশেই কর্ম্ম করে, সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ, যেন যন্ত্রে আরূঢ়, যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।

তাহা হউক, কিন্তু অন্ততঃ মানুষের মধ্যে ত অন্য এক রকমের ক্রিয়া আছে, একটা স্বাধীন আত্মা আছে, একটা দায়িত্বজ্ঞান আছে, প্রকৃতি ছাড়া, মায়ার যান্ত্রিক কৌশল ছাড়া অন্য একজন প্রকৃত কর্ত্তা আছে? এইরূপই মনে হয় কারণ মানুষের মধ্যে চেতন বুদ্ধি রহিয়াছে; দ্রষ্টা পুরুষের আলোকে এই বুদ্ধি পূর্ণ,—মনে হয় পুরুষ এই বুদ্ধির ভিতর দিয়া দেখে, বুঝে, অনুমতি দেয় বা নিষেধ করে, সম্মত হয় বা অসম্মত হয়, বাস্তবিক মনে হয় যে এইবারে বুঝি পুরুষ তাহার প্রকৃতির প্রভু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ ব্যাঘ্রের মতন বা অগ্নির মতন বা ঝড়ের মতন নহে; মানুষ খুন করিয়া সাফাই দিতে পারে না যে, "আমি আমার প্রকৃতির অনুসারে কর্ম্ম করিতেছি" এবং সে এইরূপ সাফাই দিতে পারে

না কারণ তাহার প্রকৃতি ব্যাঘ্র, ঝড় বা অগ্নির প্রকৃতির মতন নহে অতএব ব্যাঘ্র, ঝড় বা অগ্নির স্বধর্ম্ম বা কর্ম্মের নীতি তাহার স্বধর্ম্ম বা কর্ম্মের নীতি হইতে পারে না। তাহার একটা চেতন বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে অর্থাৎ একটা বুদ্ধি আছে, তাহার কার্য্যে তাহাকে এই বুদ্ধিরই অনুসরণ করিতে হইবে। যদি সে তাহা না করে, যদি সে উত্তেজনার বশে, রিপুর তাড়নায় অন্ধভাবে কর্ম্ম করে তাহা হইলে তাহার স্বধর্ম্ম যথাযথ অনুষ্ঠান করা হয় না, "স্বধর্ম্মঃ সু-অনুষ্ঠিতঃ" হয় না, তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্বের যোগ্য কর্ম্ম করা হয় না, কেবল পশুর মতনই কর্ম্ম করা হয়। সত্য বটে যে সে যে কোন কর্ম্মই করুক না কেন, রজোগুণ তাহার বুদ্ধিকে ধরিয়া সেই কর্ম্ম সমর্থন করাইয়া লয়, তবুও যেমন করিয়া হউক বুদ্ধির মত লইতেই হয় অন্ততঃ বুদ্ধিকে জানাইতে হয়, তা সে কর্ম্মের আগেই হউক আর পরেই হউক। তাহা ছাড়া, মানুষের মধ্যে সত্ত্ব জাগ্রত, এই সত্ত্ব কেবল সচেতন বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছারূপে কার্য্য করে না, পরন্তু আলোকের সন্ধান করা, সঠিক জ্ঞান ও সেই জ্ঞানানুযায়ী সঠিক কর্ম্মের অনুসন্ধান করা, আমি ছাড়া আরও লোক আছে এবং আমার উপর তাহাদের দাবি আছে, সহানুভূতির সহিত ইহা উপলব্ধি করা, আমাদের নিজ প্রকৃতির উপরের স্বরূপ, উপরের ধর্ম্ম জানিবার ও অনুসরণ করিবার চেষ্টা করা, এবং পুণ্য, জ্ঞান ও সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে যে উচ্চতর শান্তি ও আনন্দ আইসে তাহা ধারণা করা,—এই সবও মানুষের

মধ্যে সত্ত্বের ক্রিয়া। মানুষের মধ্যে একটা অস্পষ্ট জ্ঞান রহিয়াছে যে তাহাকে তাহার সাত্ত্বিক প্রকৃতির দ্বারা তাহার রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে শাসন করিতে হইবে এবং তাহার সাধারণ মনুষ্যত্বের সিদ্ধি বা উৎকর্ষতা এই পথেই।

কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রাধান্যই কি মুক্তি? মানুষের সাত্ত্বিক ইচ্ছাই কি স্বাধীন ইচ্ছা? না,—চেতনার উপরের স্তরেই প্রকৃত স্বাধীনতা আছে, গীতা তাহাই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে যে মানুষের মধ্যে সাত্ত্বিকতার প্রাধান্য হইলেও তাহা স্বাধীনতা নহে। তখনও বুদ্ধি ও ইচ্ছা প্রকৃতিরই যন্ত্র এবং এই বুদ্ধি ও ইচ্ছার ক্রিয়া যতই সাত্ত্বিক হউক না কেন সেখানে প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, আত্মা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় মায়ার দ্বারাই চালিত হয়। অন্ততঃ পক্ষে ইহা ঠিকই যে আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতার দশ অংশের নয় অংশ সম্পূর্ণ ভ্রম; এই ইচ্ছা কখন কি হইবে তাহা নিজের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না, কিন্তু আমাদের অতীত, আমাদের বংশ, আমাদের শিক্ষা, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারাই তাহা নির্ণীত হয়; প্রকৃতি অতীতে আমাদের ভিতর যাহা কিছু করিয়াছে সেই সমস্তের বিরাট সমষ্টিকে আমরা "কর্ম্ম" নাম দিয়া থাকি, ইহা আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে; আমাদের এই "কর্ম্ম" এবং সমগ্র বিশ্ব আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা ঠিক করিয়া দেয় যে আমরা কি হইব, কোন্ মুহূর্ত্তে আমাদের ইচ্ছা কি হইবে, এমন কি কোন মুহূর্ত্তে আমাদের ইচ্ছার ক্রিয়া

কি হইবে। আমাদের "অহং" সর্ব্বদা ইহার "কর্ম্মে"র সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে, এবং বলে "আমি করিয়াছি", "আমি ইচ্ছা করি", "আমি দুঃখ ভোগ করি", কিন্তু সে যদি নিজের দিকে চাহিয়া দেখে বুঝে যে সে কিরূপে গঠিত হইয়াছে তাহা হইলে সে পশুর সম্বন্ধেও যেমন, মানুষের সম্বন্ধেও তেমনিই বলিতে বাধ্য হয় যে "আমার ভিতর প্রকৃতি ইহা করিয়াছে, আমার ভিতর প্রকৃতি ইচ্ছা করে"। আর যদি সে ইহাকে সংশোধন করিয়া বলে "আমার প্রকৃতি" তাহার অর্থ কেবল ইহাই হয় যে "এই ব্যক্তি বিশেষে প্রকৃতি নিজে এই বিশেষরূপ ধারণ করিয়াছে।" জগতের এই তত্ত্বটা বিশেবভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই বৌদ্ধগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে সমস্তই "কর্ম্ম", আত্মা বলিয়া বস্তুতঃ কিছু নাই, উহা কেবল অহঙ্কৃত মনের ভ্রমমাত্র। "অহং" যখন মনে করে "আমি এই পুণ্য কর্ম্ম করিতে সঙ্কল্প করিতেছি, ঐ পাপকর্ম্ম বর্জ্জন করিতেছি" তখন প্রকৃতির সত্ত্বগুণের একটি ক্রিয়াকে সে নিজক্রিয়া বলিয়া ভ্রম করে—বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিই বুদ্ধির ভিতর দিয়া এক প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, আর একপ্রকার কর্ম্ম বাছিয়া লয়; প্রকৃতির এই ক্রিয়াকে "অহং" নিজের ক্রিয়া বলিয়া মনে করে, যেমন ঘূর্ণীয়মান চক্রের উপরিস্থিত মক্ষিকা চক্রেরই সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে মনে করিতে পারে যে সে নিজেই ইচ্ছা করিয়া ঘুরিতেছে। সাংখ্য যেমন বলে, নিশ্চেষ্ট

দ্রষ্টা পুরুষের আনন্দের নিমিত্ত প্রকৃতি আমাদের মধ্যে বিভিন্নরূপ ধারণ করিতেছে, বিভিন্ন সঙ্কল্প করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে।

যদিও সাংখ্যের এই কথা সংশোধিত করিয়া লওয়া আবশ্যক, (কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা আমরা পরে দেখিব)' তথাপি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার যে "স্বাধীনতার" কথা বলিয়া থাকি তাহার উপর অন্যান্য শক্তির এত প্রভাব যে ঐ স্বাধীনতা নিতান্ত আপেক্ষিক (relative) এবং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এই স্বাধীনতার শক্তি যখন চরমে উঠে তখনও তাহা ঈশ্বরত্বের (mastery) সমান হয় না। এই স্বাধীনতা যে ঘটনাস্রোতের তীব্রবেগ রোধ করিবে, সে ভরসা করিতে পারা যায় না। আমাদের ইচ্ছা যত অধিক সাত্ত্বিক হউক না কেন, রজঃ ও তমঃ তাহাকে এমন ভাবে ঘিরিয়া থাকে, তাহার সহিত এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে ঐ ইচ্ছা কেবল আংশিক ভাবেই সাত্ত্বিক হইতে পারে এবং কখনই রজঃ বা তমোগুণের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিতে পারে না; তাই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মেও, তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ববিদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অজ্ঞাতে নানারূপ আত্মপ্রতারণা প্রবেশ করিয়াছে। যখন আমরা মনে করি যে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতেছি, তখন আমাদের ঐ কর্ম্মের পশ্চাতে যে কত শক্তি লুকাইয়া থাকে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারাও তাহা ধরিতে পারা যায় না; যখন আমরা মনে করি

যে আমরা অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়াছি, তখনও আমাদের মধ্যে অহঙ্কার লুকাইয়া থাকে,—যেমন পাপীর ভিতর থাকে, তেমনিই সাধুর ভিতরও থাকে। আমাদের কর্ম্ম এবং কর্ম্মের উৎস সম্বন্ধে যখন প্রকৃত ভাবে আমাদের চক্ষু খুলিয়া যায়, তখন আমরা গীতার মতনই বলিতে বাধ্য হই, গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে—"প্রকৃতির গুণ সকল পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতেছে।"

এইজন্য সত্ত্বগুণের খুব বেশী প্রাধান্য হইলেও তাহা প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা নহে। কারণ, গীতা দেখাইয়াছে যে অন্যান্য গুণের ন্যায় সত্ত্বও বন্ধন করে এবং অন্যান্য গুণের ন্যায়ই বাসনা ও অহঙ্কারের দ্বারাই বন্ধন করে ; সত্ত্বের বাসনা মহত্তর, সত্ত্বের অহঙ্কার শুদ্ধতর, কিন্তু যতদিন এই দুইটি—বাসনা ও অহঙ্কার—যে কোন আকারে জীবকে ধরিয়া থাকে, ততদিন কোন স্বাধীনতা নাই। যে মনুষ্য সাধু, জ্ঞানী, তাঁহার ভিতর সাধুর "অহং" রহিয়াছে, জ্ঞানীর "অহং" রহিয়াছে এবং তিনি এই সাত্ত্বিক অহঙ্কারের তৃপ্তি করিতে চান ; তিনি নিজের জন্যই সাধুতা চান, জ্ঞান চান। যখন আমরা অহঙ্কারের তৃপ্তি চাই না, যখন আমাদের ক্ষুদ্র "আমি"কে কেন্দ্র করিয়া সঙ্কল্প করি না, চিন্তা করি না, ইচ্ছা করি না কেবল তখনই হয় প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা। অন্য কথায় বলিতে গেলে, স্বাধীনতা, চরম স্বরাজ্য তখনই আরম্ভ হইবে যখন প্রাকৃত আত্মার উপরে আমরা পরমাত্মাকে দেখিতে পাইব, ধরিতে পারিব,—আমাদের

ক্ষুদ্র "আমি", আমাদের অহঙ্কার, এই পরমাত্মাকে দেখিতে দেয় না, গভীর অন্ধকারের ছায়ায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। ইহা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন আমরা আমাদের মধ্যে প্রকৃতির উপর অবস্থিত এক পরমাত্মাকে দেখিতে পাইব, আমাদের ব্যক্তিগত সত্তায় ও চেতনায় তাহার সহিত এক হইব এবং ব্যক্তিগত কর্ম্মে আমাদের প্রকৃতিকে ভগবদিচ্ছার যন্ত্র মাত্র করিয়া দিব,—কেবলমাত্র সেই ইচ্ছাই সকলের উপরে এবং প্রকৃতভাবে স্বাধীন ও মুক্ত। ইহার জন্য আমাদিগকে গুণত্রয়ের বহু ঊর্দ্ধে উঠিতেই হইবে, ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে; কারণ পরমাত্মা সত্ত্বগুণেরও উপরে। সেখানে উঠিতে হইলে আমাদিগকে সত্ত্বের ভিতর দিয়াই উঠিতে হইবে বটে, কিন্তু যতক্ষণ আমরা সত্ত্বকে ছাড়াইয়া না যাইব ততক্ষণ সেখানে পৌছিতে পারিব না; "অহং" হইতেই আমরা পরমাত্মায় উঠি, কিন্তু "অহং"কে ছাড়াইলে তবেই সেখানে পৌছিতে পারি। সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র, ব্যাকুল, আবেগময়, উল্লাসময় বাসনার দ্বারা আমরা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই বটে; কিন্তু কেবল তখনই আমরা নিশ্চিত হইয়া তাহাতে বাস করিতে পারি যখন আমাদের সমস্ত বাসনা দূর হইয়া গিয়াছে। এক অবস্থায় আমাদিগকে মুক্তির কামনা হইতেও মুক্ত হইতে হইবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রিগুণাতীত

প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্বের সীমা কতদূর তাহা আমরা দেখিলাম, এই নিয়ন্তৃত্বের অর্থ কেবল এই যে, আমরা যে "অহং" হইতে কর্ম্ম করি তাহা নিজেই প্রকৃতির ক্রিয়ার একটি যন্ত্রবিশেষ এবং সেইজন্যই তাহা প্রকৃতির বশ্যতা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অহংয়ের যে ইচ্ছা তাহা প্রকৃতির দ্বারাই নির্ণীত ইচ্ছা, আমাদের স্বভাবেরই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা আমাদের স্বভাব যেরূপ গঠিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এই ইচ্ছা সেই স্বভাবেরই অংশ এবং আমাদের মধ্যে এইরূপে গঠিত স্বভাব ও ইচ্ছার দ্বারাই বর্ত্তমানে আমরা কি কর্ম্ম করিব তাহা নির্দ্ধারিত হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পরে আমরা কি করিব তাহা আমাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা নির্ণীত হইলেও, আমরা সর্ব্বপ্রথমে যে কর্ম্ম করি তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই বাছিয়া লই এবং এই প্রাথমিক কর্ম্মে আমাদের স্বাধীনতা আছে এবং আমাদের পরবর্ত্তী কর্ম্মসমূহ এই প্রাথমিক কর্ম্মের উপরই নির্ভর করে, সেই জন্যই আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু, প্রকৃতিতে এমন প্রাথমিক কর্ম্ম কোথায় আছে যাহার পূর্ব্বে আর কোন কর্ম্মই নাই? আমাদের

এমন বর্ত্তমান স্বভাব কোথায় আছে যাহা আমাদের অতীত স্বভাবানুযায়ী কৃত কর্ম্মের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ণীত হয় নাই? প্রাথমিক স্বাধীন কর্ম্মের ধারণা এইজন্যই আমাদের মনে উঠে যে আমরা আমাদের বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকেই চাহিয়া থাকি, ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হই, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান হইতে পশ্চাতের দিকে, অতীতের দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া দেখি না, এইজন্য বর্ত্তমান এবং বর্ত্তমানের পরিণামফলই আমাদের মনে বেশ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান যে সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের অতীতেরই ফল সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট থাকে; এই অতীতকে আমরা দেখি যেন মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা কথা কই, কর্ম্ম করি যেন প্রতি নূতন মুহূর্ত্তেই আমরা সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত ও স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা বলিতে পারি, যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এরূপ কোন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই, আমরা কখন কি করিব না করিব তাহা বাছিয়া লইবার কোন অধিকার আমাদের নাই।

অবশ্য আমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা ক্রিয়া করিতেছে, তাহাকে সর্ব্বদা কয়েকটি সম্ভব কর্ম্মের মধ্যে কোন একটি কর্ম্ম বাছিয়া লইতে হয়, কারণ প্রকৃতি সর্ব্বদা এইরূপই করিতেছে; এমন কি যখন আমরা নিশ্চেষ্ট, কোন কর্ম্ম ইচ্ছা করি না, তখনও আমাদের মধ্যে প্রকৃতির ইচ্ছাই এই নিশ্চেষ্টতা, নিষ্ক্রিয়তা বাছিয়া লয়, প্রকৃতির ইচ্ছা অনুসারেই আমরা কর্ম্ম হইতে বিরত

হই ; জড় পরমাণুর মধ্যেও একটা ইচ্ছা সকল সময়েই ক্রিয়া করিতেছে, বাছিয়া লইতেছে। প্রকৃতির ইচ্ছার সহিত আমরা আমাদের "অহং"কে কতটা জড়াই তাহা লইয়াই সমস্ত প্রভেদ ; যখন আমরা নিজেদিগকে এইরূপে জড়াই, তখন প্রকৃতির ইচ্ছাকে আমরা বলি আমাদের ইচ্ছা, বলি যে ইহা স্বাধীন ইচ্ছা এবং আমরাই ইচ্ছা করি, কর্ম্ম করি। তবে ইহা ভুল হউক আর না হউক, মিথ্যা হউক আর না হউক, আমরা যে মনে করি "আমাদের ইচ্ছা", "আমাদের কর্ম্ম", এইরূপ ধারণা একেবারে বৃথা নয়, নিষ্প্রয়োজনীয় নয়, প্রকৃতির প্রত্যেক জিনিষেরই সার্থকতা আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে। এইরূপ ধারণার ফলে আমাদের মধ্যে প্রকৃতি ক্রমশঃ অন্তরস্থিত গুপ্ত পুরুষকে জানিতে পারে ; এই জ্ঞান যত বর্দ্ধিত হয়, কর্ম্মেরও তত অধিক বিকাশ ও স্ফুরণ হয় ; এই অহংভাব ও "আমার ইচ্ছা" ভাব সহায়ে প্রকৃতির উচ্চবিকাশ সম্ভব হয়, ইহার দ্বারা প্রকৃতি তামসিক স্বভাবের নিশ্চেষ্টতা ও আলস্য হইতে রাজসিক স্বভাবের ভোগাকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টাতে উঠে এবং রাজসিক স্বভাবের তৃষ্ণা ও দ্বন্দ্ব হইতে উঠিয়া সাত্ত্বিক স্বভাবের উচ্চতর আলোক, সুখ ও পবিত্রতা লাভ করে। প্রাকৃত মনুষ্য যে আপেক্ষিক (relative) আত্মজয় লাভ করে তাহা তাহার প্রকৃতির নিম্ন-ভাবের উপর উচ্চভাবের প্রাধান্য ; এইরূপ প্রাধান্য তখনই সম্ভব হয় যখন নীচের গুণকে জয় করিতে উপরের গুণের যে চেষ্টা সেই চেষ্টাকে মানুষ "আমার" চেষ্টা বলিয়া ধারণা করে, "অহং"

কে উপরের গুণের ক্রিয়ার সহিত এক করিয়া দেখে। স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা ভ্রান্ত হউক আর না হউক, ইহা প্রকৃতির কার্য্যের একটি আবশ্যকীয় কৌশল, মানুষের উন্নতি লাভের পথে ইহা প্রয়োজনীয় এবং যতক্ষণ সে আরও উচ্চতর সত্যের ধারণা করিতে সক্ষম না হইতেছে ততক্ষণ তাহার এই স্বাধীনতার ধারণা নষ্ট হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। যদি বলা যায় যে প্রকৃতি মানুষকে ঠকাইয়া নিজের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লয় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার ধারণাটা সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতারণা তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে যে এই প্রতারণাটা মানুষেরই কল্যাণের জন্য এবং ইহা ছাড়া তাহার মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ কখনই সম্ভব হইত না।

কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছার ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রম নহে, কেবল ইহাকে ঠিক যেভাবে, যেখানে দেখিতে হইবে সেরূপ দেখা হয় না এবং এইরূপ না দেখাটাই ভুল। "অহং" মনে করে যে সেই বুঝি প্রকৃত আত্মা, সেই যেন কর্ম্মের প্রকৃত কেন্দ্র, সব যেন তাহারই জন্য, এই ভাবে সে কর্ম্ম করে এবং এইখানেই তাহার ভুল। সে যে মনে করে আমাদের মধ্যে, আমাদের প্রকৃতির এই কর্ম্মেরই মধ্যে এমন এক বস্তু রহিয়াছে যে প্রকৃতির কর্ম্মের প্রকৃত কেন্দ্র এবং তাহার জন্যই সব কিছু—এরূপ মনে করার মধ্যে কোন ভ্রম বা ভুল নাই; কিন্তু এই বস্তু "অহং" নহে, ইহা আমাদের হৃদিস্থিত গুপ্ত ঈশ্বর, দিব্য পুরুষ এবং তাঁহার অংশ জীব,—এই জীব আর "অহং" এক বস্তু নহে। আমাদের মধ্যে

প্রকৃত এক আত্মা রহিয়াছেন, তিনি সকলের প্রভু, তাঁহারই জন্য, তাঁহারই আদেশে প্রকৃতি সমুদয় কর্ম্ম করিতেছে, ইহা সত্য ; এই সত্যেরই বিকৃত চূর্ণিত ছায়া আমাদের মনের উপরে পড়িয়া হয় আমাদের অহংয়ের অহমিকা। সেইরূপই অহংয়ের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণাও আমাদের মধ্যে স্বাধীন আত্মার যে স্বাধীন ইচ্ছা সেই সত্যেরই বিকৃত ধারণা ; প্রকৃতির যে ইচ্ছা তাহা আত্মার ইচ্ছারই আংশিক ও পরিবর্ত্তিত ছায়া,—আংশিক ও পরিবর্ত্তিত কারণ প্রকৃতির ইচ্ছা কালের পর্য্যায়ক্রম অনুসারে বিকশিত হয়, অনবরত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ক্রিয়া করে তাহাতে অতীতের পূর্ণ স্মৃতি নাই, ভবিষ্যতের ফলাফল ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান নাই। কিন্তু ভিতরের (আত্মার) যে ইচ্ছা তাহা কালপর্য্যায়ের অতীত এবং ভূত ভবিষ্যৎ অবগত ; ইহা বিজ্ঞানের পূর্ণ আলোকে যাহা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি করে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টাই আমাদের মধ্যে প্রকৃতির কর্ম্ম, কিন্তু আমাদের অহঙ্কার ও অজ্ঞান এই চেষ্টার বিষম বাধা স্বরূপ হয়।

কিন্তু, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইতে আমাদের এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন আমরা আমাদের সত্তার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে সক্ষম হইব এবং তখন আমাদের অহংয়ের স্বাধীন ইচ্ছার ভ্রম নিশ্চয়ই দূর হইয়া যাইবে। অহংয়ের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা বর্জ্জিত হইলেই যে কর্ম্ম বন্ধ হইবে তাহা নহে, কারণ প্রকৃতিই কর্ত্তা এবং প্রকৃতির ক্রমিকবিকাশে অহংভাবের উদ্ভব হইবার পূর্ব্বে যেমন প্রকৃতি কর্ম্ম করিত এইভাব পরিত্যক্ত হই-

বার পরও তাহার কর্ম্ম চলিতে থাকিবে। বরং যে মানুষ এই অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়াছে, তাহার মধ্যে বৃহত্তর কর্ম্মের বিকাশ করা প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে; কারণ তাহার মন আরও ভালরূপে বুঝিতে পারে যে পূর্ব্বকৃত স্বকর্ম্মের ফলে তাহার প্রকৃতি বর্ত্তমানে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আরও ভালরূপে জানিতে পারে যে কি কি পারিপার্শ্বিক শক্তি তাহার প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করিয়া তাহার বিকাশের বাধা বা সহায় হইতেছে, তাহার ভিতরে কত শক্তি ও মহত্ত্ব বিকাশের অপেক্ষা করিতেছে সে সম্বন্ধেও খুব স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে; এবং তাহার মধ্যে এই যে সকল বৃহত্তর সম্ভাবনার সন্ধান সে পায় সে সম্বন্ধে আত্মা —পুরুষের অনুমতি এইরূপ অহঙ্কারশূন্য মনের ভিতর দিয়া আরও সহজে আসিতে পারে এবং তাহাদের বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনে এইরূপ মন প্রকৃতির হস্তে আরও অবাধ (বাধাশূন্য) যন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু, এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছার ভাব বর্জ্জন যেন কেবল নিয়তিবাদ (fatalism) না হয়; আমাদের মধ্যে যে প্রকৃত আত্মা রহিয়াছে বুদ্ধি তাহার সন্ধান পাইল না, ভাবিতে লাগিল যে প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই সব সংঘটিত হইতেছে, এরূপ হইলে চলিবে না; কারণ তাহা হইলে কেবলমাত্র অহংকেই আত্মা বলিয়া আমাদের ধারণা থাকিয়া যাইবে, এবং তখনও আমাদের অহংকে ধরিয়াই আমরা কর্ম্ম করিব কারণ এই অহং প্রকৃতির একটি যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রকৃতি এই অহংকে এবং আমাদের ইচ্ছাকে যন্ত্র করিয়া আপনার কাজ করিয়া

যাইবে এবং এই নিয়তিবাদে আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি হইবে না, কেবল আমাদের মানসিক ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র।

প্রকৃতি যে আমাদের অহঙ্কৃত সত্ত্বা ও কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে কেবল এই বাহ্যিক (Phenomenal) সত্যটুকু গ্রহণ করিব, আমাদের পরাধীনতাটুকুই উপলব্ধি করিব; কিন্তু আমাদের ভিতরে গুণ সকলের ক্রিয়ার উপরে যে অজ আত্মা রহিয়াছে তাহাকে দেখিতে পাইব না; আমাদের মুক্তির পথ কোন দিকে তাহা দেখিতে পাইব না। প্রকৃতি এবং অহং লইয়াই আমাদের সব নহে; আমাদের মধ্যে রহিয়াছে স্বাধীন মুক্ত আত্মা, "পুরুষ"।

কিন্তু, পুরুষের এই স্বাধীনতা কিসে? প্রচলিত সাংখ্য-দর্শনের পুরুষ তাহার সত্ত্বার স্বরূপে স্বাধীন, মুক্ত, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়, "অকর্ত্তা" বলিয়াই সে মুক্ত; সে প্রকৃতিকে তাহার কর্ম্মের ছায়া নিষ্ক্রিয় আত্মার উপর ফেলিতে দেয় বলিয়াই সে বাহ্যতঃ (Phenomenalty) গুণের দ্বারা বদ্ধ, এবং পুরুষের মুক্ত অবস্থা ফিরিয়া পাইতে হইলে প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়া ও প্রকৃতির কার্য্য বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে কোন মানুষ যদি "আমি কর্ত্তা", বা "আমার কর্ম্ম" এরূপ অহঙ্কার বর্জ্জন করে, যদি গীতার উপদেশ মত নিজেকে অকর্ত্তা, আত্মানম্ অকর্ত্তারম্ দেখে, সমস্ত কর্ম্ম তাহার নহে, প্রকৃতির, প্রকৃতির গুণের খেলা—এই উপলব্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা

হইলে পরিণাম কি একইরূপ হইবে না ? সাংখ্যের পুরুষ কিছুই করে না কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে অনুমতি দেয়, কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির ; স্বরূপতঃ সে সাক্ষী ও অনুমন্তা ও ভর্ত্তা কিন্তু বিশ্ব নিয়ন্তা নহে, বিশ্বের চৈতন্যময় পরিচালক ঈশ্বর নহে। কোন দ্রষ্টা যেরূপ কোন নাটকাভিনয় দর্শন করে এবং তাহাতে সায় দেয় কিন্তু অভিনয় কার্য্যে কোনরূপ যোগদান করে না, সাংখ্যের পুরুষ সেইরূপ দ্রষ্টা ও অনুমন্তা, ইহা সে আত্মা নয় যে আত্মা অভিনয়ের সমগ্র আয়োজন ও পরিচালনা নিজেই করে, নিজের সত্তার ভিতরে অভিনয় সম্পাদন করে এবং নিজেই সেই অভিনয় দর্শন করে। অতএব সে (সাংখ্যের পুরুষ) যদি অনুমতি প্রত্যাহার করে, কর্ম্ম করার যে ভ্রম হইতে সংসার খেলা চলিতেছে সেই মিথ্যা ভ্রমকে মানিয়া চলিতে অস্বীকৃত হয়, তখন সে আর প্রকৃতির খেলাকে ধরিয়াও থাকিতে পারে না এবং সে খেলা বন্ধ হইয়া যায়, কারণ দ্রষ্টা চেতন আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যই প্রকৃতি খেলা করে এবং পুরুষ সমর্থন না করিলে, সায় না দিলে প্রকৃতি সে খেলা চালাইতে পারে না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিষয়ে সাংখ্য ও গীতার মত এক নহে, কারণ একই প্রক্রিয়ার ফল উভয় মতে বিভিন্ন, অহঙ্কার পরিত্যক্ত হইলে সাংখ্যের মতে কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়, গীতার মতে তখন কর্ম্ম হয় মহান্, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, দিব্যকর্ম্মী। সাংখ্যমতে আত্মা (পুরুষ) ও প্রকৃতি দুই বিভিন্ন বস্তু, গীতার মতে তাহারা একই স্বয়ম্ভু বস্তর

দুইটা দিক, দুইটা শক্তি; আত্মা কেবল অনুমতিদাতা নহেন, আত্মা প্রকৃতির ঈশ্বরও বটেন, ইনি প্রকৃতির ভিতর দিয়া বিশ্বলীলা উপভোগ করেন, প্রকৃতির ভিতর দিয়া দিব্য ইচ্ছা ও দিব্যজ্ঞান প্রকট করেন। ইনি ওতপ্রোতভাবে সকল জিনিষকে ধরিয়া রাখেন, সকল জিনিষ তাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহার স্বরূপ সত্তার ধর্ম্মানুসারে, সজ্ঞান ইচ্ছানুসারে পরিচালিত। অহং ও অহংয়ের ক্রিয়া হইতে সরিয়া আসিতে হইবে, এই আত্মাকে জানিবার জন্য, আত্মার ডাকে সাড়া দিবার জন্য, আত্মার দিব্য সত্তা ও স্বরূপের মধ্যে বাস করিবার জন্য। তখনই মানুষ গুণময়ী নীচের প্রকৃতি ছাড়াইয়া উপরের দিব্য প্রকৃতিতে উঠে।

নীচের প্রকৃতি হইতে উপরের প্রকৃতিতে উঠিবার প্রক্রিয়া প্রকৃতির সহিত আত্মার বিচিত্র সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে; ইহার জন্য গীতার পুরুষত্রয়ের তত্ত্ব প্রয়োজনীয়। যে আত্মা সাক্ষাৎ ভাবে প্রকৃতির কার্য্য, প্রকৃতির পরিবর্ত্তন, প্রকৃতির ক্রমবিকাশের লীলা পরিচালনা করিতেছে তাহাই ক্ষর,—মনে হয় যে এই ক্ষর-পুরুষ প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রকৃতির গতিতে গতিশীল হইতেছে, ইহার নামরূপের যে পরিবর্ত্তন প্রকৃতির "কর্ম্মের" অবিশ্রান্ত ক্রিয়ার দ্বারা সংঘটিত হইতেছে, তাহা পুরুষের নিজের সত্তার পরিবর্ত্তন বলিয়াই মনে হয়। এখানে প্রকৃতি ক্ষর, কালপর্য্যায়ে নিত্য গতিশীলা, নিত্য বিকাশশীলা। কিন্তু, এই প্রকৃতি আত্মারই কার্য্যকরী শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে; কারণ আত্মা স্বরূপে যাহা, সেই

অনুসারেই প্রকৃতি লীলায় বিকশিত হইতে পারে, আত্মার বিকাশের সম্ভাবনা অনুসারেই প্রকৃতি কার্য্য করিতে পারে; আত্মার সত্তার বিকাশই প্রকৃতি কর্ত্তৃক কার্য্যে পরিণত হয়। আত্মার "স্ব-ভাবের" (the own nature), দ্বারাই, আত্ম-বিকাশের ধর্ম্মের দ্বারাই প্রকৃতির "কর্ম্ম" নির্দ্ধারিত হয়, যদিও মনে হয় বটে যে কর্ম্মের দ্বারাই স্বভাব নির্দ্ধারিত হইতেছে। আমাদের স্বরূপ অনুসারেই আমরা কর্ম্ম করি, আবার আমাদের কর্ম্মের দ্বারাই আমাদের স্বরূপকে ফুটাইয়া তুলি, বিকশিত করি। প্রকৃতি হইতেছে কর্ম্ম, পরিবর্ত্তন, বিকাশ এবং প্রকৃতি সেই শক্তি যাহার দ্বারা এই সকল সম্পাদিত হয়; কিন্তু যে চেতন সত্তা হইতে এই শক্তি উদ্ভূত তাহাই আত্মা,—এই আত্মারই জ্যোতির্ম্ময় চেতন সত্তা হইতে প্রকৃতি তাহার পরিবর্ত্তনশীল ইচ্ছা পাইয়াছে, সেই ইচ্ছা প্রকৃতির কর্ম্মের ভিতর দিয়াই প্রকটিত ও বিকশিত হইতেছে। আর এই আত্মা একও বটে, বহুও বটে; ইহা সেই একমাত্র প্রাণবস্তু যাহা সমস্ত প্রাণের উপাদান, আবার ইহা সমস্ত প্রাণীও বটে; ইহা এক বিশ্ব-বস্তু বটে, আবার ইহা বিশ্বের সংখ্যাতীত সকল বস্তুও বটে সর্ব্বভূতানি, কারণ এই সবই "এক"; বহু পুরুষ সকলেই তাহাদের মূল সত্তায় এক এবং একমাত্র পুরুষ। কিন্তু প্রকৃতির অহং ভাব রূপ কৌশলের বশে মন আত্মাকে প্রকৃতির বিশেষ স্থান কালে সীমাবদ্ধ আংশিক লীলার সহিত এক বলিয়া দেখে, প্রকৃতির পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমানে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে পরি-

বর্ত্তিত অবস্থা হয় তাহাকেই আত্মার সমগ্র চেতন সত্তা বলিয়া ভাবে ; এই অহঙ্কার প্রকৃতিরই কার্য্যের একটা অংশ। মন যে এইরূপে প্রকৃতির লীলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে, এই ভাব অতিক্রম করিয়া সর্ব্বভূতের একত্ব একপ্রকারে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, জানা যাইতে পারে যে এক বিশ্ব-আত্মাই বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়ার ভিতর প্রকাশিত হইতেছে,—প্রকৃতি আত্মার প্রকাশ, আত্মা প্রকৃতির উপাদান। কিন্তু ইহা জানিলে শুধু বিরাট বিশ্বলীলাই জানা হয়,—এই লীলা মিথ্যা নহে, ভ্রম নহে, কিন্তু কেবল এই লীলার জ্ঞান হইলেই আমাদের আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান হয় না ; কারণ আমাদের প্রকৃত আত্মা সকল সময়েই এই বিশ্বলীলা অপেক্ষা আরও কিছু, এই লীলার উপরে আরও কিছু।

কারণ, যে আত্মা প্রকৃতিতে প্রকাশিত নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির লীলায় বদ্ধ তাহার উপরে পুরুষের আর এক অবস্থা আছে, তাহা শুধুই একটা অবস্থা বা পদ (a status), তাহা একেবারেই কোন ক্রিয়া বা লীলা নহে ; তাহা হইতেছে শান্ত, অবিকার্য্য, সর্ব্বব্যাপী, স্বপ্রতিষ্ঠ, গতিহীন আত্মা, সর্ব্বগতম্ অচলম্ তাহা অবিকার্য্য সত্তা কিন্তু বিকাশ বা লীলা নহে, তাহাই "অক্ষর" পুরুষ। ক্ষর অবস্থায় আত্মা প্রকৃতির লীলার মধ্যে নামিয়াছে, অতএব এখানে যেন আত্মা কালের স্রোতে, লীলার তরঙ্গে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা সত্য নহে, এইরূপ দেখায় মাত্র। অক্ষর অবস্থায় প্রকৃতি শান্ত-

ভাব ধারণ করিয়া আত্মায় অবস্থান করে, অতএব আত্মা নিজের অবিকার্য্য সত্তা অবগত হয়। সাংখ্যের পুরুষ যখন প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় ত্রিগুণের খেলা নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করিতেছে এবং নিজেকে সগুণ বলিয়া জানিতেছে, তখনই ক্ষর অবস্থা; আর এই সকল গুণ যখন সাম্যাবস্থায় পতিত হইয়াছে এবং পুরুষ নিজেকে নির্গুণ বলিয়া বুঝিতেছে সাংখ্যের পুরুষের সেই অবস্থাই অক্ষর অবস্থা। অতএব, ক্ষর পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির গুণের কর্ম্মের সহিত যুক্ত করায়, কর্ম্মকর্ত্তারূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু অক্ষর পুরুষ গুণ সকলের সমস্ত ক্রিয়া হইতে বিযুক্ত হওয়ায় নিশ্চেষ্ট অকর্ত্তা হয়, সাক্ষী হয়। মানুষের আত্মা যখন ক্ষরের ভাব গ্রহণ করে তখন সে নামরূপের খেলার সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে এবং সহজেই প্রকৃতির অহংভাবের দ্বারা নিজের আত্মজ্ঞানকে তমসাবৃত করে, অতএব সে নিজের অহংকেই কর্ম্ম সকলের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে; আর যখন ইহা অক্ষর ভাবে অবস্থিত হয়, তখন সে নিজেকে নামরূপের অতীত সৎবস্তুর সহিত এক বলিয়া দেখিতে পায় এবং জানিতে পারে যে প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করিতেছে, সে নিজে নিষ্ক্রিয় সাক্ষী আত্মা, অকর্ত্তারম্। মানুষের মনকে এই অবস্থা দ্বয়ের মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকিতে হয়, ক্ষরভাব অথবা অক্ষরভাব গ্রহণ করিতে হয়; মানুষ প্রকৃতির দ্বারা ত্রিগুণের খেলায়, নামরূপের খেলায় বদ্ধ থাকে অথবা নামরূপের অতীত নির্গুণ অক্ষর অবস্থায় প্রকৃতির খেলা হইতে মুক্ত থাকে।

কিন্তু, আত্মার অক্ষর ভাব ও স্থিতি এবং আত্মার ক্ষরভাব ও প্রাকৃতিক লীলা—এই দুইই বাস্তবিক পক্ষে যুগপৎ রহিয়াছে। এই দুই বিরোধী জিনিষ একই সময়েই থাকিতে পারে, কারণ তাহারা একই পরম সত্তার মধ্যে দুইটি বিভিন্ন ভাব মাত্র, সেই সত্তা এতদুভয়েব কোনটির দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। আত্মার এইরূপ শ্রেষ্ঠ সর্ব্বোচ্চ এক সত্তা যদি না থাকিত তাহা হইলে ক্ষর ও অক্ষরের ব্যাখ্যা করিতে মায়াবাদ বা দ্বৈতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। আমরা দেখিয়াছি যে গীতার পুরুষোত্তমই * এই পরম সত্তা। সেই পরমাত্মাই ঈশ্বর, ভগবান (God), সর্ব্ব-ভূত-মহেশ্বর। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পুরুষোত্তমের প্রকাশ হয় ক্ষরপুরুষকে ধরিয়া এবং সেই বিশ্বপ্রকৃতির ধারা হইতেছে দুই রকম পরা ও অপরা। জীব হইতেছে ভগবানের অংশ, ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভগবানের বিশেষ রূপায়ন। জীবের যে স্বরূপ

* পুরুষোত্তম ক্ষর ও অক্ষর দুইয়েরই উপরে, এই দুইটিকেই লইয়া। পুরুষোত্তমের ভিতরের দিকে প্রতিষ্ঠা রূপে রহিয়াছে যে অচল শান্তি, যে অনন্ত ঐক্য, যে অবিকল্প সাম্য তাহাই অক্ষর পুরুষ আর প্রকাশের জন্য, লীলার জন্য যখন প্রকৃতিকে ধরিয়া নামিয়া আসিয়াছেন, বাহিরে চলিয়াছেন তখন প্রকৃতির মধ্যে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ক্ষররূপ। এই যে তিনটি পুরুষ ইহারা একই সত্যের তিনটি রূপমাত্র, তিনটি অবস্থায়। জীবের মধ্যে ইহারা যুগপৎ রহিয়াছে। তবে জীব যতক্ষণ মানসসত্তার মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ সে উহাদের পরস্পরের যে ঐক্য তাহা ধরিতে পারে না। বিচার বুদ্ধি দিয়া দেখিতে গেলে আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে হয়। মনের উপরে উঠিতে পারিলে তবে উহাদের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা সম্ভব।—অনুবাদক।

তাহা ভগবানের পরা প্রকৃতির মধ্যে, অপরা প্রকৃতিকে লইয়া জীবের অজ্ঞানের খেলা। অহঙ্কারমূলক নীচের প্রকৃতিতে গুণ সকল পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে, গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে; ইহাই ত্রৈগুণ্যময়ী মায়া, মানুষের পক্ষে এই মায়া অতিক্রম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, দুরত্যয়া,—তবে গুণ সকলের অতীত হইতে পারিলে, এই মায়াকে অতিক্রম করা যায়। কারণ, যদিও ঈশ্বর ক্ষররূপে তাঁহার প্রকৃতি-শক্তির দ্বারা এই সব লীলা করেন, তথাপি অক্ষররূপে তিনি অস্পৃষ্ট, উদাসীন, সব সমভাবে দেখেন, সকলের মধ্যেই ব্যাপ্ত, কিন্তু সকলেরই উপরে। তিন অবস্থাতেই তিনি ঈশ্বর,—সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় তিনি পরমেশ্বর, অক্ষর অবস্থায় তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ, প্রভু ও বিভু এবং ক্ষর অবস্থায় তিনি সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ইচ্ছা এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান সক্রিয় সগুণ ঈশ্বর। যখন তিনি নামরূপের খেলা খেলিতেছেন, তখনও তিনি নাম-রূপের অতীত সত্তায় মুক্ত; তিনি কেবল নির্গুণও নহেন, কেবল সগুণও নহেন; তিনি উপনিষদের ভাষায় নির্গুণো-গুণী। কখন কি সংঘটিত হইবে সে সব পূর্ব্ব হইতেই তিনি ইচ্ছা করিয়া রাখিয়াছেন, (যেমন তিনি তখনও জীবিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, "আমি ইহাদিগকে ইতিপূর্ব্বেই মারিয়া রাখিয়াছি"।),—প্রকৃতি কেবল তাঁহার ইচ্ছার ফলেই সে সব কার্য্যে পরিণত করিতে পারে; তথাপি ভিতরের দিকে অচল, শান্ত, অক্ষররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তিনি তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না, কর্ত্তারম্ অকর্ত্তারম্।

জীব অজ্ঞান অহঙ্কারের বশে প্রকৃতির কার্য্য ও লীলাকেই নিজের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে, এ সব যে তাহার আত্মার শক্তি মাত্র, আত্মা হইতেই উদ্ভূত একথা বুঝিতে পারে না। সে ভাবে যে সে এবং তাহারই ন্যায় অন্যান্য সকলে এই সমস্ত করিতেছে, সে দেখে না যে প্রকৃতিই সমস্ত করিতেছে, দেখেনা যে অহঙ্কার ও আসক্তির বশে সে প্রকৃতির কার্য্যকে ভুল করিয়া, বিকৃত করিয়া দেখিতেছে। সে গুণত্রয়ের দাস হইয়া কখনও তমোগুণের অন্ধকারময় আবরণে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, কখনও রজোগুণের প্রবল বাত্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কখনও সত্ত্বগুণের খণ্ড আলোকে অস্পষ্টভাবে দেখিতেছে, বাস্তবিক পক্ষে কেবল প্রাকৃত-মনই গুণত্রয়ের বশ, সেই মন হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। সেইজন্য সে সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও শোক, বাসনা ও বিক্ষোভ, আসক্তি ও ঘৃণা এই সকলের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িতেছে; তাহার কোনরূপ স্বাধীনতা নাই সে মুক্ত নহে।

স্বাধীন মুক্তি লাভ করিতে হইলে তাহাকে প্রকৃতির কার্য্য হইতে সরিয়া অক্ষরের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে; তখন সে হইবে, ত্রিগুণাতীত। নিজেকে অক্ষর ব্রহ্ম, পরিবর্ত্তনহীন পুরুষ জানিয়া, সে বুঝিবে যে সে সেই অক্ষর, নামরূপের অতীত সত্ত্বা, আত্মা, যিনি নিশ্চিন্তভাবে লীলা দর্শন করিতেছেন, নিরপেক্ষভাবে সমর্থন করিতেছেন, কিন্তু নিজে শান্ত, উদাসীন, অস্পৃষ্ট, অচল, শুদ্ধ, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মার সহিত এক, কিন্তু

প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যাবলীর সহিত এক নহেন। এই আত্মা, যদিও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়া প্রকৃতিকে কার্য্য করিতে অধিকার দিতেছেন, যদিও তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সত্তার দ্বারা প্রকৃতির কার্য্য সমর্থন করিতেছেন, অনুমতি দিতেছেন, "প্রভু" "বিভু", তথাপি তিনি নিজে কর্ম্ম সৃষ্টি করেন না, কর্ত্তৃত্বের ভাবও সৃষ্টি করেন না, কর্ম্মের সহিত ফলের সংযোগও সৃষ্টি করেন না।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ৫।১৪

ক্ষর পুরুষে স্বভাব কেমন করিয়া এই সকল সম্পাদন করিতেছে, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে, এই অক্ষর আত্মা তাহা কেবল সাক্ষী-ভাবে নিরীক্ষণ করেন, এই আত্মা প্রকৃতির খেলায় মগ্ন কোন ব্যক্তির পাপও গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না, তিনি সকল অবস্থাতেই নিজের আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা রক্ষা করেন, নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানবিমূঢ় অহং বা "আমি"ই এই সমস্ত পাপ পুণ্য নিজের স্কন্ধে চাপাইয়া লয়, কারণ ইহা নিজেকে কর্ত্তা মনে করিয়া কর্ত্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে, এবং বাস্তবিক পক্ষে ইহা যে এক মহত্তর শক্তির যন্ত্রমাত্র তাহা ভুলিয়া নিজেই কর্ত্তা সাজে, অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। নির্গুণ অক্ষর সত্তায় ফিরিয়া গিয়া আত্মা উচ্চতর আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং প্রকৃতির কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, প্রকৃতির গুণের দ্বারা আর সংস্পৃষ্ট হয় না, প্রকৃতির শুভ অশুভের পাপ পুণ্যের ভাব হইতে মুক্ত হয়। প্রাকৃত সত্তা,

মন, দেহ, প্রাণ তখনও থাকে, প্রকৃতি তখনও কার্য্য করে ; কিন্তু ভিতরের আত্মা আর নিজেকে ইহাদের সহিত এক বলিয়া দেখেন না, প্রাকৃত সত্তায় গুণত্রয়ের খেলা চলিলেও তিনি হর্ষ বা শোক করেন না। তিনি হন সকল ব্যাপারের সাক্ষী, শান্ত, মুক্ত, অক্ষয় আত্মা।

এইটিই কি শেষ অবস্থা, চূড়ান্ত সম্ভাবনা, শ্রেষ্ঠ রহস্য? তাহা হইতেই পারে না, কারণ ইহা একটা মিশ্রিত বা দ্বিখণ্ডিত অবস্থা, পরন্তু সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের অবস্থা নহে, ইহা দ্বিত্বের অবস্থা, একত্বের অবস্থা নহে—এখানে আত্মার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু প্রকৃতি তাহার পূর্ণ স্বরূপ লাভ করিতে পারে নাই। ইহা কেবল একটি মধ্যবর্ত্তী স্তর হইতে পারে। তাহা হইলে ইহার উপরে আর কি আছে? এক উত্তর হইতেছে সন্ন্যাসীর, তিনি অমিশ্র, অখণ্ড মুক্তিকে পাইবার নিমিত্ত প্রকৃতিকে বর্জ্জন করেন, কর্ম্মকে একেবারে বর্জ্জন করেন, অন্ততঃপক্ষে যতটা পারা যায় সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন; কিন্তু, গীতা যদিও এরূপ মীমাংসা স্বীকার করিয়াছে, তথাপি এ মীমাংসা গীতার মনোনীত নহে। গীতাও সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিয়াছে, সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্নস্য, কিন্তু তাহা ভিতরের ত্যাগ, ব্রহ্মে সমর্পণ। ক্ষররূপে ব্রহ্ম প্রকৃতির কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন, অক্ষর রূপে ব্রহ্ম সমর্থন করিলেও, নিজেকে প্রকৃতির কর্ম্ম হইতে বিযুক্ত রাখেন, নিজের মুক্তভাব বজায় রাখেন ; অক্ষর ব্রহ্মের সহিত যে জীবাত্মা যুক্ত হইয়াছে সে মুক্ত ও প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত, তথাপি ক্ষর

ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইলে সে প্রকৃতির কর্ম্ম সমর্থন করে কিন্তু নিজে আর বদ্ধ হয় না। ইহা জীবাত্মার পক্ষে তখনই বেশ সম্ভব হয় যখন সে দেখিতে পায় যে এই দুইই—ক্ষর ও অক্ষর, একই পুরুষোত্তমের দুইটিরূপ। সর্ব্বভূতের হৃদয়ে গুপ্ত ঈশ্বর রূপে অধিষ্ঠিত পুরুষোত্তম প্রকৃতিকে পরিচালিত করেন এবং তাঁহার ইচ্ছার বশে প্রকৃতি স্বভাবের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করে, জীবের অহঙ্কার আর ভগবানের ইচ্ছাকে বিকৃত করে না; জীবাত্মা দিব্যভাবপ্রাপ্ত প্রাকৃত সত্ত্বাকে ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্র, নিমিত্ত-মাত্রম্, করিয়া দেয়। কর্ম্মের মধ্যেও সে থাকে গুণত্রয়ের অতীত, ত্রিগুণাতীত, গুণত্রয় হইতে মুক্ত, নিস্ত্রৈগুর্ণ্যঃ, এখন সে গীতার সেই গোড়াকার আদেশ পূর্ণ করে. নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। বস্তুতঃ এখনও সে গুণ সকলের ভোক্তা, ব্রহ্ম যেমন ভোক্তা, কিন্তু সে আর তাহাদের দ্বারা বদ্ধ হয় না, 'নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ' সে আসক্ত হয় না কিন্তু সমস্ত সমর্থন করে, অসক্তম্ সর্ব্বভৃৎ, কিন্তু তাহার মধ্যে গুণ সকলের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়; সে তাহাদের অহঙ্কৃত স্বভাব ও প্রতিক্রিয়ার উপরে উঠে। কারণ তখন সে তাহার সমগ্রসত্ত্বা পুরুষোত্তমে যুক্ত করিয়াছে, দিব্য সত্ত্বা ও দিব্যভাব, "মদ্ভাব", প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন কি তাহার মন ও প্রাকৃত চেতনাকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়াছে, "মন্মনা" "মচ্চিত্ত" হইয়াছে। এই রূপান্তরই প্রকৃতির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি এবং পূর্ণ দেবজন্ম, রহস্যম্ উত্তমম্। যখন ইহা সম্পূর্ণ হয় তখন আত্মা নিজেকে নিজের

প্রকৃতির অধীশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিজে দিব্যজ্যোতির জ্যোতি ও দিব্য ইচ্ছার ইচ্ছা হইয়া নিজের প্রাকৃত কার্য্যাবলীকে দিব্য কর্ম্মে পরিণত করিতে পারে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নির্ব্বাণ ও সংসারের কাজ

পূর্ণযোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত জীবাত্মার মিলনই গীতার সম্পূর্ণ শিক্ষা, শুধু জ্ঞানের পথে কেবল অক্ষর ব্রহ্মের সহিত মিলনের যে সঙ্কীর্ণতর মত তাহা গীতার শিক্ষা নহে। এইজন্যই গীতা প্রথমে জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া পরে দেখাইতে পারিয়াছে যে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সহিত সমন্বিত প্রেম ও ভক্তিই উত্তম রহস্যে পৌঁছিবার পথে চরম অবস্থা। ইহা কখনই সম্ভব হইত না যদি অক্ষর ব্রহ্মের সহিত মিলনই একমাত্র রহস্য বা সর্ব্বোত্তম রহস্য হইত; কারণ তাহা হইলে একটা বিশেষ অবস্থায় যেমন আমাদের কর্ম্মের ভিতরের ভিত্তি ধ্বংস ও লুপ্ত হইয়া যাইত, ঠিক তেমনিই ভক্তি ও প্রেমেরও ভিতরের ভিত্তি ধ্বংস ও লুপ্ত হইয়া যাইত। কেবল অক্ষর ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অনন্য মিলনের অর্থ হইতেছে ক্ষর ভাবের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন,—শুধু ইহার সাধারণ ও নীচের খেলা নহে, ইহার মূলই নষ্ট হইয়া যায়, ইহার অস্তিত্ব অসম্ভব হয়, শুধু অবিদ্যার খেলা নহে, বিদ্যার খেলা, জ্ঞানের খেলাও বন্ধ হইয়া যায়।

মানুষের ভাব লইয়া কর্ম্ম এবং দিব্য ভাব লইয়া যে কর্ম্ম—

এই দুইয়ের প্রভেদ লুপ্ত হওয়ায়, ক্ষরের খেলা হয় কেবল অজ্ঞানের খেলা, মায়ার খেলা তাহার কোন দিব্য সত্য ভিত্তি থাকে না। অন্যদিকে, যোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত মিলনের অর্থ হইতেছে আমাদের মূল সত্তায় তাঁহার সহিত একত্ব দর্শন ও উপভোগ কিন্তু আমাদের সক্রিয় প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত কিছু প্রভেদ, বিশেষ। আমাদের এই সক্রিয় সত্তাতে তখনও দিব্য কর্ম্মের খেলা চলিতে থাকে, সে সকল কর্ম্ম তখন দিব্য প্রেমের দ্বারা প্ররোচিত এবং পূর্ণ দিব্যভাব-প্রাপ্তা প্রকৃতির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; ভগবান আত্মার মধ্যে রহিয়াছেন, আবার ভগবান জগতের মধ্যেও রহিয়াছেন, এই দুই উপলব্ধির সামঞ্জস্য হইতেই মুক্ত মানবের পক্ষে কর্ম্ম ও ভক্তি সম্ভব হয়, আর শুধু সম্ভব নহে, তাহার পূর্ণ সিদ্ধির অবস্থায় উহা অবশ্যম্ভাবী হয়।

কিন্তু, অক্ষর ভাবের দৃঢ় অনুভূতির ভিতর দিয়াই পুরুষোত্তমের সহিত মিলনের সোজা পথ, গীতা বলিয়াছে যে প্রথমেই ইহা আবশ্যক, এই অনুভূতি দৃঢ় হইলে তবে তাহার পর কর্ম্ম ও ভক্তি দিব্য ভাব পাইতে পারে; অক্ষর ভাবের অনুভূতির উপর গীতা এত জোর দিয়াছে বলিয়াই আমরা ভুল করিয়া বসি। কারণ, যে সকল শ্লোকে গীতা এই প্রাথমিক আবশ্যকতার উপর খুব বেশী জোর দিয়াছে, কেবল সেই গুলিই যদি আমরা গ্রহণ করি কিন্তু যে পরম্পরাগত সমগ্র চিন্তার ধারায় তাহাদের স্থান তাহা লক্ষ্য করিতে অমনোযোগী হই তাহা হইলে সহজেই

আমরা হয়ত ধারণা করিয়া বসিব যে গীতা বাস্তবিক পক্ষে এই শিক্ষা দিতেছে যে, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় মিশাইয়া যাওয়াই আত্মার চরম অবস্থা এবং অচল অক্ষর ব্রহ্মের মধ্যে নিথর শান্তিলাভ করার সাধনায় কেবল প্রথমাবস্থায় কর্ম্ম একটা উপায় মাত্র। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এবং সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা এই দিকে যে জোর দিয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও ব্যাপক। সেখানে আমরা যে যোগের বর্ণনা দেখিতে পাই তাহার সহিত কোন প্রকারের কর্ম্ম খাপ খায় বলিয়া প্রথমে মনে হয় না এবং সেখানে দেখিতে পাই যে যোগী যে অবস্থা লাভ করেন তাহাকে "নির্ব্বাণ" শব্দের দ্বারা পুনঃপুনঃ অভিহিত করা হইয়াছে।

এই যোগলব্ধ অবস্থার লক্ষণ হইতেছে শান্তিম নির্ব্বাণ-পরমাং,—"শান্ত আত্ম নির্ব্বাণের পরম শান্তি"; গীতা যে এখানে বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নাশের আনন্দের কথা বলিতেছে না কিন্তু বৈদান্তিক মতানুসারে পূর্ণব্রহ্মের মধ্যে অংশের লয়ের কথা বলিতেছে, যেন তাহা স্পষ্ট করিবার জন্যই গীতা "ব্রহ্মনির্ব্বাণঃ", ব্রহ্মে লয়, কথাটি পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিয়াছে; এখানে ব্রহ্ম বলিতে যে অক্ষর ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, অন্ততঃপক্ষে এই ব্রহ্ম বলিতে প্রধানতঃ সেই কালাতীত আত্মাকে বুঝাইতেছে যিনি প্রকৃতির বাহ্যলীলায় মগ্ন নহেন, যদিও তিনি সর্ব্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছেন। তাহা হইলে আমাদিগকে এখন

দেখিতে হইবে যে এখানে গীতার কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি, আর বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে এই যে শান্তির কথা বলা হইয়াছে ইহা কি সম্পূর্ণ কর্ম্মশূন্যতা ও লয়ের শান্তি, অক্ষরে আত্ম-নির্ব্বাণ বলিতে কি বুঝিতে হইবে যে ক্ষরের সমস্ত জ্ঞান ও চৈতন্য লুপ্ত হইবে, ক্ষর অবস্থার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত লীলা বন্ধ হইয়া যাইবে? বাস্তবিক, নির্ব্বাণের সহিত সংসারে কোনরূপ অস্তিত্ব বা কর্ম্ম যে খাপ খায় না এইরূপ ধারণা আমাদের অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং আমরা তর্ক করিয়া বেশই বলিতে পারি যে "নির্ব্বাণ" শব্দের ব্যবহারই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ এবং এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা। কিন্তু, আমরা যদি বৌদ্ধমতই ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখি তাহা হইলে নির্ব্বাণের সহিত কোনরূপ সংসারের কাজ খাপ খায় না এই মতটা বৌদ্ধদেরই মত কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইবে; আর গীতার শিক্ষা যদি আমরা ভাল করিয়া অনুধাবন করি—তাহা হইলে আমরা দেখিব যে এরূপ মত এই মহতী বৈদান্তিক শিক্ষার অঙ্গ নহে।

যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, ব্রহ্মচৈতন্যে উঠিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ, তাঁহার পূর্ণ সমতার কথা বলিয়া গীতা ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ বলিতে কি বুঝে পরবর্ত্তী নয়টি শ্লোকে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছে। প্রথমেই বলিয়াছে,—

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মাসুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ৫।২১

"আত্মা যখন আর বাহ্যবস্তুর স্পর্শে আসক্ত নহে, তখনই আত্মার যে সুখ রহিয়াছে তাহা লাভ করা যায়; এরূপ ব্যক্তি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন, কারণ তাঁহার আত্মা ব্রহ্মযোগের দ্বারা মুক্ত।" অনাসক্তি চাই-ই, নতুবা, গীতা বলিয়াছে যে কাম, ক্রোধ ও চিত্তবিক্ষোভের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে, আর এরূপ মুক্তি ব্যতীত প্রকৃত সুখও সম্ভব নহে। এই সুখ এবং এই সমতা মানুষকে এই দেহেই সম্পূর্ণ ভাবে পাইতে হইবে,—দুঃখময় নীচের প্রকৃতির বশ্যতার ছায়ামাত্র রহিবে না,—শরীর ত্যাগ করিলে তবেই পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায় এই ভুল ধারণা একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে; আত্মার পূর্ণ মুক্তি এই জগতেই অর্জ্জন করিতে হইবে, এই জীবনেই, প্রাক্ শরীর-বিমোক্ষণাৎ, ঐ মুক্তি উপভোগ করিতে হইবে। তাহার পর গীতা বলিতেছে,—

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ৫।২৪

—"যাঁহার অন্তরেই সুখ, অন্তরেই আরাম ও শান্তি এবং অন্তরেই আলোক, এরূপ যোগী ব্রহ্ম হন এবং ব্রহ্মে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।" এখানে নির্ব্বাণ শব্দের অতি স্পষ্ট অর্থ হইতেছে উচ্চতর অন্তরাত্মাতে নীচের অহংয়ের বা "আমি"র লয়,—এই আত্মা দেশকালের অতীত, কার্য্য কারণ শৃঙ্খলায় উহা বদ্ধ নহে, জগতের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল লীলায় উহা বদ্ধ নহে, উহা আত্মানন্দে ও আত্মজ্যোতিতে পূর্ণ এবং নিত্য শান্তিতে

প্রতিষ্ঠিত। যোগী তখন আর "অহং" নহেন, তিনি আর তখন দেহ ও মনের মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্র পুরুষটি থাকেন না; তিনি ব্রহ্ম হন; সনাতন আত্মার যে অক্ষর দেবত্ব তাঁহার প্রাকৃত সত্তায় ওতপ্রোত, তাহার সহিত তিনি চেতনায় যুক্ত হন।

কিন্তু, ইহা কি সকল বিশ্ব-চৈতন্য হইতে দূরে. সমাধিরূপ কোন গভীর নিদ্রা অথবা ইহা কি এমন কোন নির্গুণ ব্রহ্মে প্রাকৃত জীবন ও ব্যক্তিগত সত্তার সম্পূর্ণ লয়ের প্রাথমিক প্রক্রিয়া যে ব্রহ্ম চিরকালের নিমিত্ত প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যের সম্পূর্ণ অতীত? এইরূপে সংসারের চৈতন্য হইতে সরিয়া আসা কি নির্ব্বাণের জন্য একান্ত প্রয়োজন, অথবা সংসারে চৈতন্য ও নির্ব্বাণ একই সঙ্গে থাকিতে পারে, এমন কি সংসারের চৈতন্য নির্ব্বাণেরই এক প্রকার অঙ্গ হইতে পারে? গীতার পূর্ব্বাপর কথা অনুধাবন করিলে শেষের অর্থটিই ঠিক বলিয়া মনে হয়। পরের শ্লোকেই গীতা বলিতেছে,—

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৫।২৫

"সেইরূপ ঋষিগণই ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন যাঁহাদের মধ্যে পাপের দাগ মুছিয়া গিয়াছে, সংশয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, যাঁহারা আত্মজয়ী, যাঁহারা সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত।" এরূপ অবস্থালাভ করাই নির্ব্বাণ লাভ,—এই অর্থ বুঝিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। কিন্তু, পরের শ্লোকটি খুবই স্পষ্ট এবং সেখানে সন্দেহের কোন স্থান নাই।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্‌ ॥৫।২৬।

—"যে যতিগণ * কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সংযতচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ব্রহ্মনির্ব্বাণ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান, ব্রহ্মনির্ব্বাণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে, তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণের মধ্যেই বাস করেন, কারণ তাঁহারা আত্মাকে জানিয়াছেন।" অর্থাৎ আত্মাকে জানা এবং আত্মাকে পাওয়াই নির্ব্বাণে অবস্থান। ইহা যে নির্ব্বাণতত্ত্বের সমধিক প্রসারণ (extension) তাহা খুবই স্পষ্ট। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবিক্ষোভের সর্ব্ববিধ কলুষ হইতে মুক্তি, এই মুক্তির ভিত্তি-স্বরূপ মনের সমতা ও আত্মজয়, সর্ব্বভূতের প্রতি সমভাব ও সকলের প্রতি কল্যাণকর প্রেম, যে সংশয় ও অজ্ঞানান্ধকার আমাদিগকে সর্ব্ব ঐক্যের সাধন ভগবান হইতে দূরে রাখে তাহার একান্ত নিরসন এবং আমাদের মধ্যে ও সকলের মধ্যে যে এক আত্মা রহিয়াছেন তাঁহার জ্ঞান—এই সবই নির্ব্বাণ-লাভের উপায়, নির্ব্বাণের লক্ষণ এবং নির্ব্বাণের আধ্যাত্মিক সত্তা।

তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সংসার ও সংসারের কাজের সহিত নির্ব্বাণের কোন বিরোধই নাই। কারণ যে সকল ঋষি এই নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষর জগতের

* যাঁহারা যোগ এবং তপস্তার দ্বারা আত্ম-জয়ের সাধনা করেন তাহাদিগকেই "যতী" বলা যায়।

মধ্যে ভগবানকে দেখিতে পান এবং কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকেন; তাঁহারা সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।

ক্ষর পুরুষের লীলাকে তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, দিব্য-লীলায় পরিণত করিয়াছেন; কারণ, গীতা বলিয়াছে যে, সর্ব্ব-ভূতই ক্ষর, ক্ষরঃ সর্ব্বভূতানি, এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধন প্রকৃতির অনিত্যলীলার মধ্যেই দিব্য কর্ম্ম। এইরূপ সংসারের কাজের সহিত ব্রহ্মে বাসের কোন অসামঞ্জস্য নাই, বরং এরূপ ব্রহ্মে বাসের জন্য এরূপ কর্ম্ম অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং ব্রহ্মে বাসের বাহ্যিক ফলরূপে এই কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী, কারণ যে ব্রহ্মে আমরা নির্ব্বাণ লাভ করি, যে আধ্যাত্মিক চৈতন্যে আমরা ভেদজনক অহং-ভাবের লয় করি, তাহা কেবল আমাদের অন্তরের মধ্যেই নাই, কিন্তু তাহা এই সর্ব্বভূতের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহা কেবল বিশ্বের ঘটনা সমূহের ঊর্দ্ধে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত নহে কিন্তু তাহা এই সকলের মধ্যেই ব্যাপ্ত, ওতপ্রোত, সকলকেই ধরিয়া রহিয়াছে। তাহা হইলে ব্রহ্মে নির্ব্বাণ বলিতে বুঝিতে হইবে অহং-ভাবের নাশ, অপূর্ণ, বিকৃত জ্ঞানের নাশ, এই অহংভাব হইতেই মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, ভেদজ্ঞানের উৎপত্তি, সৃষ্টির বাহিরের দিকে ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা এই অহং জ্ঞান, এই ভেদজনক জ্ঞানের উদ্ভব হয়; কিন্তু সৃষ্টির ভিতরের দিকে রহিয়াছে ঐক্যসাধক, পূর্ণ চৈতন্য, উহাই সমস্ত সৃষ্টিকে ধরিয়া আছে, উহাই পূর্ণ, সনাতন, চরম সত্য,—সেই পূর্ণ অখণ্ড চৈতন্যে

প্রতিষ্ঠালাভই ব্রহ্মনির্ব্বাণে প্রবেশ। যখন আমরা নির্ব্বাণ লাভ করি, নির্ব্বাণে প্রবেশ করি, তখন ইহা কেবল আমাদের অন্তরের ভিতর থাকে না, কিন্তু চতুর্দ্দিকে থাকে, অভিতো বর্ত্ততে, কারণ এই ব্রহ্মচৈতন্য যে কেবল আমাদের অন্তরেই গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহা নহে, এই ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যেই আমরা বাস করিতেছি। আমরা ভিতরে যাহা, ইহা সেই আত্মা, ইহা আমাদের পরমাত্মা, আবার আমরা বাহিরে যাহা, ইহা সেই আত্মাও বটে, ইহা বিশ্বের পরমাত্মা, সর্ব্বভূতের আত্মা। সেই আত্মার মধ্যে বাস করিলে আমরা সকলের মধ্যেই বাস করি, তখন কেবল আমা-দের অহংয়ের মধ্যে, ক্ষুদ্র "আমি"র মধ্যে বাস করি না; সেই আত্মার সহিত একত্ব লাভ করায় বিশ্বের সমস্ত জিনিষের সহিত অবিচল ঐক্যবোধ আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে, আমাদের কর্ম্মের গোড়ার ভিত্তি হয়, আমাদের সকল কর্ম্মের মূল প্রেরণা হয়।

কিন্তু, আবার ঠিক ইহার পরেই দুইটি শ্লোক পাই, যাহা এই সিদ্ধান্তের বিপরীত বলিয়াই মনে হয়।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ৫।২৭
যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ।৫।২৮

"সমস্ত বাহ্যস্পর্শ বহিষ্কৃত করিয়া এবং দৃষ্টিকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ন্যস্ত রাখিয়া এবং নাসিকার অভ্যন্তরে সঞ্চরণকারী প্রাণও

অপাণ বায়ুকে সমান করিয়া, ইন্দ্রিয়, মনও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া যে মুনি মোক্ষসাধন করেন, যাঁহা হইতে ইচ্ছা, ক্রোধ এবং ভয় দূর হইয়াছে, তিনি নিত্যমুক্ত।" এইখানে যোগের যে প্রণালী দেওয়া হইয়াছে তাহা কর্ম্মযোগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়, এমন কি খাঁটি জ্ঞানযোগ হইতে অর্থাৎ বিচার বিতর্ক ও চিন্তার সাহায্যে জ্ঞানলাভের প্রণালী হইতেও বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়; এই প্রণালীর মধ্যে রাজ-যোগোচিত লক্ষণ সমূহ রহিয়াছে। এখানে মনের সমস্ত ক্রিয়া রোধের কথা রহিয়াছে, ইহাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ; এখানে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মনের কথা অর্থাৎ প্রাণায়ামের কথা রহিয়াছে; এখানে দৃষ্টিকে প্রত্যাহার করিবার কথাও রহিয়াছে। এই সকল প্রণালীর দ্বারা অভ্যন্তরীন সমাধিতে মগ্ন হওয়া যায়। ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য মোক্ষ, আর মোক্ষ বলিতে সাধারণ ভাষায় কেবল ভেদজনক অহং-জ্ঞানের বর্জ্জন বুঝায় না, কিন্তু সমগ্র কার্য্যকরী চৈতন্যের বর্জ্জন বুঝায়, পর-ব্রহ্মে আমাদের সত্ত্বার সম্পূর্ণ লয় বুঝায়। তাহা হইলে আমরা কি বুঝিব যে গীতা সম্পূর্ণ লয়ের দ্বারা মুক্তিলাভের শেষ প্রক্রিয়া এখানে বর্ণনা করিয়াছে, না বুঝিব যে বহির্মুখী মনকে সংযত করিবার নিমিত্ত এই প্রণালী একটি বিশিষ্ট উপায়, কেবল সেই জন্যই গীতা এখানে এই প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছে? ইহাই কি চরম, চূড়ান্ত, শেষ কথা? লয়প্রাপ্ত হওয়াই আমাদের চরম গতি নহে, কিন্তু বিশ্বজগতের উপরে যে সত্ত্বা রহিয়াছে সেইখানে

প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আমাদের চরম গতি এবং এই গতিলাভের জন্য উক্ত প্রণালী একটি বিশিষ্ট উপায়, সহায়, অন্ততঃপক্ষে একটি দ্বার ; এরূপ অর্থ বুঝিবার যথেষ্ট কারণ আছে, আমরা পরে তাহা দেখিব। এমন কি এখানেও এইটিই শেষ কথা নহে ; শেষ কথা, চরম, চূড়ান্ত কথা বলা হইয়াছে ইহার পরের শ্লোকে, তাহাই এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥৫।২৯

"মানুষ যখন আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা বলিয়া জানিতে পারে, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, সকল জীবের সুহৃদ বলিয়া জানিতে পারে, তখন সে শান্তিলাভ করে।" এখানে আবার কর্ম্মযোগেরই শক্তির কথা ; এখানে বিশেষ করিয়া বলা হইল যে নির্ব্বাণের শান্তিলাভ করিতে হইলে সক্রিয় সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞান, বিশ্বের পরমাত্মার জ্ঞান আবশ্যক।

এখানে আবার আমরা গীতার সেই মহান্ তত্ত্ব, পুরুষোত্তম তত্ত্ব পাইতেছি ; যদিও এই "পুরুষোত্তম" নামটি গীতার একেবারে শেষের দিকেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ "অহং" ("আমি") বা "মাং" ("আমাকে") বলিতে সর্ব্বত্র পুরুষোত্তমকেই বুঝিয়াছেন ; যিনি আমাদের সনাতন অক্ষর সত্তার এক আত্মারূপে রহিয়াছেন, যিনি আবার জগতেও রহিয়াছেন, সর্ব্বভূতে সর্ব্ব কর্ম্মে রহিয়াছেন, যিনি শান্তি ও স্তব্ধতার প্রভু, আবার শক্তি ও কর্ম্মেরও প্রভু, যিনি এই মহাযুদ্ধে

দিব্য সারথিরূপে অবতীর্ণ, আবার যিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত, আত্মা, সর্ব্ব, প্রত্যেক জীবেরই প্রভু—সেই ভগবানই এই পুরুষোত্তম। তিনি সকল যজ্ঞের, সকল তপস্যার ভোক্তা অতএব যাঁহারা মুক্তি চান তাঁহারা যজ্ঞরূপে, তপস্যারূপে কর্ম্ম করিবেন; তিনি সর্ব্বলোকমহেশ্বর,—প্রকৃতিতে এবং এই সর্ব্বভূতে প্রকাশিত, অতএব যিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন সেরূপ মানবও ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য এবং এই সংসারে লোক সকলকে ঠিক সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য, লোক-সংগ্রাহর্থম্, কর্ম্ম করিবেন; তিনি (ভগবান) সর্ব্বভূতের সুহৃদ, অতএব যে মুনি নিজের মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে (অভিতঃ) নির্ব্বাণ পাইয়াছেন, তিনি তখনও সদাসর্ব্বদা সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন,—যেমন মহাযান বৌদ্ধদের নির্ব্বাণেরও শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ছিল—বিশ্বপ্রেম, দয়ারবশে সর্ব্বভূতের হিতসাধন। তাহা হইলেই যখন এরূপ ব্যক্তি তাঁহার সনাতন ও অক্ষর সত্তায় ভগবানের সহিত একত্বলাভ করিয়াছেন তখন তিনি প্রকৃতির খেলাকেও গ্রহণ করেন বলিয়া তখনও তাঁহার পক্ষে মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং ভগবানের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি সম্ভব হয়।

ইহাই যে প্রকৃত মর্ম্মার্থ তাহা আরও স্পষ্ট বুঝা যায় যখন আমরা গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি; সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়টি পঞ্চম অধ্যায়ের এই শেষ কয়টি শ্লোকেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও পূর্ণ বিকাশ,—ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, গীতা এই

কয়টি শ্লোককে কত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছে। অতএব আমরা এখানে যত সঙ্ক্ষেপে সম্ভব ষষ্ঠ অধ্যায়ের সার কথাগুলি বলিব। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে প্রকৃত সন্ন্যাস বাহিরের ত্যাগ নহে, কিন্তু ভিতরের ত্যাগ—পুনঃপুনঃ উপদিষ্ট এই কথাটি প্রথমেই বলিয়া গুরু ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করিলেন।

অনাশ্রিত কর্ম্মফলঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥৬৷১

—"যিনি ফলের দিকে না তাকাইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী,—যিনি যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করেন না বা কর্ম্ম করেন না, তিনি নহেন।"

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্ত সঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥৬৷২

—"যাহাকে সন্ন্যাস বলে, প্রকৃতপক্ষে তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিও; কারণ মনের সঙ্কল্প বা বাসনা পরিত্যাগ না করিলে যোগী হওয়া যায় না।" কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু কোন উদ্দেশ্যে, কোন ক্রমানুসারে? প্রথমে যোগ শৈলে আরোহণের সময়ে কর্ম্ম করিতে হইবে, কারণ, যেহেতু তখন কর্ম্মই "কারনমুচ্যতে"। কিসের কারণ? আত্ম-সিদ্ধি, মুক্তি, ব্রহ্মনির্ব্বাণের কারণ; কেন না ভিতরে ত্যাগের একনিষ্ঠ সাধনা করিতে করিতে কর্ম্ম করিলে এই সিদ্ধি, এই মুক্তি এবং সঙ্কল্পাত্মক মনের ও নীচের প্রকৃতির জয় খুব সহজেই সম্পাদিত হয়।

কিন্তু, যখন কেহ উপরে উঠিয়াছে? তখন কর্ম্ম আর কারণ নহে,—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥৬।৩

কর্ম্মের দ্বারা যে আত্মজয়ের ও আত্মসংযমের শান্তিলাভ হইয়াছে, সেই শান্তিই তখন কারণ হয়। আবার, কিসের কারণ? আত্মাতে, ব্রহ্মচৈতন্যে অবিচল প্রতিষ্ঠার কারণ, যে পূর্ণ সমতার সহিত মুক্ত মানবের দিব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদিত হয় সেই সমতার কারণ। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা আত্মসংযম ও শান্তিলাভ করিয়া মুক্তব্যক্তি সেই প্রশান্ত ভাবের সহায়ে ব্রহ্মচৈতন্যে ও পূর্ণ সমতায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ,—

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেযু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥৬।৪

—"মানুষ যখন শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ে অথবা কর্ম্মে আসক্ত হয় না এবং সঙ্কল্পাত্মক মনের বাসনাসমূহ বর্জ্জন করে, তখনই বলা যায় যে সে যোগশৈলের শিখরে আরোহণ করিয়াছে।" মুক্ত মানব এই ভাব লইয়াই কর্ম্ম করেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি; তিনি কর্ম্ম করেন বাসনা শূন্য হইয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া; তাঁহার মধ্যে বাসনার জনক মানসিক লালসা থাকে না। তিনি তাঁহার নীচের আত্মাকে জয় করিয়াছেন, তিনি যে পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়াছেন তাহাতে

তাঁহার পরমাত্মা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে; সেই পরমাত্মা সর্ব্বদা নিজের সত্তায় সমাহিত, সমাধিমগ্ন,—যখন বাহ্য জগত হইতে চেতনাকে ভিতর দিকে টানিয়া লয়েন কেবল তখনই নহেন, কিন্তু মনের জাগ্রত অবস্থাতেও যখন বাসনা ও অশান্তির কারণ উপস্থিত থাকে, সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ, মান অপমান, সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব উপস্থিত থাকে তখনও সেই পরমাত্মা নিজের সত্তায় অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৬।৭

এই পরমাত্মাই সেই অক্ষর, কূটস্থ, যাহা নীচের প্রকৃতির সমস্ত পরিবর্ত্তন ও গোলমালের উপরে অবস্থিত; ইহার সহিত যোগীকে তখনই যুক্ত বলা যায়, যখন যোগী ইহারই মত কূটস্থ হন, যখন তিনি সকল বাহিরের খেলা ও পরিবর্ত্তনের উপরে উঠেন, যখন তিনি আত্মজ্ঞানেই তৃপ্ত হন, যখন তিনি সকল বস্তু, সকল ঘটনা, সকল লোকের প্রতি সমভাবাপন্ন হন,—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ ॥ ৬।৮

তবে যাহাই হউক এই যোগলাভ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নহে, অর্জ্জুনও একটু পরেই ইহা বলিয়াছেন।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৬।৩৩

কারণ মন চঞ্চল, যে কোন সময়ে এই চঞ্চল মন বাহ্য বিষয়ের আক্রমণে এই সকল উচ্চভাব হইতে স্খলিত হইতে পারে এবং শোক ও চিত্তবিক্ষোভ ও অসমতার কঠিন কবলে পুনরায় নিপতিত হইতে পারে। বোধ হয় এইজন্যই গীতা নিজের জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধারণ প্রণালী দিয়া তাহার উপর আবার আমাদিগকে রাজযোগের ধ্যানের বিশেষ প্রণালীও উপদেশ দিয়াছে,—মন এবং মনের সমস্ত ক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে রাজযোগের এই অভ্যাসের ক্ষমতা খুব বেশী। এই প্রণালী অনুসারে যোগীকে সদাসর্ব্বদা আত্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিতে হয়, যেন এই যোগই তাহার মনের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। মন হইতে সমস্ত বাসনা ও বিক্ষোভ দূর করিয়া, সমগ্র চিত্তকে আত্মবশে রাখিয়া যোগী একা নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিবেন।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥৬।১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥৬।১২

"তিনি পবিত্র স্থানে নিজের স্থির আসন পাতিবেন, উহা অতি উচ্চ বা নিম্ন না হয়, প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগাজিন, তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদন করিবেন: তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক মনকে একাগ্র করিয়া, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া, আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন।" রাজযোগের প্রণালী

অনুসারে শরীরকে সরল ও স্থিরভাবে রাখিতে হইবে; দৃষ্টিকে ভিতরের দিকে টানিয়া ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিতে হইবে; দিশশ্চানবলোকয়ন্। মনকে প্রশান্ত ও ভয়শূন্য করিয়া রাখিতে হইবে এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হইবে; সমগ্র বিনিয়ত চিত্তকে ভগবানের দিকে ফিরাইতে হইবে, তাঁহাতে যুক্ত করিতে হইবে, এইরূপে চিত্ত মনের নীচের ক্রিয়া উচ্চতর শান্তিতে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে। কারণ, লক্ষ্য হইতেছে নির্ব্বাণের শান্তি লাভ।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥৬।১৫

"এইরূপে চিত্তসংযমের দ্বারা সর্ব্বদা যোগাভ্যাস করিয়া যোগী নির্ব্বাণের পরম শান্তি লাভ করেন; এই পরম শান্তির ভিত্তি আমি।"

নির্ব্বাণের এই শান্তি তখনই লাভ করা যায় যখন সমগ্র চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সংযত হয় এবং বাসনা হইতে মুক্ত হয় এবং আত্মাতে স্থির হইয়া থাকে, যখন বায়ুশূন্য স্থানে নিশ্চল দীপশিখার ন্যায় মন চাঞ্চল্য শূন্য হয়, ইহার বহির্মুখী চেষ্টা বন্ধ হয় এবং মনের এই শান্তি ও স্তব্ধতায় ভিতরে আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়, মন "অহং"য়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে যে ভ্রান্ত বিকৃতভাবে দেখে সেরূপ দেখা নয়, কিন্তু আত্মা যখন নিজে নিজেকে দেখে, **"স্বপ্রকাশঃ"**। তখন আত্মা পরিতৃপ্ত হয় এবং নিজেরই প্রকৃত ও **পরম** আনন্দ অবগত হয়,—এই আনন্দ ইন্দ্রিয় ও মনের

উপভোগ্য অশান্ত সুখ নহে, ইহা ভিতরের শান্ত সুখ ; এখানে আত্মা মনের উপদ্রব হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং আর তাহার আত্মস্বরূপ হইতে স্খলিত হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। মানসিক শোকের ভীষণতম আক্রমণও আত্মাকে আর বিচলিত করিতে পারে না ; কারণ, আমাদের মনের দুঃখ আসে বাহির হইতে, ইহা বাহ্যস্পর্শেরই প্রতিক্রিয়া, আর আত্মার সুখ ভিতরের, ইহা বাহিরের কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না, যাঁহারা অনিত্য বাহ্যস্পর্শের সুখদুঃখের বশ নহেন তাঁহারাই এই আত্যন্তিক আত্মসুখের অধিকারী। এই অবস্থার সহিত দুঃখের কোন সম্পর্ক নাই, দুঃখসংযোগবিয়োগং,—মনের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ এখানে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। দৃঢ় অধ্যবসায়ের দ্বারা এই অটুট আত্মানন্দলাভই যোগ, ইহাই দিব্য মিলন ; ইহা সকল লাভের বড় লাভ, এই পরম সম্পদের তুলনায় আর সব তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। অতএব দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত এই যোগ অভ্যাস করিতে হইবে, স নিশ্চয়েণ যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণ চেতসা, যতক্ষণ মুক্তিলাভ করা না যায়, যতক্ষণ নির্ব্বাণের আনন্দ চিরদিনের জন্য আয়ত্ত না হয় ততক্ষণ বাধা বা অকৃত-কার্য্যতার দ্বারা এতটুকু নিরুৎসাহ হওয়া চলিবে না।

এখানে প্রধানতঃ চিত্তবিক্ষেপকে শান্ত করিবার উপরে, বাসনা ও ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত করিবার উপরে ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে,—বাহ্যবিষয়ের স্পর্শে ইন্দ্রিয়গণ মনে যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করে তাহাই শান্ত করিতে বলা হইয়াছে ; কিন্তু

আত্মার শান্তিতে মনের চিন্তাকেও শান্ত করিতে হইবে। প্রথমে, বাসনাত্মক সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত সমস্ত বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে, যেন কিছুমাত্র বাসনা বাদ বা অবশিষ্ট না থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া ধরিতে হইবে, যেন তাহারা তাহাদের বিশৃঙ্খল ও চঞ্চল অভ্যাসের বশে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে না পারে; কিন্তু তাহার পর মনকেও বুদ্ধির দ্বারা ধরিতে হইবে এবং ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে। ধৈর্য্যানুগত বুদ্ধির দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে মনের ক্রিয়া বন্ধ করিবেন, মনকে উপরের আত্মায় নিবিষ্ট করিবেন এবং কোন কিছু চিন্তা করিবেন না। স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির মন যখনই যে দিকে ছুটিবে তখনই সে দিক হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে। মন যখন সম্পূর্ণভাবে শান্ত হইবে, তখনই যোগী, ব্রহ্মভূত আত্মার উত্তম, নিষ্কলঙ্ক, বিক্ষোভহীন সুখ লাভ করিবেন। এইরূপে বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইয়া এবং নিজেকে সর্ব্বদা যোগাবস্থায় রাখিয়া যোগী অনায়াসে ব্রহ্মস্পর্শরূপ পরম সুখ উপভোগ করেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥৬।২৮

তবু এই যোগের ফলে, এই জীবীতাবস্থাতে এমন নির্ব্বাণ হয় না যাহাতে সংসারের সমস্ত কাজ, সাংসারিক জীবের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ অসম্ভব হয়। প্রথমে মনে হইতে পারে যে

এইরূপ ফলই হইবে। যখন সমস্ত বাসনা ও ক্ষোভ বন্ধ হইয়াছে, যখন মন আর চিন্তার মধ্যে নিজেকে হারাইতে পায় না, যখন নীরব নির্জ্জন যোগ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর কি কাজ থাকিতে পারে, বাহ্যস্পর্শময় অনিত্য সংসারের সহিত আর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? যোগী অবশ্য আরও কিছুকাল শরীর ধারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহার পক্ষে পর্ব্বতগুহা, অরণ্য বা শৈলশিখরই যোগ্যতম ব্াসস্থান এবং সর্ব্বদা সমাধি-নিদ্রায় মগ্ন থাকাই হয় তাঁহার একমাত্র কাজ ও আনন্দ। কিন্তু, প্রথমতঃ যখন এই নির্জ্জন যোগ অভ্যাস করা হয়, তখন আর সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে গীতা উপদেশ দেয় নাই।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥৬।১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥৬।১৭

গীতা বলিতেছে যে যাহারা নিদ্রা, আহার, খেলা ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদের যোগ হয় না, আবার যাহারা দেহ ও প্রাণের এই সকল ব্যাপারে অত্যধিক মগ্ন তাহাদেরও যোগ হয় না; কিন্তু, নিদ্রা ও জাগরণ, আহার, বিহার ও কর্ম্ম-চেষ্টা সমস্তই "যুক্ত" হওয়া আবশ্যক। ইহার সাধারণতঃ এই অর্থ করা হয় যে এই সমস্ত ব্যাপার পরিমিত, নিয়মিত ভাবে

করা কর্ত্তব্য এবং বাস্তবিক পক্ষে ইহাই প্রকৃত অর্থ হইতে পারে। কিন্তু, অন্ততঃ যখন যোগলাভ হইয়াছে, তখন এই সমস্ত আর এক অর্থে "যুক্ত" হইতে হইবে, এবং সেই অর্থেই "যুক্ত" শব্দ গীতার আর সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল অবস্থাতে, নিদ্রায় জাগরণে, আহারে, বিহারে, কর্ম্মে, যোগী তখন ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিবেন, এবং যোগী সমস্ত করিবেন এই জ্ঞানে যে ভগবানই আত্মা, ভগবানই সব এবং তাঁহার নিজের জীবন, নিজের কর্ম্ম ভগবানের মধ্যেই রহিয়াছে, ভগবানই ধরিয়া রহিয়াছেন। বাসনা, অহঙ্কার, ব্যক্তিগত ইচ্ছা, মনের চিন্তা এই সব আমাদের কর্ম্মের প্ররোচক হয়, আমাদের নীচের প্রকৃতিতে; যখন অহং বিনষ্ট হয় এবং যোগী ব্রহ্ম হন, যখন তিনি সর্ব্বাতীত ও সার্ব্বভৌম চৈতন্যের মধ্যে বাস করেন, এমন কি উপরের চৈতন্য হইয়া যান তখন সেই চৈতন্য হইতে আপনা হইতে কর্ম্ম আসে, তখন সেই চৈতন্য হইতে যে স্বপ্রকাশ জ্ঞান আসে তাহা মনের চিন্তা অপেক্ষা উচ্চতর, তখন সেই চৈতন্য হইতে যে শক্তি আসে সে শক্তি ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষা মহত্তর, সেই শক্তি যোগীর কর্ম্ম করিয়া দেয়; তখন যোগীর ব্যক্তিগত কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পিত হইয়াছে, ভগবান সমস্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ময়ি সংন্যস্য কর্ম্মাণি।

অহং-ভাব এবং এই ভাব হইতে উত্থিত চিন্তা, কর্ম্ম ও অনুভূতি ব্রহ্ম চৈতন্যে নির্ব্বাণ বা লয় করিয়া যে আত্মোপলব্ধি

ও যোগসিদ্ধি * লাভ করা যায় তাহার বর্ণনা করিবার সময় গীতা বলিয়াছে যে, এরূপ নির্ব্বাণাবস্থায় বিশ্বসংসারের জ্ঞান লুপ্ত হয় না, সে জ্ঞান থাকে, তবে তাহা এক অভিনব দিব্য দৃষ্টিতে পরিণত হয়।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥৬।২৯

"যে মানবের আত্মা যোগযুক্ত, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখেন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দেখেন, তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী।" তিনি যাহা কিছু দেখেন তাঁহার নিকট সবই আত্মা, সব তাঁহারই আত্মা, সবই ভগবান। কিন্তু তিনি যদি ক্ষরের অনিত্যলীলার মধ্যে বাস করেন তাহা হইলেই কি আশঙ্কা নাই যে এই কঠিন যোগ সাধনের সমস্ত ফল তিনি হারাইয়া ফেলিবেন, আত্মাকে হারাইয়া আবার মনের মধ্যে পড়িবেন, ভগবান তাঁহাকে হারাইবেন এবং সংসার তাঁহাকে পাইয়া বসিবে, তিনি ভগবানকে হারাইয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে অহংকে এবং নীচের প্রকৃতিকে ফিরিয়া পাইবেন? গীতা বলিয়াছে, না, এরূপ আশঙ্কা নাই।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৬।৩০

"যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আমাকে দেখেন এবং আমার মধ্যে

* অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥৯।২২

সকলকে দেখেন, আমি তাঁহাকে হারাই না, তিনিও আমাকে হারান না।" কারণ, এই নির্ব্বাণের শান্তি যদিও অক্ষরের ভিতর দিয়া লাভ করিতে হয় তথাপি ইহা পুরুষোত্তমের সত্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, মৎসংস্থাম্, এবং এই দিব্য সত্তা, এই ব্রহ্ম সত্তা, জগতের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত এবং যদিও তাহা জগতের অতীতও বটে তথাপি সেই অতীত অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নহে। যোগীকে দেখিতে হইবে যে সকল বস্তুই তিনি (ভগবান), বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, এবং সম্পূর্ণভাবে এই দিব্যদৃষ্টিতেই বাস করিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে ; ইহাই যোগের পূর্ণ সিদ্ধি।

কিন্তু, কাজ করা কেন ? নির্জ্জনে নিজের আসন পাতিয়া বসিয়া থাকিবে, ইচ্ছা হয় সেখান হইতে সংসারের দিকে কেবল চাহিয়া দেখিবে, সংসারকে ব্রহ্মের মধ্যে, ভগবানের মধ্যে দেখিবে কিন্তু সংসারে কোনরূপ যোগ দিবে না, সংসারে বিচরণ করিবে না, বাস করিবে না, কর্ম্ম করিবে না, কেবল সাধারণতঃ অন্তরের সমাধির মধ্যেই বাস করিবে। এইরূপ ভাবে থাকাই কি আরও নিরাপদ নহে ? ইহাই কি সেই সর্ব্বোত্তম আধ্যাত্মিক অবস্থার নিয়ম নহে, বিধি নহে, ধর্ম্ম নহে ? আবার বলি, না ; ভগবানের মধ্যে বাস করিবে, ভগবানকে ভাল বাসিবে এবং সর্ব্বভূতের সহিত এক হইবে,—কেবল ইহা ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্ত যোগীর পক্ষে আর কোন নিয়ম নাই, বিধি নাই, ধর্ম্ম নাই ; তাঁহার স্বাধীনতা চূড়ান্ত, পূর্ণ, সুনিশ্চিত, তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ, আর তাহা কোন কর্ত্তব্যের নিয়ম, জীবনের অন্ত

নীতি বা বিধিনিষেধের উপর নির্ভর করে না, সে স্বাধীনতা আর কিছুর দ্বারাই খণ্ডিত হইতে পারে না। যোগের কোন প্রণালীতে আর তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি এখন সর্ব্বদাই যোগযুক্ত, নিত্যযুক্ত।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৬৷৩১

"যে যোগী একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বভূতে আমাকে ভালবাসেন, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি আমার মধ্যেই থাকেন ও কর্ম্ম করেন।" তখন সংসারের প্রতি ভালবাসা দিব্যভাবপ্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির পরিবর্ত্তে তাহা হয় আত্মার অনুভূতি, সেই ভালবাসা ভগবৎ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এরূপ দিব্যভাবপ্রাপ্ত ভালবাসায় কোন বিপদ নাই, কোন দোষ নাই। নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইলে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও ভয় অনেক সময় দরকার হইতে পারে, কারণ এই ভয় ও বিরাগ প্রকৃতপক্ষে সংসারের প্রতি নহে, আমাদের নিজের যে "অহং" সংসারের মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করিয়াছে সেই অহংয়ের প্রতি এই ভয় ও বিরাগ। কিন্তু, ভগবানকে সংসারে দেখিলে আর কোন ভয় থাকে না, তখন সকলকেই ভগবানের মধ্যে আলিঙ্গন করা যায় সকলকে ভগবান বলিয়া দেখিলে কোন কিছুর প্রতি দ্বেষ বা ঘৃণা থাকে না, তখন সংসারের-

মধ্যে ভগবানকে ভালবাসা যায় এবং ভগবানের মধ্যে সংসারকে ভালবাসা যায়।

কিন্তু অন্ততঃপক্ষে নীচের প্রকৃতির জিনিষগুলিকে ত বর্জ্জন করিতে হইতে হইবে, ভয় করিতে হইবে? এই সকল জয় করিতে যোগীকে যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে! না, তাহাও নহে; আত্মদর্শনের সমতায় সমস্তকেই আলিঙ্গন করিতে হইবে।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৬।৩২

"হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি আত্মার উপমায় সকল জিনিষকেই সমানভাবে দেখেন, তাহা দুঃখই হউক আর সুখই হউক, সেই ব্যক্তিকেই আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগী মনে করি।" ইহার দ্বারা মোটেই বোঝায় না যে তিনি নিজে দুঃখলেশ শূন্য দিব্য আনন্দ হইতে চ্যুত হইবেন এবং পরের দুঃখে নিজে আবার সাংসারিক দুঃখ অনুভব করিবেন, কিন্তু তিনি যে সকল দ্বন্দ্ব ছাড়াইয়া আসিয়াছেন, জয় করিয়াছেন সেই সকল দ্বন্দ্বের খেলা অপরের মধ্যে দেখিয়া তখনও তিনি সকলকে নিজের মত দেখিবেন, সকলের মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখিবেন, সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিবেন এবং নিজে এই সকল বাহ্য দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ বা বিমূঢ় না হইয়া যাহাতে অপরে এই সকল দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারই ন্যায় শুদ্ধ আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করিতে

পারে, সেজন্ত তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন, যতদিন এই জগতে তাঁহাকে থাকিতে হয় তিনি সর্ব্বভূতের হিতে রত থাকিয়া দিব্য জীবন যাপন করিবেন এবং সমগ্র সংসারকে ভগবানের দিকে লইয়া যাইবার জন্য কর্ম্ম করিবেন। যে ভাগবত প্রেমিক ইহা করিতে পারেন, এইরূপে সকল জিনিষকে ভগবানের মধ্যে দেখিয়া আলিঙ্গন করিতে পারেন, যিনি স্থির শান্ত দৃষ্টিতে নীচের প্রকৃতিকে, ত্রিগুণময়ী মায়ার খেলাকে অবলোকন করিতে পারেন, গুণসকলের মধ্যে, গুণসকলের উপর ক্রিয়া করিতে পারেন অথচ ঊর্দ্ধস্থ আধ্যাত্মিক একত্বের উচ্চতা ও শক্তি হইতে বিচ্যুত বা বিচলিত হন না, যিনি দিব্যদৃষ্টির বিশালতা পাইয়া মুক্ত, যিনি দিব্যপ্রকৃতির শক্তিতে সুন্দর, মহান্, ভাস্বর—এইরূপ ব্যক্তিকেই সর্ব্বোত্তম যোগী বলা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে সংসারকে জয় করিয়াছেন, জিতঃ সর্গঃ।

গীতা সর্ব্বত্র যেমন তেমনি এখানেও ভক্তিকেই যোগের চূড়া বলিয়াছে, সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেক ত্বমাস্থিতঃ; ইহাকেই সমগ্র গীতা শিক্ষার এক রকম শেষ ও সার কথা বলা যাইতে পারে,—"যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে ভগবানকে ভালবাসেন এবং যাঁহার আত্মা দিব্য একত্বে প্রতিষ্ঠিত, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তাঁহার সে সব ভগবানের মধ্যেই করা হয়।" এই কথাটা আরও জোরের সহিত বলিবার জন্ত দিব্য গুরু মাঝে অর্জ্জুনের একটা প্রশ্নের (মানুষের চঞ্চল মনের-

পক্ষে কঠিন যোগ কেমন করিয়া আদৌ সম্ভব, এই সন্দেহের) জবাব দিয়া পুনরায় এই কথাতেই ফিরিয়া আসিলেন এবং ইহাই তাঁহার চূড়ান্ত কথা হইল।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগীভবার্জ্জুন ॥৬।৪৬

—"যোগী [কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি] তপঃপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা বড়, জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও বড়, কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও বড় ; অতএব, হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও ;" যে যোগী কর্ম্ম ও জ্ঞান ও তপস্যা বা অন্য যে কোন উপায়ে কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা শক্তি বা অন্য কিছু চান না কিন্তু শুধু ভগবানের সহিত মিলন চান, ভগবানের সহিত যুক্ত হন, তুমি সেইরূপ যোগী হও ; কারণ, ইহার মধ্যেই আর সব কিছু আছে, ইহাতে উঠিয়াই সে সব দিব্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু আবার যোগীদের মধ্যেও যিনি ভক্ত তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৬।৪৭

—"যোগিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহার সমগ্র অন্তরাত্মা আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি করে, আমার মতে সেই ব্যক্তিই আমার সহিত যোগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত।" ইহাই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের শেষ কথা

এবং ইহার মধ্যেই গীতার অবশিষ্ট অংশের বীজ নিহিত রহিয়াছে, যাহা এখনও বলা হয় নাই এবং যাহা কোথাও পূর্ণভাবে প্রকাশ করা হয় নাই, তাহার বীজ এইখানেই নিহিত,—তাহা সকল সময়েই কতকটা গূঢ় রহস্যের মতই রহিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গুহ্য তত্ত্ব এবং দিব্য রহস্য।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

কর্ম্মযোগের সারতত্ত্ব

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়কে গীতা শিক্ষার এক রকম কাঠামো বলা যাইতে পারে; এখানে প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি মোটামুটি দেখান হইয়াছে এবং গীতার বাকী দ্বাদশটি অধ্যায়ে যে সব অতি প্রয়োজনীয় কথা বিশদভাবে বলা হইবে তাহাদের কেবলমাত্র কিছু কিছু ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হইয়াছে। গীতা যদি একটি লিখিত মহান্ শাস্ত্রগ্রন্থ না হইত এবং সেইজন্য বাধ্য হইয়া ইহার শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে শেষ না করিতে হইত, এই শিক্ষা যদি কোন জীবিত গুরু তাঁহার শিষ্যকে দিতেন এবং শিষ্য যেমন অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়, সেই অনুসারে এই শিক্ষা ক্রমশঃ বিবৃত করিতেন, তাহা হইলে গুরু ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষেই থামিয়া বলিতে পারিতেন,—"প্রথমে এইটুকুই সাধনা কর, তোমার করিবার ও পাইবার মত যথেষ্ঠ জিনিষ ইহাতেই আছে এবং ইহাই তোমার সাধনার পক্ষে যতদূর সম্ভব উদার ভিত্তি হইতে পারে অতঃপর যে সব সমস্যা বা সংশয় উঠিবে, আপনা হইতেই সে সকলের সমাধান হইয়া যাইবে অথবা আমিই তোমার জন্য সে সকলের সমাধান করিয়া দিব। কিন্তু বর্ত্তমানে, আমি যাহা

বলিয়াছি, তাহাই জীবনে সাধনা কর; ভিতরে এই ভাব রাখিয়া কর্ম্ম কর।" সত্য বটে, এখানে এমন অনেক জিনিষ আছে যেগুলি ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে পরবর্ত্তী অংশের আলোক প্রয়োজন। উপস্থিত সমস্যার মীমাংসার জন্য এবং ভুল বোঝা নিবারণের জন্য আমাকেও পরের অনেক কথা এখানেই বলিতে হইয়াছে; এইরূপেই আমাকে পুরুষোত্তমতত্ত্বের অবতারণা করিতে হইয়াছে, কারণ এই তত্ত্বের অবতারণা না করিলে আত্মা, কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি সংশয়ের মীমাংসা করা যাইত না; শিষ্য সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই তত্ত্বের অবতারণা করিলে পাছে তাহার বুদ্ধির গোলমাল হইয়া সাধন পথে সে বিচলিত হয় সেইজন্য গীতা ইচ্ছা করিয়াই এই সংশয়গুলি সমাধান করিবার এখানে কোন চেষ্টা করে নাই।

গুরু এইখানেই শিক্ষা স্থগিত রাখিলে অর্জ্জুনও আপত্তি তুলিয়া বলিতে পারিতেন,—'আপনি বাসনা আসক্তির বিনাশ সম্বন্ধে, সমতার সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা এবং মনকে শান্ত করা সম্বন্ধে, বিক্ষোভহীন অনহঙ্কৃত কর্ম্ম সম্বন্ধে, যজ্ঞার্থে কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন এবং এগুলি কার্য্যতঃ সাধন করা আমার পক্ষে যত কঠিন বলিয়াই বোধ হউক, এগুলি আমি বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আবার আপনি বলিয়াছেন যে কর্ম্ম লইয়া থাকিবার কালেই গুণ সকলের উপরে

উঠিতে হইবে অথচ এই সকল গুণের ক্রিয়া কিরূপ তাহা আমাকে বলেন নাই, এবং তাহা যতক্ষণ আমি না জানিতেছি ততক্ষণ এই সকলগুণের কার্য্য ধরা এবং তাহাদের উপরে উঠা আমার পক্ষে কঠিন হইবে। তাহা ছাড়া, আপনি ভক্তিকেই যোগের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়াছেন, অথচ আপনি কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে এক রকম কিছুই বলেন নাই। আর, কাহাকেই বা এই ভক্তি, এই শ্রেষ্ঠ জিনিষ অর্পণ করিতে হইবে? নিস্তব্ধ নির্গুণ ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই নহে, ভক্তি করিতে হইবে আপনাকে, ঈশ্বরকে। তাহা হইলে আমাকে বলুন, আপনি কি? জ্ঞান যেমন কর্ম্ম অপেক্ষা বড় অক্ষর ব্রহ্ম তেমনিই ক্ষর প্রকৃতি অপেক্ষা বড়, আবার ভক্তি যেমন আত্মজ্ঞানের অপেক্ষাও বড়, আপনিও তেমনিই অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষা বড়—এইরূপে আপনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্তা, বলুন আপনার স্বরূপ কি? এই তিন জিনিষের মধ্যে সম্বন্ধ কি? কর্ম্ম, জ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? "প্রকৃতি-স্থ" পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ ইহাদের সহিত সেই পুরুষোত্তমের সম্বন্ধ কি, যিনি একাধারে সকলের অক্ষর আত্মা এবং জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের প্রভু,—যে পরমেশ্বর এই মহাযুদ্ধে আমার রথে সারথিরূপে অবতীর্ণ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই গীতার বাকী অংশ লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক, বুদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক মীমাংসা

দিতে হইলে এই সকল প্রশ্ন ফেলিয়া রাখা চলে না, অবিলম্বে ইহাদিগকে তুলিয়া সমাধান করিতেই হয়। কিন্তু বাস্তব সাধনায় এইরূপে একেবারে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হয় না, সাধক স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, অনেক তত্ত্ব, বস্তুতঃ, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতত্ত্ব সকল ভবিষ্যতের জন্য থাকে, সাধক আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে যত অগ্রসর হয়, সেই আলোকে উচ্চতরতত্ত্ব সকল ক্রমশঃ উঠে ও পূর্ণভাবে মীমাংসিত হয়। গীতা কতকটা এই পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছে এবং প্রথমে কর্ম্ম ও জ্ঞানের উদার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে; এখানে এমন জিনিষ দিয়াছে যাহা হইতে পরে ভক্তিতে এবং উচ্চতর জ্ঞানেতে পৌছান যাইবে। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আমরা এই ভিত্তি পাই।

তাহা হইলে, যে সমস্যা লইয়া গীতার আরম্ভ তাহার সমাধান এই ছয় অধ্যায়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে আমরা এইখানে থামিয়া তাহার আলোচনা করিতে পারি। এইখানে আবার বলা প্রয়োজন, যে কেবল ঐ সমস্যারই সমাধানের জন্য বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং সাধারণ জীবন ছাড়াইয়া দিব্য জীবন লাভ সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্ন যে তুলিতেই হইত এমন কোন কথা নাই। অর্জ্জুনের যে সমস্যা লইয়া গীতার আরম্ভ সে সমস্যার মীমাংসা নানারূপে করা যাইতে পারিত। ব্যবহারিক দিক হইতে, নীতিশাস্ত্রের দিক হইতে, বুদ্ধি বিচারের দিক হইতে কিম্বা আদর্শের দিক হইতে ঐ সমস্যার মীমাংসা করা

যাইত অথবা এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়াই একটা মীমাংসা করা যাইত ; বাস্তবিক পক্ষে এই সমস্যার এইরূপ সমাধানই আমাদের আধুনিক প্রথা। শুধু এই সমস্যাটি ধরিলে প্রথমে কেবল এই প্রশ্নই উঠে যে, হত্যাকাণ্ড করিতে অর্জ্জুনের যে পাপের ভয় হইতেছে সেই ব্যক্তিগত পাপপুণ্য জ্ঞানের দ্বারা তাহার পরিচালিত হওয়া উচিত, না, ধর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সকল মহানুভব, ব্যক্তিরই সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় সেই কর্ত্তব্যজ্ঞানের দ্বারা তাহার পরিচালিত হওয়া উচিত? আমাদের যুগে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং নানাভাবে নানা দিক দিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করা যায় ও বস্তুতঃ করা হইতেছে, কিন্তু এই সমস্ত মীমাংসা হয় আমাদের সাধারণ জীবনের দিক হইতে, মানুষের সাধারণ মনোভাবের দিক হইতে। আমরা বলিতে পারি যে এখানে প্রশ্ন হইতেছে,—ব্যক্তিগত বিবেকের নির্দ্দেশ পালন করা উচিত, না, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহারই অনুসরণ করা উচিত,—একটা আদর্শ নীতির অনুসরণ করা উচিত, না, কার্য্যক্ষেত্রে যাহা উপযোগী এমন ব্যবহারিক নীতিরই অনুসরণ করা উচিত,—আত্মার শক্তির ("Soul force") উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত, না, জীবন এখনও সমগ্রভাবে আত্মায় পরিণত হয় নাই এবং ধর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য যুদ্ধে অস্ত্রধারণ

করা কখনও কখনও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, এই কঠোর সত্যকে স্বীকার করা উচিত? যাহার যেরূপ হৃদয়, মন, বুদ্ধি, স্বভাব তিনি তদনুসারে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া থাকেন; ইহাতে আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাব এবং নৈতিক ও মানসিক উন্নতির অবস্থানুসারে উপযোগী একটা মীমাংসা আমরা করিতে পারি; কিন্তু, এরূপে চরম মীমাংসা হইতে পারে না। কারণ, এই মীমাংসা আমাদের সাধারণ মন বুদ্ধি হইতে আইসে,—এই মন আমাদের জীবনের নানাদিকের টান ও ঝোঁকের বশ,—আমাদের মনের এই সকল ঝোঁক, আমাদের বিচার বুদ্ধি, আমাদের নৈতিক স্বভাব, আমাদের কর্ম্মের প্রেরণা, আমাদের সংস্কার, আমাদের হৃদয়বৃত্তি, আমাদের মধ্যে নানা অজ্ঞাত প্রেরণা—এই সকলের মধ্যে যাহা হউক এক রকম সামঞ্জস্য করিয়া আমাদের মন একটা মীমাংসায় পৌঁছায়; গীতা বুঝিয়াছে যে, এইভাবে কোন চরম মীমাংসা হইতে পারে না, কেবল একটা সাময়িক কাজ চলা মীমাংসা হইতে পারে মাত্র; অর্জ্জুনকে প্রথমে তৎকালপ্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসারে এইরূপ একটা কাজ চলা মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে। অর্জ্জুনের তখন সেরূপ মীমাংসা গ্রহণ করিবার ধাত্ নহে, বাস্তবিক, অর্জ্জুন ঐ মীমাংসাতেই সন্তুষ্ট হউক তাঁহার দিব্যগুরুরও সে ইচ্ছা ছিল না; যাহা হউক অর্জ্জুন যখন সেরূপ মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইলেন না তখন গুরু অন্য এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক হইতে, এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন মীমাংসা দিতে অগ্রসর হইলেন।

গীতার মীমাংসা হইতেছে যে, আমাদের প্রাকৃত জীবন এবং সাধারণ মনের উপরে উঠিতে হইবে, আমাদের বিচার বুদ্ধি ও সাধারণ নীতি-জ্ঞানের সংশয়সমূহের উপরে অন্য এক চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে হইবে সেখানে সত্ত্বার ধর্ম্ম আলাদা এবং সেইজন্য আমাদের কর্ম্মের ভিত্তি ও মূল নীতিও আলাদা; সেখানে ব্যক্তিগত বাসনা, ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের দ্বারা আমাদের কর্ম্ম আর নিয়ন্ত্রিত হয় না; সেখানে দ্বন্দ্ব সকলের অবসান হয়; সেখানে কর্ম্ম আর আমাদের নিজের থাকে না, অতএব সেখানে ব্যক্তিগত পুণ্য বা ব্যক্তিগত পাপ বোধের উপরে উঠা যায়; সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষ ভগবান আমাদের ভিতর দিয়া জগতে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পাদন করেন; সেখানে আমরাও এক অভিনব ও দিব্য জন্ম লাভ করি, সেই ভাগবত সত্ত্বার সত্ত্বাতে পরিণত হই, সেই শক্তির শক্তিতে পরিণত হই, সেই আনন্দের আনন্দেতে পরিণত হই; তখন আমরা আমাদের নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উঠি বলিয়া, তখন আমাদের নিজেদের জন্য করিবার কোন কাজ থাকে না, নিজেদের জন্য অনুসরণ করিবার কোন ব্যক্তিগত বাসনা বা লক্ষ্য থাকে না, কিন্তু তখন যদি আমরা আদৌ কর্ম্ম করি * তাহা হইলে কেবল ভগবানের কাজই করি, তখন আমাদের বাহ্য প্রকৃতি আর এই সকল দিব্যকর্ম্মের নিয়ামক বা প্ররোচক থাকে না, কেবল উর্দ্ধের শক্তির হস্তে

---

* কেবল এই একটি মাত্র সমস্যার সমাধান করা বাকী থাকে।

যন্ত্রমাত্র হইয়া কার্য্য করে আমাদের কর্ম্মের যিনি ঈশ্বর, তাঁহারই ইচ্ছা হয় আমাদের সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই মীমাংসাকেই প্রকৃত মীমাংসা বলা হইয়াছে, কারণ ইহা আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্যের অনুযায়ী এবং আমাদের প্রকৃত স্বরূপ অনুসারে জীবন যাপনই যে চরম মীমাংসা, আমাদের জীবনের সমস্ত সমস্যার একমাত্র পূর্ণ সমাধান সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। আমাদের মন ও প্রাণ লইয়া আমাদের যেরূপ তাহা আমাদের প্রাকৃত জীবনে সত্য, কিন্তু তাহা অজ্ঞানের, অবিদ্যার সত্য এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট যাহা কিছু আছে সে সবই এই রকমের সত্য, কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বরূপে যখন আমরা ফিরিয়া যাই, তখন আর এ সবের কোন সার্থকতা বা মূল্য থাকে না। কিন্তু, ইহাই যে প্রকৃত কথা সে সম্বন্ধে আমরা কেমন করিয়া নিঃসন্দেহ হইব? আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিব না, যতক্ষণ আমরা আমাদের সাধারণ মানসিক উপলব্ধি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব; কারণ আমাদের সাধারণ মনের অনুভূতি উপলব্ধি সম্পূর্ণভাবে নীচের প্রকৃতির, অজ্ঞানে পূর্ণ। এই উচ্চতর সত্যকে জানিতে হইলে জীবনের মধ্যেই তাহাকে ধরিতে হইবে অর্থাৎ যোগের দ্বারা মানসিক উপলব্ধি হইতে উপরে উঠিয়া আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে প্রবেশলাভ করিতে হইবে,—ইহা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই। কারণ, আমরা যতক্ষণ মনের উপরে উঠিয়া আত্মার সহিত একাত্ম না হইতে পারিতেছি, আমাদের বর্ত্তমান খণ্ডপ্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া যতক্ষণ আমাদের সত্য ও

দিব্য সত্তার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বাস না করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ জীবনে একান্তভাবে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লইয়া চলার নামই যোগ।

এইরূপে নীচের প্রাকৃত জীবন হইতে উপরে উঠা এবং এইরূপে আমাদের সমগ্র সত্তা ও চৈতন্যের রূপান্তর সাধন এবং ইহার ফলে আমাদের কর্ম্মের (বাহ্যিক কোনরূপ পরিবর্ত্তন না হইলেও) ভাব ও প্রেরণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন—ইহাই গীতার কর্ম্মযোগের সার তত্ত্ব। তোমার সত্তার পরিবর্ত্তন সাধন কর, আত্মার মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ কর এবং এইরূপ নবজন্ম লাভ করিয়া তোমার অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ অনুসারে কর্ম্ম কর—ইহাকেই কর্ম্মযোগের মর্ম্মকথা বলা যাইতে পারে। অথবা, আরও গভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সহিত বলা যাইতে পারে,—তোমাকে এখানে যে কর্ম্ম করিতে হয় সেই কর্ম্মকে তোমার আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম লাভের সহায় কর (অর্থাৎ এমন ভাবে তোমার কর্ম্ম কর যেন সেই কর্ম্মের সাহায্যে তুমি ভিতরে দিব্য জন্মলাভ করিতে পার) এবং দিব্যভাব প্রাপ্ত হইবার পরও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ভগবানের যন্ত্র স্বরূপ দিব্যকর্ম্ম সকল সম্পাদন কর।

অতএব এখানে দুইটি জিনিষ বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, প্রথমতঃ, আমাদের সত্তার ও প্রকৃতির রূপান্তর সাধনের উপায় কি, উপরে উঠিবার, দিব্য জন্মলাভ করিবার উপায় কি, পথ কি তাহা বুঝিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মের

প্রকার কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিতে হইবে [বস্তুতঃ ভিতরে কি ভাব লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে তাহাই বুঝিতে হইবে, কারণ কর্ম্ম ব্যাহৃতঃ কি রকম হইবে সে বিষয়ে কোনরূপ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, তবে কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন হইবে]। কিন্তু, কার্য্যতঃ এই দুইটি জিনিষই এক, কারণ একটিকে ভাল করিয়া বুঝিলে অপরটিকেও বুঝা যায়। আমাদের কর্ম্মের পশ্চাতে ভাব কিরূপ হইবে তাহা আমাদের সত্তার স্বরূপ ও ভিতরের প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে, কিন্তু আবার এই স্বরূপও আমাদের কর্ম্মের ভাব ও গতির দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় ; আমাদের কর্ম্মের ভাবগতি খুব বেশী পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহাতে আমাদের সত্তা রূপান্তরিত হয় এবং ইহার ভিত্তিও পরিবর্ত্তিত হয় ; চেতনশক্তির যে কেন্দ্র হইতে আমরা কর্ম্ম করি তাহা সরিয়া যায়। এইরূপ হওয়া কখনই সম্ভব হইত না, যদি জীবন ও কর্ম্ম একেবারে মিথ্যা মায়া হইত, যদি জীবন ও কর্ম্মের সহিত আত্মার কোন সম্পর্ক না থাকিত ; কিন্তু, আমাদের মধ্যে আত্মা জীবন ও কর্ম্মের দ্বারাই বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয় ; তবে বাহিরের কর্ম্মেরই দ্বারা ততটা নহে, যতটা কর্ম্মের পিছনে আছে যে ভাব ও শক্তি তাহার দ্বারাই আমাদের আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। বৃহত্তর আত্মোপলব্ধির সাধনায় কার্য্যতঃ কর্ম্মযোগের ইহাই সার্থকতা।

গোড়াতে ভিত্তি স্বরূপে আমরা ইহাই পাইতেছি যে মানুষের বর্ত্তমান আভ্যন্তরীণ জীবনই তাহার সব নহে, তাহার জীবনের

সম্ভাবনা ইহা অপেক্ষা অনেক বড়, এমন কি এই অবস্থা তাহার প্রকৃত বর্ত্তমান জীবনেরও সবখানি নহে; মানুষের এই বর্ত্তমান জীবন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই তাহার দেহ ও প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কেবল মানসিক শক্তির সীমাবদ্ধ খেলায় একটু উপরে উঠিয়াছে। মানুষের ভিতরে লুক্কায়িত এক আত্মা রহিয়াছে, মানুষের বর্ত্তমান প্রকৃতি সেই ভিতরের আত্মার বাহ্যরূপ অথবা উহার আংশিক লীলা বিকাশ। গীতা বরাবর মানুষের প্রকৃতিকে আত্মার লীলাবিকাশরূপে সত্য বলিয়াই ধরিয়াছে বলিয়া মনে হয়, চরমপন্থী বৈদান্তিকদের ন্যায় মিথ্যা মায়া মাত্র বলে নাই; এইরূপ বেদান্ত মত গ্রহণ করিলে সকল প্রকার কর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এই বিষয়ে গীতা নিজের দার্শনিক মত ব্যক্ত করিতে সাংখ্যদর্শনকৃত প্রকৃতি পুরুষের বিভেদ অবলম্বন করিয়াছে* পুরুষ জ্ঞাতা, ভর্ত্তা, অনুমন্তা, আর প্রকৃতি কর্ম্ম করে, যন্ত্রের, আধারের, কর্ম্মের, নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। গীতা কেবল সাংখ্যের মুক্ত ও অক্ষর পুরুষকে লইয়া বেদান্তের ভাষায় তাহাকে বলিয়াছে অদ্বিতীয়, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা ব্রহ্ম এবং প্রকৃতিতে বদ্ধ অপর আত্মার সহিত এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রভেদ করিয়াছে,—এই "প্রকৃতিস্থ" আত্মাই আমাদের ক্ষর ও লীলারত আত্মা, ইহাই সর্ব্বভূতের বহুরূপী আত্মা, ইহাই সকল বৈচিত্র্যের এবং বিভিন্ন

* গীতার দার্শনিক মতের এই অংশ অন্য ভাবেও ব্যক্ত করা চলিত।

নাম রূপের ভিত্তি। কিন্তু, তাহা হইলে প্রকৃতির কর্ম্মের স্বরূপ কি ?

মূলতঃ তিনটিগুণের পরস্পরের সহিত খেলাই প্রকৃতির কর্ম্মের ধারা। তাহার পর, আধার কি ? প্রকৃতির ক্রমবিকাশে যে সকল যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের সম্মেলনই আধার ; প্রকৃতির কার্য্যের দ্রষ্টা আত্মাতে এই সকল যন্ত্র যে ভাবে প্রতিফলিত হয়, এখানে ক্রমপর্য্যায়ানুসারে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়গণ, এবং জড়শক্তির মূল উপাদান পঞ্চ মহাভূত। এই সমস্তই জড়, প্রকৃতির জটীল যন্ত্র ; আধুনিক মতানুসারে বলিতে পারা যায় যে, ইহারা সবই জড়শক্তির অন্তর্গত, "প্রকৃতিস্থ" আত্মা এই সকল যন্ত্রের ক্রমবিকাশের দ্বারা যেমন ক্রমশঃ নিজেকে জানিতে পারে, এই সকল যন্ত্রও তেমনই জড়শক্তির মধ্যে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠে, তবে ইহাদের অভিব্যক্তির ক্রম পূর্ব্বে উল্লিখিত ক্রমের বিপরীত, যথা,—প্রথমে মহাভূত (Matter), তাহার পর ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Sensation), তাহার পর মন, পরে বুদ্ধি, শেষে আধ্যাত্মিক চৈতন্য। বুদ্ধি প্রথমে প্রকৃতির খেলা লইয়া ব্যস্ত থাকে ; তাহার পর প্রকৃতির এই খেলার যথার্থ স্বরূপ বোঝা বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, বুদ্ধি বুঝিতে পারে যে এই সব কেবল তিনগুণের খেলা এবং এই খেলায় আত্মা বাঁধা পড়িয়াছে, আত্মা যে এই খেলা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বুদ্ধি সে ভেদ বুঝিতে পারে ; তখন আত্মা নিজেকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহার সনাতন মুক্তি ও অক্ষর

সত্তায় ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পায়। বেদান্তের ভাষায় ইহা তখন পরমাত্মাকে দেখে, সত্য বস্তুকে দেখে ; আত্মা আর তখন নিজেকে প্রকৃতির যন্ত্র ও প্রকৃতির কর্ম্মের সহিত এক বলিয়া দেখে না ; ইহা তখন নিজের প্রকৃত সত্তার সহিত নিজেকে অভিন্ন দেখে এবং নিজের অক্ষর, আধ্যাত্মিক, স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থা ফিরিয়া পায়। তখনই সেই আধ্যাত্মিক আত্ম-প্রতিষ্ঠা হইতে আত্মা মুক্ত ভাবে, নিজের সত্তার প্রভু ভাবে, ঈশ্বর ভাবে, নিজের বিকাশের লীলাকে ধারণ করিতে পারে, ইহাই গীতার মত।

মনোবিজ্ঞানের যে সকল তথ্যের উপর এই সব দার্শনিক * ভেদবিচার প্রতিষ্ঠিত, কেবল সেই সকল ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য করিলে বলিতে পারা যায় যে, আমরা দুই প্রকারে জীবন যাপন করিতে পারি—(১) নিজের সক্রিয় প্রকৃতির লীলায় মগ্ন আত্মার জীবন,—এই জীবনে আত্মা তাহার শারীরিক ও মানসিক যন্ত্র সমূহের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে, এই সকল যন্ত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, নিজের নাম রূপের মধ্যে বদ্ধ হয়,প্রকৃতির অধীন হয়, আর(২) উপরের আত্মার জীবন, এই জীবনে আত্মা এই সকল জিনিষের উপরে, বিরাট, নামরূপের অতীত, সর্ব্বব্যাপী, মুক্ত, অসীম,—ইহা অনন্ত সমতার সহিত,

* জড়জগৎ ও মনোজগতের ব্যাপার-সমূহের মূলতত্ত্ব এবং যদি কোন এক পরম সত্য বস্তু থাকে, তাহার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ, বিচার বুদ্ধির সহায়ে বিবৃত করাই দর্শন-শাস্ত্র বা Philosophy।

ইহার প্রাকৃত জীবনও কর্ম্মকে ধরিয়া থাকে কিন্তু, নিজে মুক্ত ও অসীম হওয়ায় ইহাদের দ্বারা বদ্ধ হয় না। আমাদের বর্ত্তমান প্রাকৃত সত্তার মধ্যেই আমরা বাস করিতে পারি। অথবা আমাদের উচ্চতর ও আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে বাস করিতে পারি। গোড়ায় এই বড় প্রভেদটির উপর গীতার কর্ম্মযোগ প্রতিষ্ঠিত।

তাহা হইলে সমগ্র সমস্যা হইতেছে এই যে, কেমন করিয়া আত্মাকে আমাদের বর্ত্তমান প্রাকৃত সত্তার গণ্ডী হইতে মুক্ত করা যায়। আমাদের প্রাকৃত জীবনে যে ব্যাপারটি আর সকলকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতেছে, বাহ্যস্পর্শের বশ্যতা, জড়প্রকৃতির বাহ্যরূপের বশ্যতা। বাহ্য-স্পর্শসকল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণে উপস্থিত হয় এবং প্রাণও তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া ঐ সকল বাহ্যবস্তুকে ধরিবার জন্য, উপভোগ করিবার জন্য ধাবিত হয়, বাসনা করে, আসক্ত হয়, ফল চায়। মন এই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করে, মনের ভিতরের সকল অনুভূতি, প্রতিঘাত, আবেগ এবং সমস্ত অভ্যস্ত চিন্তা, ভাব, প্রত্যক্ষের ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়গণেরই অনুবর্ত্তী। বুদ্ধিও মনের টানে পড়িয়া এই ইন্দ্রিয়গত জীবনে নিজেকে ভাসাইয়া দেয়,—এইরূপ জীবনে অন্তরাত্মা বাহ্যরূপের অধীন হইয়া পড়ে এবং মুহূর্ত্তের জন্যও ইহার উপরে উঠিতে পারে না, বাহ্যজগৎ আমাদের অন্তরে যে সকল ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে তাহাদের গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। পারে না অহঙ্কারের জন্য ;—প্রকৃতি আমাদের মন, ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়,

দেহের উপর যে ক্রিয়া করিতেছে তাহার সমষ্টি হইতে বুদ্ধি অহঙ্কারের দ্বারা অপরের দেহ মনাদির উপর প্রকৃতির ক্রিয়াকে প্রভেদ করে ; এবং আমরা জীবন বলিতে বুঝি প্রকৃতি আমাদের অহংকে কিরূপ আঘাত করিতেছে এবং আমাদের অহং কিরূপ প্রকৃতির স্পর্শের প্রতিঘাত করিতেছে। আমরা আর কিছু জানি না, আমরা যে আর কিছু তাহা মনে হয় না ; আত্মাকেই মনে হয় যেন কেবল মন, ইচ্ছা, এবং চিত্ত ও স্নায়ুর ঘাত প্রতিঘাতের একটা স্তূপ। আমাদের "অহং"কে আমরা বিস্তৃত করিতে পারি, নিজেদিগকে পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি, দেশ, এমন কি সমগ্র মানবজাতিরই সহিত এক করিয়া দেখিতে পারি। কিন্তু, তথাপি এই সব ছদ্মবেশের অন্তরালে আমাদের "আমিই" থাকে সকল কার্য্যের মূল, কেবল এই সকল বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিস্তৃত হওয়ায় আমাদের অহঙ্কারের আরও অধিক তৃপ্তি হয় মাত্র।

তখনও আমাদের ভিতরে প্রাকৃত সত্তার ইচ্ছাই কার্য্য করে, বাহ্য জগতের স্পর্শ ধরিয়াই "আমি"র—বিভিন্ন রূপের তৃপ্তি করিতে চায়—এবং এই ইচ্ছা সকল সময়েই বাসনার ইচ্ছা, কাম, ক্রোধের ইচ্ছা, কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে আসক্তির ইচ্ছা, ইহা আমাদের ভিতরে প্রকৃতিরই ইচ্ছা। আমরা বলি বটে, যে ইহা আমাদের নিজের ইচ্ছা কিন্তু আমাদের "নিজত্ব" আমাদের "অহং" প্রকৃতিরই সৃষ্টি, ইহা আমাদের মুক্ত আত্মা নহে, আমাদের স্বাধীন সত্তা নহে, হইতেই পারে না। এই

সমস্তই প্রকৃতির গুণের খেলা। ইহা তমোগুণের খেলা হইতে পারে, তখন আমাদের স্বভাব হয় জড়ের ন্যায়,। আমরা গতানুগতিক হইয়া পড়ি, সংসারের বাঁধাধরা চালের বাহিরে যাইতে চাই না, আরও স্বাধীন ও মুক্তভাবে কার্য্য করিবার কোন বিপুল প্রয়াস করিতে সক্ষম হই না। অথবা ইহা রজোগুণের খেলা হইতে পারে, তখন আমাদের স্বভাব হয় চঞ্চল, অস্থির, কর্ম্মপ্রবণ, আমরা প্রাকৃতিক ঘটনা-স্রোতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ি এবং প্রকৃতিকে বশ করিয়া নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ, নিজের বাসনাতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু দেখিতে পাই না যে ইহা আমাদের জয় বা প্রভুত্ব বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে ইহা দাসত্ব-ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ আমাদের যে বাসনা ও প্রয়োজন, সে সব প্রকৃতিরই বাসনা ও প্রয়োজন এবং যতক্ষণ আমরা উহাদের বশ ততক্ষণ আমাদের কোনরূপ স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। অথবা ইহা সত্ত্বগুণের খেলা হইতে পারে, তখন আমাদের স্বভাব হয় জ্ঞানময় এবং আমরা বিচার-বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে চাই অথবা সত্য, শুভ বা সুন্দরের কোন আদর্শ বাছিয়া লইয়া তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি; কিন্তু, এখানেও বিচার-বুদ্ধি প্রকৃতির বাহ্যরূপের বশ এবং ঐ সকল আদর্শ আমাদের আমিত্বেরই পরিবর্ত্তনশীল বিভিন্নরূপ মাত্র এবং ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা কোন নিশ্চিত ধর্ম্ম বা স্থায়ী তৃপ্তিলাভ রতে পারি না। তখনও আমরা একটা ঘূর্ণীয়মান চক্রের

উপর ঘুরিতে থাকি, এবং আমাদের অহংয়ের ভিতর দিয়া এক শক্তি আমাদিগকে ঘুরায়, সে শক্তি আমাদের ভিতরেও রহিয়াছে, আমাদের বাহিরেও রহিয়াছে কিন্তু আমরা নিজেরা সে শক্তি নহি কিম্বা সজ্ঞানে সে শক্তির সহিত যুক্ত নহি। তখনও কোন মুক্তি নাই, প্রকৃত ঈশ্বরত্ব নাই।

অথচ মুক্তি সম্ভব। ইহার জন্য আমাদিগকে প্রথমে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্যজগতের যে ক্রিয়া তাহা হইতে সরিয়া নিজেদের ভিতরে আসিতে হইবে; অর্থাৎ, আমাদিগকে অন্তরমুখী হইয়া চলিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গণ যে স্বভাবতঃ বাহ্যবস্তুর দিকে দৌড়াদৌড়ি করে তাহাদিগকে আটকাইতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণের উপর প্রভুত্ব, তাহারা যে সব বস্তুর জন্য লালায়িত সে সকল বস্তু না পাইলেও অবিচলিত থাকিবার সামর্থ্য,--ইহাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন; কেবল এইরূপেই আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করিব যে, আমাদের মধ্যে একটি আত্মা রহিয়াছে,—সে আত্মা বাহ্যস্পর্শে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল মন হইতে স্বতন্ত্র, ঐ আত্মা নিজের গভীরতর সত্তায় স্বপ্রতিষ্ঠ, অক্ষর, প্রশান্ত, আত্মজয়ী, বিরাট, মহান্, অচলপ্রতিষ্ঠ, সে আত্মা আমাদের বাহ্যপ্রকৃতির অশান্ত ছুটাছুটিতে এতটুকু বিচলিত হয় না। কিন্তু, যতক্ষণ আমরা বাসনার বশ ততক্ষণ এই ভিতরের আত্মাকে অনুভব করা যায় না। কারণ, আমাদের সমগ্র বাহ্যজীবনের মূলতত্ত্ব এই বাসনা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই তৃপ্তি পায়, কামক্রোধাদি চিত্তবিক্ষোভ লইয়াই

বাসনার সমস্ত খেলা। অতএব, এই বাসনাকে বর্জ্জন করিতেই হইবে; আমাদের প্রাকৃত সত্তার এই ঝোঁক বিনষ্ট হইলে, ইহারই ফলস্বরূপ চিত্তবিকার সমূহও শান্ত হইয়া পড়িবে; কারণ, এই সকল চিত্তবিকার যে বাহ্য সুখ দুঃখের দ্বারা পুষ্ট হয়, সে সকল আমাদের অন্তর হইতে চলিয়া যাইবে, বাসনা দূর হইলে আর লাভ-লোকসানের, জয় পরাজয়ের, ইন্দ্রিয়-ভোগাদির সুখ দুঃখ আমাদের অন্তরে স্থান পাইবে না। তখন আমরা পাইব এক প্রশান্ত সমতা। আবার, যেহেতু তখনও আমাদিগকে সংসারে বাস করিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে এবং যেহেতু আমাদের কর্ম্ম করিবার স্বভাবই এই যে কর্ম্ম করিতে হইলেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করিতে হয়, সেই হেতু আমাদের এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে এবং কর্ম্মের ফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, নতুবা বাসনা এবং বাসনার সমস্ত পরিণাম ফল থাকিয়াই যাইবে। কিন্তু, আমাদের মধ্যে কর্ম্মীর এই স্বভাব, ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিবার স্বভাব কেমন করিয়া পরিবর্ত্তন করা যায়? ইহার উপায় হইতেছে এই যে, আমাদের "আমি" হইতে আমাদের কর্ম্মকে আলাদা করিতে হইবে। বুদ্ধির ভিতর দিয়া বুঝিতে হইবে যে এসব প্রকৃতির তিন গুণের খেলা, এবং এই খেলা হইতে আত্মাকে আলাদা করিতে হইবে এবং আত্মাকে আলাদা করিবার নিমিত্ত আত্মাকে প্রথমে করিতে হইবে প্রকৃতির সকল কর্ম্মের দ্রষ্টা এবং সকল কর্ম্মকে ছাড়িয়া দিতে হইবে সেই

শক্তির হস্তে যে শক্তি প্রকৃতপক্ষে উহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে,—প্রকৃতির ভিতরের সেই শক্তি আমাদের অপেক্ষা বড়, তাহা আমাদের নিজস্ব শক্তি নহে, তাহা বিশ্বের অধীশ্বর। কিন্তু মন এই সব করিতে দিবে না; মনের স্বভাবই হইতেছে ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাতে ধাবমান হওয়া এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিকে নিজের সঙ্গে টানিয়া লওয়া। অতএব, এই মনকে কেমন করিয়া শান্ত করা যায় তাহা আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। আমাদিগকে এমন পরিপূর্ণ শান্তি ও নিস্তব্ধতা লাভ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা আমাদের ভিতরের প্রশান্ত, অচলপ্রতিষ্ঠ, আনন্দময় আত্মাকে জানিতে পারিব,—সে আত্মা বাহ্যবস্তুর স্পর্শে চির, অক্ষত ও অবিচলিত, তাহা নিজেতেই পূর্ণ, নিজেতেই নিত্যতৃপ্ত।

এই আত্মাই আমাদের সনাতন সত্তা। আমাদের ব্যক্তিগত নামরূপের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ নহে। ইহা সর্ব্বভূতের মধ্যে এক, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ববস্তুর প্রতি সমান, নিজের অনন্ত সত্তার দ্বারা ইহা সমগ্র বিশ্বলীলাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু ইহা কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল লীলা ও নামরূপের খেলার দ্বারা উহা কিছুমাত্র বিকৃত হয় না। আমাদের ভিতরে আত্মা যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আমরা যখন ইহার শান্তি ও নিস্তব্ধতা অনুভব করি, তখন আমরা ঐ আত্মাতেই পরিণত হইতে পারি; আমাদের সত্তাকে তখন নীচের প্রকৃতির বন্ধন হইতে তুলিয়া এই আত্মায়

পুনর্প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। আমরা ইহা করিতে পারি, আমরা যে সকল জিনিষ লাভ করিয়াছি, শান্তি, সমতা, নিস্তব্ধ নিরহঙ্কারিতা—এই সকলের শক্তির দ্বারা। কারণ, যতই আমরা এই সব জিনিষে বাড়িয়া উঠি, ইহাদিগকে পূর্ণ করিয়া তুলি, আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে ইহাদের অধীন করিয়া দিই, ততই আমরা এই শান্ত, সম, বিক্ষোভহীন, নামরূপহীন, সর্ব্বব্যাপী আত্মায় পরিণত হই। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ ঐ নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে পতিত হয় এবং আমাদের উপর বাহ্যজগতের স্পর্শ সকলকে পরম শান্তভাবে গ্রহণ করে; আমাদের মন ঐ নিস্তব্ধতার মধ্যে শান্ত হইয়া যায় এবং সর্ব্বদর্শী সাক্ষী হয়; আমাদের অহং, "আমি" এই নামরূপের অতীত সত্তায় লয় হইয়া যায়। আমরা নিজেরা যে আত্মা হই সেই আত্মার মধ্যেই আমরা সর্ব্ব বস্তুকে দেখি; এবং সর্ব্ববস্তুতেই এই আত্মাকে দেখি; আমরা আধ্যাত্মিক সত্তায় সর্ব্বভূতের সহিত এক হই। এই অহঙ্কারশূন্য শান্তিতে ও সকল ব্যক্তিত্ববোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্ম আর আমাদের থাকে না, তাহা আর আমাদিগকে বন্ধন করে না, প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমাদিগকে বিচলিত করেন। প্রকৃতি ও প্রকৃতির গুণ সকল তাহার কর্ম্মের জাল বুনিতে থাকে, কিন্তু আমাদের দুঃখ-লেশশূন্য স্বপ্রতিষ্ঠ শান্তির হানি করিতে পারে না। সমস্তই সেই এক, সম, সর্ব্বগত ব্রহ্মে সমর্পিত হয়।

কিন্তু এখানে দুইটি সমস্যা দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ, শান্ত ও অক্ষর আত্মা এবং প্রকৃতির কর্ম্ম এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে আমরা একবার অক্ষর সত্তায় প্রবেশ করিলে তাহার পর আদৌ কেমন করিয়া কর্ম্ম থাকিতে পারে, কিম্বা কেমন করিয়া কর্ম্ম চলিতে পারে? অক্ষর অবস্থায় কর্ম্মের সে প্রেরণা কোথায়, যাহার দ্বারা আমাদের প্রকৃতির কর্ম্ম সম্ভব হইবে? যদি আমরা সাংখ্যের সহিত বলি যে এই প্রেরণা প্রকৃতিতে আছে, আত্মাতে নাই, তথাপি প্রকৃতির ভিতর একটা ত প্রবৃত্তি থাকা চাই এবং প্রকৃতির ভিতর এমন শক্তি থাকা চাই যেন আত্মাকে অনুরাগ অহঙ্কার ও আসক্তির দ্বারা প্রকৃতির কার্য্যের মধ্যে টানিতে পারে? এই সকল জিনিষ যখন আর আত্মার চৈতন্যে প্রতিফলিত হয় না, তখন আর প্রকৃতির শক্তি থাকে না এবং সেই সঙ্গে কর্ম্মের প্রেরণা চলিয়া যায়। কিন্তু গীতা এই মত স্বীকার করে না; বাস্তবিক এই মত গ্রহণ করিলে বহুপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, শুধু এক বিশ্বব্যাপী পুরুষ মানিলে চলে না, নতুবা বিভিন্ন আত্মার বিভিন্ন প্রকারের জীবন কেন হয় বুঝা যায় না, এবং যখন অন্য লক্ষ লক্ষ আত্মা বদ্ধ থাকে তখন একটি আত্মা কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃতি একটা স্বতন্ত্র বস্তু নহে ভগবানের যে শক্তি বিশ্বসৃষ্টিতে বাহির হইয়াছে তাহাই প্রকৃতি। কিন্তু ভগবান যদি শুধু এই অক্ষর আত্মা হন, এবং তাঁহা হইতে যে

সত্তা প্রকৃতির খেলায় বাহির হইয়াছে তাহাই যদি জীব হয়, তাহা হইলে যে মুহূর্ত্তে জীব ফিরিয়া আসিবে এবং আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই সমস্ত বন্ধ হইয়া যাইবে, কেবল থাকিবে পরম ঐক্য এবং পরম নিস্তব্ধতা। দ্বিতীয়তঃ, যদিও কোন অচিন্ত্য উপায়ে তখনও কর্ম্ম চলিতে থাকে, তথাপি যেহেতু আত্মা সকল জিনিষের প্রতিই সমান, সেহেতু কর্ম্ম হইল কি না হইল তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না, আর যদিও কর্ম্ম করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম কোন প্রকারের হইল, তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ও ধ্বংসসঙ্কুল কর্ম্ম করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ কেন, এই রথ কেন, এই যুদ্ধ কেন, এই যোদ্ধা কেন, এই দিব্য সারথি কেন?

গীতা এই বলিয়া জবাব দিয়াছে যে, ভগবান অক্ষর আত্মা অপেক্ষাও বড়, আরও অধিক ব্যাপক, তিনি একাধারে এই অক্ষর ব্রহ্ম বটেন আবার প্রকৃতির কার্য্যের অধীশ্বরও বটেন। কিন্তু, অক্ষরের যে অনন্ত শান্তি, যে অবিকল্প সাম্য, যে কর্ম্মবন্ধন ও নামরূপের অতীত স্বরূপ— ভগবান ভিতরে সেই অক্ষরের ভাব লইয়াই প্রকৃতির কার্য্য পরিচালনা করেন। ভিতরে এই অক্ষর—প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি কর্ম্ম পরিচালনা করেন এবং আমরা যতই এই অক্ষর স্বরূপে বাড়িয়া উঠি, ততই আমরা পরমেশ্বরের স্বাধর্ম্য লাভ করি এবং দিব্য কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করি। এই অক্ষর-প্রতিষ্ঠা

হইতে ভগবান প্রকৃতিতে ইচ্ছা ও শক্তিরূপে বহির্গত হন, সর্ব্বভূতে নিজেকে প্রকাশিত করেন, পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, সকল মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থান করেন, অবতার রূপে, মানুষে দিব্য জন্মরূপে নিজেকে প্রকটিত করেন। মানুষ যতই তাঁহার স্বাধর্ম্ম্য লাভ করে, ততই সে দিব্য জন্ম লাভ করে। আমাদিগকে আমাদের কর্ম্মের এই অধীশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে, যজ্ঞার্থে, কর্ম্ম করিতে হইবে এবং আত্মস্বরূপে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার সহিত আমাদের একত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকৃতিতে ভগবানের আংশিক প্রকাশ। সত্তায় তাঁহার সহিত এক হইয়া আমরা বিশ্বের সর্ব্বভূতের সহিত এক হইয়া উঠিব এবং দিব্য কর্ম্ম করিব, আমাদের নিজের কাজ বলিয়া নহে, লোক রক্ষা ও লোক সংগ্রহের নিমিত্ত আমাদের ভিতর দিয়া ভগবানের কাজ বলিয়া।

এইটি করাই মূলে প্রয়োজন, এবং একবার এইটি করিতে পারিলে, অর্জ্জুনের সম্মুখে যে সকল সংশয় উপস্থিত, সে সমস্ত দূর হইয়া যাইবে। সমস্যাটি তখন আর আমাদের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সমস্যা থাকে না, কারণ যাহা লইয়া আমাদের ব্যক্তিত্ব তাহা তখন অনিত্য ও নীচের জিনিষ হইয়া পড়ে, তখন কেবল সমস্যা থাকে আমাদের ভিতর দিয়া ভগবদিচ্ছা জগতে যে কাজ করিতেছে সেই সমস্যা। ইহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে জানিতে হইবে যে ভগবান নিজে কি এবং প্রকৃতি-তেই কি, প্রকৃতির কার্য্য কি এবং সে কার্য্যের লক্ষ্য কি, এবং

"প্রকৃতিস্থ" আত্মার সহিত এই পরমাত্মার যে সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্ত ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই নিবিড় সম্বন্ধেরও স্বরূপ কি? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসাই গীতার বাকী অংশের আলোচ্য বিষয়।

সম্পূর্ণ

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২২	হইব	ইহা
১৪	২২	বোদবদ	বেদবাদ
২৩	১৫	of	or
২৫	২	বাক	বাকী
৩৯	১	বৃত্তিগুলির	পরার্থপর বৃত্তিগুলির
৪০	২	রহিয়াছে তাহা	রহিয়াছে এবং অপরের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহা
৫০	১৭	হওয়া	হইয়া
৬৮	৭	জন্ম চক্রান্তর	জন্মান্তর চক্র
৭১	৫	সূর্য্যের জন্ম পরবর্ত্তী	সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্ববর্ত্তী
১৩২	৯	সজ্ঞান	সজ্ঞানে
১৩৩	৫	সফল	সকল
১৩৪	৫	কর্ম্ম করিবার প্রকৃত কৌশলই যোগ	যোগই কর্ম্ম করিবার প্রকৃত কৌশল
১৩৬	১৬	আত্মার	আমার
১৪০	১৫	নবজাতির	নরজাতির
১৪৯	১	ায়িত্বহীন	দায়িত্বহীনা
১৫৫	১৩	অসুরেরা	অসুরের
২৯১	১৮	করেন	করে না
২৭৯	৭	যেরূপ	যে রূপ

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় প্রণীত

"দুইখানি যুগোপযোগী পুস্তক"

প্রত্যেক দেশহিতৈষী, ভাবুক ও কর্ম্মীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

১। **রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন**—গ্রন্থকার কর্ম্মক্ষেত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপে কর্ম্ম করিয়া, তাঁহার অপূর্ব্ব রাজনীতির যে পরিচয় পাইয়াছেন তাহাই সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।—চিত্তরঞ্জন যুগান্তরের নেতা, তাঁহার রাজনীতিক জীবনকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সমস্যাসমূহের সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা করা হইয়াছে এবং স্বাধীনতালাভের প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই, মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

২। **পল্লী-সংগঠন**—আমাদের দেশে জাতীয় আন্দোলন যে অগ্রসর হইতেছে না তাহার প্রধান কারণ দেশবাসীর প্রাণশক্তির একান্ত অভাব। কি কি কারণে এই প্রাণশক্তি নষ্ট হইয়াছে, কেমন করিয়া দেশের মধ্যে নূতন জীবন, নূতন শক্তির সঞ্চার হইতে পারে সে সম্বন্ধে গভীর গবেষণামূলক আলোচনা আছে এবং পল্লীসংগঠন কার্য্যপদ্ধতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহায়ে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় জাতিগঠনের মূল সূত্রগুলি এই পুস্তকের মধ্যে দেখিতে পাইবেন। সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।